

# নগ্ন ঈশ্বর

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

*If you want to download  
a lot of ebook,  
click the below link*



**Get *More*  
Free  
eBook**

**VISIT  
WEBSITE**

[www.bengaliboi.com](http://www.bengaliboi.com)

**Click here**



# ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷକ

ଅତୀତ ବନ୍ଧୁଗୋପାଳ

প্রথম প্রকাশ  
বৈশাখ ১৩৭১

প্রকাশক  
নীহাররঞ্জন রায়  
কথাশিল্প  
১২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট  
কলিকাতা-১২

মুদ্রক  
নিরঞ্জন ভট্টাচার্য  
সর্বানী প্রিন্টার্স  
১০/১/এ লক্ষ্মী দস্ত লেন  
কলিকাতা-৩

২য় ঢাকা



শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী অগ্রজপ্রতিমেষু

ও

শ্রীমতী রত্না নন্দী স্মৃতিরিতাসু

শেষ রাতের ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দব ধরছে।

দীর্ঘদিন সমুদ্র পরিক্রমণের পর জাহাজ এবং জাহাজীরা লেগুনের মুখে বন্দরের আলো দেখতে পেল।

আর তুষার ঝড়ের জন্য জাহাজীরা রেনকোট গায়ে জেকের উপর ছুটোছুটি করছে, ওরা দড়িদড়া ফেলে দিচ্ছে নিচে। জেটিবয় সেই সব দড়িদড়া অথবা হাসিলেব সাহায্যে জাহাজ বন্দবে বাঁধছে। মেজমালামকে ক্রান্ত মনে হচ্ছে না—তিনি দু'হাত তুলে বিচিত্র এক ভঙ্গীতে ডেক-জাহাজীদের দড়িদড়া হাপিজ অথবা হাড়িয়া করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে উঁকি দিল। শেষরাতে জাহাজ বন্দব ধরছে, জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকাব উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। তাবা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখেছে। ওরা সেই দ্বীপের ঝাউ গাছ এবং অপবিচিত্র গাছগাছ লিখে চীৎকার করার সময় মনে কবত—জাহাজ বুঝি আশে কোনদিন বন্দব ধরবে না। শুধু সমুদ্র, এবং নীল জল, নীল আকাশ আর হয়ত কচিং কেশ ও সমুদ্রের চিড়িয়াপাখী—দূরে কখনও ডালকিনের ঝাঁক...। পাঁচ নম্বর সাবের মনে হত জাহাজ ওদের নিয়ে অন্তহীন এক সমুদ্রে যাত্রা করেছে। বন্দরে কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না, জাহাজ ওদের সঙ্গে তুলনাত্মক নয়।

অতঃপর এই তুষার ঝড়ের ভিতরও জাহাজীদের প্রাণে উল্লাসের মন্ত ছিল না। মেজমালাম প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করতে জাহাজীদের উৎসাহ দিচ্ছিল। সামনে পাহাড়, আলো, মাটি এবং মানুষের বসতি। ওখানে কোথাও রক্ত নেই। গৃহ আছে। মেজমালাম উত্তেজনার রা রাকরে গান গাইত। জাহাজ ওভার তুষার ঝড়ের জন্য ওঁর কণ্ঠ ভয়ঙ্কর কঠিন মনে হচ্ছিল আর তুষার ঝড় বেতপ জুড়ে

পোর্ট হোল বন্ধ। কাঁচের ভেতর থেকে এখন অন্যান্য জাহাজীরা বন্দর দেখছে। বন্দরটা ছোট অথচ খুব মন্থণ মনে হচ্ছিল। ক্রমশ আলো ফুটছে, ক্রমশ তুষার ঝড় কমে আসছিল। আর এক এক করে সব আলো, পথের এবং জেটীর এক সময় নিবে যেতে থাকল। দূরের গীর্জায় তখন ঘণ্টা বাজছে, তখন জাহাজীরা সকলে ডেকের উপর উঠে এল এবং সকলে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ছে। আবেগে উত্তেজনায জাহাজীরা বন্দরের সকল ঘাস মাটি ফুলকে ভালবাসার কথা জানাল।

বন্দরের প্রথম দিন এবং রবিবার। জাহাজীদের ছুটির দিন। ওরা হই হই করে আকাশ পরিষ্কার হলেই নেমে যাবে। শুধু তুষার ঝড়ের জন্য ওরা বিরক্ত। জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্ট হোলে বারংবার হাত রেখে ঝড়ের সঙ্গে তুষারকণা পরখ করছিল। মনে হচ্ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস ক্রমশ কমে যাবে, যেন ওর ইচ্ছা এই ঠাণ্ডা বাতাস থেমে গেলেই সে তার প্রিয় তামাকের পাইপটি মুখে পুরে যুবতী সন্ধানে বন্দরে বের হয়ে পড়বে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ আয়নায় মুখ দেখল। ভয়ঙ্কর মুখ অবনীভূষণের, কালো নিগ্রো-শুলভ চেহারা। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু — জাহাজে অবনীভূষণকে বাঙালী বলে চেনাই যায় না। অবনীভূষণ শক্ত মানুষ, অবনীভূষণ লম্বা আর অবনীভূষণের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। অবনীভূষণ মাকে দেখেছে, বাবাকে দেখে নি। ‘অবনীভূষণ জারজ’—আয়নায় মুখ দেখার সময় পাঁচ নম্বর সাব কথাটা আয়নার প্রতিবিম্বকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করল। এত দীর্ঘ ঋজু চেহারা অবনীভূষণের, আর এত বড় চোখ এবং মুখ অবনীভূষণের। আর এত লম্বা থাবা অবনীভূষণের যে যুবতীরা কোন বন্দরেই অবনীভূষণকে পছন্দ করে না।

ডেকে সামান্য কাজ অবনীভূষণের। ক্যারোয়ার্ড-ডেকে ছ নম্বর মাস্টের নীচে উইন্ড মেসিনের লিভার প্লেট আদ্য হয়ে গেছে — ওটা সারতে হবে। রবিবার তবু ওকে এই সামান্য কাজটুকু করতে হবে। বয়লার স্ট্রাট পরে অবনীভূষণ ডেকে বের হয়ে গেল। চারিদিকে পাহাড়। তুষার ঝড় কমে গেছে বলে আকাশ পরিচ্ছন্ন, লেগুনের জল সামান্য সবুজ রঙের, আর দূরে দূরে সব পাহাড় ক্রমশ উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের কোলে সব পরিচ্ছন্ন লাল নীল কাঠের রঙবেরঙের বাড়ি, এত বড় বড় প্রাসাদ এবং ঠিক সেতুর অন্য পারে বড় বড় কিছু স্বাইজ্যাপার। ঠিক পেরেই শহর। ঠিক লৌহ আকরিকের গুদামখানার বিপন্ন দিকের সীমান্তে অবনীভূষণ মানুষের ভিড় দেখল। স্বর্ষ আলো দিচ্ছে সামান্য

—খুব নিশ্চয় এই আলো, কোন উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। অবনীভূষণ লেদার জ্যাকেটের ভিতরেও হ হ করে শীতে কাঁপছিল—সামান্য উত্তাপের জন্ত পাঁচ নম্বরকে খুব দুঃখিত মনে হচ্ছে।

অবনীভূষণ হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে নিজের বাঁকে শুয়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমত কিছু নগ্ন ছবির উপর চোখ রাখতেই শুনতে পেল এলওয়েতে কে বা কারা যেন পায়চারি করছে। মেজমালোমের গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি খুব দ্রুত এবং জোরে হাসছেন। বোধ হয় খুব সকাল সকাল তিনি যুবতী সন্ধানের জন্ত বের হয়ে পড়ছেন। অবনীভূষণেরও ইচ্ছা হচ্ছিল ঠিক এই সময়ে, যখন পোটহোল দিয়ে অগ্ন তীরে তিমি শিকারের জাহাজ ভিড়তে দেখা যাচ্ছে, যখন দূরে কোথাও এক তৈলবাহী জাহাজ বাঁধা হচ্ছিল, যখন আর কিছু হাতের সামনে করণীয় নেই অথবা ‘ট্যানি টেরেটো’ ‘ট্যানি টেরেটো’ এই এক বিশী শব্দ কানের কাছে ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে তখন মেজমালোমের মত টিউলিপ গাছের নীচে যুবতী সন্ধানে বের হয়ে পড়াই ভাল। এত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবনীভূষণ জাহাজ থেকে সকাল সকাল নেমে যেতে পারল না। সে রাতের জন্ত অপেক্ষা করল। কারণ দিনের বেলায় এই চেহারা বড় ভয়ঙ্কর। রাতের বেলায় অস্পষ্ট অন্ধকারে অথবা নিয়ন আলোর ভিতর, ফেল্ট ক্যাপের ভিতর আর বৃহৎ ওভার কোটের জন্ত সামান্য মানুষের মত মনে হয় ওকে। স্মৃতরাং হাত পা শক্ত করে সে বাঁকেই পড়ে থাকল। শরীরের ভিতর ভয়ঙ্কর কষ্ট এবং উত্তেজনা। বন্দরে এলেই কষ্টটা বাড়ে। বন্দর ধরলেই এই সব জাহাজীরা অমানুষের মত চোখ মুখ করে ঘোরা ফেরা করতে থাকে—কি যেন এক সোনার আপেল ওদের হারিয়ে গেছে—সেই আপেলের জন্য, সেই সোনার হরিণের জন্য ওরা সব সময় মাটি পেলেই দ্রুত ছুটে চায়। অবনীভূষণ দ্রুত ছুটে চাইল।

সন্ধ্যার সময় জাহাজের স্টার্বোর্ডসাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে গেল সে। সেখানে প্রিয় বন্ধু ডেক-এগ্রেন্টিস উইলিয়াম উড থাকেন। সে দরজায় কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুক বলল, একি তুমি এখনও চুপচাপ বসে রয়েছ! বের হবে না?

উড বলল, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা।

অবনীভূষণ বলল, অন্তত সিম্যান মিশানে চল। সেখানে জুটে যেতে পারে।

স্মৃতরাং ওরা উভয়ে সাজগোজ করে বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভার কোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ঙ্কর বড় বেটপ জুতো।

পায়ে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজমালাম বন্দর থেকে কিরছে। মেজমালাম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে (বয়সে চল্লিশের মুখোমুখি) নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী ব্লাউজের উপর ফারের লম্বা মত কোট গায়ে.....। ওর কোমরে মেজমালামের হাত। যেন চুরি করে তিনি এক যুবতীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছেন। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। তীক্ষ্ণ শীতের ভিতর এই সামান্য উত্তাপটুকু অবনীভূষণকে অস্থির করে তুলল। মেজমালামকে সে ‘গুড-ইভনিং সেকেন্ড’ বলতে পর্যন্ত ভুলে গেল। সে অগ্নমনস্কভাবে হাঁটছে। জেটির উপর দিয়ে ফ্রেনের নীচে লম্বা লম্বা পা ফেলে উভের সঙ্গে হাঁটছে।

শীতের প্রথম। গাছের সব পাতা ঝরে গেছে, আর কিছু দিন গেলে এখানে হয়ত তুষার পাত হবে। অথবা তুষার পড়ার আগে শীত মাটিতে শেষ কামড় বসাচ্ছে। বাগানের আপেল গাছগুলোকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, চেঁচীকলের গাছগুলো মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সব অপরিচিত গাছগাছালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাচ্ছে না, ওরা বৃক পপ্লার হতে পারে, পাইন হতে পারে এমন কি বার্চ গাছও হতে পারে। এই শীতে পথের দু’পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শাসির জানাল এবং বড় বড় কাঁচের জানালার ভিতর পরিবাবের যুবক-যুবতীদের মুখ, একডিয়ানের সুর, গ্রাম্য কোন লোকসঙ্গীত অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে। ইতস্তত দু’পাশে বার এবং পাব-এর পর সেই বড় কানি’ভাল। সদর দরজার উপর একটা লোক হাঙরের মুখোশ পরে বসে নানা ভাবে জাহাজীদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে। ওরা কানি’ভালে ঢুকল না। ওরা ক্রমশ পাহাড়ের উত্তরাইয়ে নেমে যাচ্ছে। আর ওরা দেখল, হরেক রকমের রমণীরা মুখে ফুঁ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে—স্থানীয় কোন উৎসব হবে হয়ত—মেয়েরা মাথায় কমাল বেঁধে শহরের বড় কবরখানার দিকে হাঁটছে। অবনীভূষণের এ-সময় ইচ্ছা হচ্ছিল ওর বড় থাবা দিয়ে ঠিক ছোট্ট পাখী ধরার মত কোন যুবতীকে ওভারকোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলতে।

ভোরের তুষার ঝড়ের চিহ্ন এখনও এই সব পাহাড়ে এবং ছবির মত বাড়ি-গুলোর মাথায় লেগে আছে। কোথাও দেখল, কাঁচের ঘরে সুন্দরী যুবতী পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর দু’পাশে হরেক রকমের দৃশ্য এবং অবনীভূষণ এখন উন্মাদ—সে হনো হয়ে যুবতী সন্ধান করছে। এই সব জাহাজীদের আনন্দ দানের জন্য ভিন্ন

ভিন্ন অশালীন পোশাকে নানা বয়সের যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে। ওরা এক এক করে সকলে নাচের আসরে নেমে পড়ছে। স্টেজের উপর একদল লোক কালো পোশাক পরে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। ঈগল পাখীর মত মুখওয়ালা বাঁশির শব্দ বীভৎস এবং উৎকট মনে হচ্ছিল। পাশের কাউন্টার কাঁচ দিয়ে মোড়া—সেখানে মেয়েরা মদ বিক্রি করছে। জাহাজীরা কিউ দিয়ে মদ গিলছিল। অবনীভূষণ এবং উড উভয়ে মদ খেল এক গ্রাস করে। ওদের পার্টনার নেই, বিশেষ করে অবনীভূষণ এই সব নাচ এত দিনেও রপ্ত করতে পারে নি। সুতরাং অবনীভূষণ আর এক গ্রাস মদ নিয়ে পাশের সোফাতে বসে মাংসের পুরের সঙ্গে মদটুকু খেয়ে ফেলল। বাকি মাংসের পুরটুকু সে চেখে চেখে চেটে চেটে খাচ্ছিল আর রমণীরা এই যে নেচে চলেছে, এই যে সুন্দর শরীর এবং উটের মত মুখটি তুলে নেচে বেড়াচ্ছে এই যে রমণীরা ঘোড়ার মত পা ফেলে এক দুই করে সামনে পিছনে, পিছনে সামনে—যাচ্ছে আসছে—তা দেখে আশ্চর্য হয়ে পড়ছিল। ফলে অবনীভূষণ ল্যালা ক্যালার মত চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তারপর সে সহসা আবিষ্কারের মত দেখে ফেলল দুই সুন্দরী যুবতী যেখানে মদের কাউন্টার ঠিক তার বিপরীত দিকের টেবিলে বসে উল বুনছে। অবনীভূষণ লেজ নীচু করে চুপি চুপি উভের হাত ধরে ওদের দিকে গিয়ে সরে বসল। তারপর চোখমুখ টান টান করে বলল, গুড ইভিনিং ম্যাডাম এবং পাশে বসে পরিচিত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলল, এম/ভি সিটি অফ গ্রাসগো। সে তার জাহাজের নাম বলল ওদের।

মেয়ে দুজন ওকে স্বাগত জানালে সে কাউন্টারে আবার মদের অর্ডার দিয়ে বলল, ছবির মত এই শহর। মেয়ে দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন অলৌকিক স্বপ্নের কথা বলে অথবা সমুদ্রের গল্প বলে ভেজাতে চাইল।

অবনীভূষণ দামী সিগারেট বের করে ওদের একটি করে প্রথম। দতেই ওরা এসে ওর ঘাড়ের উপর পড়ার মত ভান করল—সো নাইস! কোন অলৌকিক ঘটনার মত অবনীভূষণের সিগার কেস; সিগারেট কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওরা।

অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়েটিকে বলল, ইউ লাইক ইট? বলে সে ওর সন্মতির অপেক্ষা করল না; সে চুল-সোনা মেয়ের হাতে ঘোঁতুকের মত সিগারেট কেস তুলে ধরার সময়ই কাঁচের জানালায় মুখ বার করে পাহাড়ের উত্তরাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলো দেখল। আকাশ পরিচ্ছন্ন বলে, পথঘাট শুকনো বলে পার্কেয় টেবিল বেঞ্চে এখন সব যুবক-যুবতীরা বসে নিশ্চয়ই গল্প করছে। অবনীভূষণ

এবার উত্তর দিকে তাকাল, উভ তরায় হয়ে নাচ দেখছে। সে অবনীভূষণ অথবা চুল-সোনা মেয়েকে লক্ষ্য করছে না। স্মৃতরাং অবনীভূষণ উভকে কলুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, চল এবার উঠি। প্রায় ঠিক করে এনেছি।

এবার অবনীভূষণ যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলুন অন্য কোথাও।

যুবতী দুজন পরস্পর মুখ দেখল। তখন ব্যাণ্ড বাজছে উঁচু পর্দায়, তখন সার্কাসের ঘোড়ার মত পা ফেলে এই নাচের ভিতরই কেউ কেউ বেলেলাপনা করছিল। নাচতে নাচতে কোন এক ফাঁকে দেয়ালের পাশে অথবা সামান্য অন্ধকারের ভিতর পরস্পর পরস্পরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সব ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গির ছবি। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। যুবতীরা সব উত্তর মত মুখ তুলে কেবল চুমু খাচ্ছে, কেবল সার্কাসের ঘোড়ার মত পা মুড়ে বসে পড়তে চাইছে।

অবনীভূষণ বলল, চলুন কোথাও। অবনীভূষণ চুল-সোনা মেয়ের হাতে নরম চাপ দিল।

ব্যাণ্ড বাজছে, হরদম বাজছে। সামনের কাউন্টারে ফের দু-একজন করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছে। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গভির্নী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে, এমন গল্পও করল। ওরা গল্প করার সময় পাশের হিটার থেকে উত্তাপ নিচ্ছিল এবং গভির্নী তিমির প্রসব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রসিকতা করছিল।

ভিড় কাঁচঘরে ক্রমশ বাড়ছে। মিশানের ডান দিকে মস্তণ ঘাসের চত্বর এবং মৃত বৃক্ষের মত কিছু পাইন গাছ—তার নীচে বড় বড় টেবিল আর কাঁকা মাঠে হেই উঁচু লম্বা এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাঁচঘর অতিক্রম করে কাউন্টারের সামনের লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। আগের দলটা এতক্ষণ হইচই করছিল মদ খেতে খেতে, কিন্তু হেই উঁচু লম্বা হারপুনাকে দেখে ওরা শিশু-সন্তানের মত হয়ে গেল। আর তখন কে বা কারা যেন সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে—ট্যানি টরেটো...ট্যানি টরেটো...আমাদের বন্ধু হারপুনার এবার উত্তর সাগর থেকে গভির্নী তিমি শিকার করে ফিরেছে।

উঁচু লম্বা লোকটার টেবিলে সকলে এক এক করে গোল হয়ে বসে গেল। সেই যুবতী দুজন পর্যন্ত উঠে যেতে চাইল। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির

ধাকতে পারছে না। সে এবার বিক্রপ করে বলতে চাইল হ্যাঁ গো সতীর দল  
...তোমরা আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছ! সে বিরক্ত হয়ে এবার উডকে বলল,  
উড তুমিও বলতে পার বুঝিয়ে। তোমার সুন্দর মুখ দেখে...

উডের কথা যুবতী ছুজন তাকিয়ে ভিত্তিতে গুনল। ওরা চুল ঘাড়ে ফেলে  
উলের কাঁটা ব্যাগের ভিতর ভরে সেই চৌকোমুখ এবং গাম্বুট-পরা ভদ্রলোক—  
যে গভিণী তিমি শিকার করে এইমাত্র উত্তর সাগর থেকে ফিরছে—তার  
টেবিলের দিকে হাঁটতে থাকল। অবনীভূষণ মদ খেয়েছে। ওর শরীর সামান্য  
টলছিল। অবনীভূষণের ভিতরে ভিতরে এক অপরিণীত তৃষ্ণা—সে পাগলের  
মত চুল-সোনা মেয়ের হাত ধরে ফেলল। কারণ সে যেন সেই চৌকোমুখ হারপুনার,  
মাথায় যার হাড়ের হাড়ের টুপি, যে বিজী এবং যে ওখানে বসে কটু গন্ধের তামাক  
টানছে, যার চেহারা দেখলে মনে হয় মেয়েমানুষ সামান্য বস্তু—তার দৃষ্টি একবারেই  
সহ করতে পারছিল না। সে রাগে দুঃখে চুল-সোনা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘর  
থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলে—হারপুনার ব্যক্তিটি ও তার দলবল লম্বা লম্বা  
পা ফেলে দরজার সামনে পথ আগলে দিলে। অবনীভূষণ ক্ষিপ্ত এক জানোয়ারের  
মত ওদের বিরুদ্ধে গর গর করে উঠল। মনে হল পরে সেই দলবল অবনীভূষণকে  
এলোপাখাড়ি মেরে গেছে।

বাইরে সাদা আলোর ভিতর নাক মুছতে গিয়ে অবনীভূষণ দেগল সামান্য রক্ত  
নাকের ডগায় জমাট বেঁধে আছে। ভিতরে তখন সেই যুবতী হারপুনাদের সঙ্গে  
রসিকতা করছিল এবং হাসছিল। কাঁচের ভিতরে সব স্পষ্ট। সুতরাং  
অবনীভূষণ আর সহ করতে পারছে না। সে ফের দরজা অতিক্রম করে ভিতরে  
টোকবার চেষ্টা করলে উড হাত চেপে ধরে বলল, অবনী তুমি বেশ জোরে  
হারপুনাকে মেরেছ। লোকটা পেটে লাথি খেয়ে ছমড়ি খেয়ে পড়েছে। লোকটা  
গল গল করে মদ বমি করছে।

অবনীভূষণের খুঁট বামেলা করার আর ইচ্ছা থাকল না। এবং এখানে আর  
যুবতী অনুসন্ধান করা নিরর্থক ভেবে ওরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে অথবা সেতুর  
দুই পাশে, লোহালকড়ের কারখানার দেওয়ালের ছায়ায় এবং যেখানে সব তিমি  
মাছের চর্বি সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় পিপের সারি সেইসব অঞ্চলে ঘুরতে  
ঘুরতে একসময় শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে গেল।

অবনীভূষণ চড়াই-উতরাইয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় উডকে উদ্দেশ্য করে  
বলল, আজ এই ঋতুতে সতীর দল গেল কোথায়?



তখন উভ সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গীতে বলল, ঐ দেখ অবনী, লাইট-পোস্টের নীচে যেন দুজন মেয়ে শিস দিচ্ছে। ব'লে উভ দূরের লাইট-পোস্টের দিকে হাত তুলে নির্দেশ করল।

অবনীভূষণ বলল, চল তবে!

শীতের রাত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনীভূষণের মনে হল ওরা শীতে জমে যাবে ক্রমশঃ। মনে হল ওরা যুবতী দুজনকে বেশী দূর আর অনুসরণ করতে পারবে না। অথবা মেয়ে দুজন এই শীতের রাতে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পথের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, দূরে দূরে সব পুলিশের বৃটের শব্দ এবং ট্রলি বাসের আলো আর পথে পড়ছে না, শহর ক্রমশ যেন নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে আসছে। উভ পৰ্বন্ত আর জোরে হাঁটতে পারছিল না।

একসময় ওরা এবং যুবতী দুজন শো-কেসের সামনে মুখোমুখি পড়ে যেতেই উভ ঝুঁকে বলল, আস্তানা কতদূর?

দুজন বলল, সরি। বোধহয় অবনীভূষণের লম্বা চেহারা এবং হাতের বড় বড় থাবা, ওদের আতঙ্কিত করেছে।

অবনীভূষণ বলল, সামান্য সময়।

যুবতীরা শক্ত হয়ে গেল। বলল, না। ওরা বরং উভকে সঙ্গে নিতে চাইল।

উভ বলল, আমরা দুজন, একা যেতে পারি না।

অবনীভূষণ এবার মরীয়া হয়ে বলল—মেয়ে, এই লম্বা কোটের পকেটে করে নিয়ে যাব তবে—কেউ টেরটি পাবে না। তারপর অবনীভূষণ চারিদিকে তাকাল যেন যথার্থই সে এই দুই যুবতীকে দুই পুতুলের মত পকেটে পুরে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে।

এবার যথার্থই ভয় পেয়ে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ার জন্য ছোট এই সরু গলি অতিক্রম করে নেমে যেতে চাইলো। পথ আগলে অবনীভূষণ তার দুই হাতের বড় থাবা দেখাল।—সে হাত দুটো অঞ্জলির মত করে রাখল—তুষার জল আর কে দেবে? সে যেন বলতে চাইল কথাটা। এবং সে এই নিঃসঙ্গ রাতের আঁধারে উচ্চস্বরে সেই ট্যানি টরেণ্টো ট্যানি টরেণ্টো শব্দের মত চীৎকার করে নগরীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে বলতে চাইল, হায় অবনীভূষণ এই তুষার জল তোমাকে আর কে দেবে!

তারপর অবনীভূষণ সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে যেন বলল, আমি তোমাদের সব দেব, তোমরা আমাকে সামান্য স্পর্শ দাও। সামান্য উত্তাপ দাও।

ওরা উত্তর করল না। বড় রাস্তার উজ্জল আলোর নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আর অবনীভূষণ শুনতে পেল সেই আগের মত দূরে কেবল কারা যেন হেঁকে যাচ্ছে—ট্যানি টরেণ্টো.....ট্যানি টরেণ্টো.....উত্তর সাগর থেকে এক হারপুনার এক গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে। অবনীভূষণ দুর্গের পাশে পাশে হেঁটে গেল। সর্বত্র যেন সেই একই ট্যানি টরেণ্টো ট্যানি টরেণ্টো শব্দ। সে ছ কান চেপে শীতের ঠাণ্ডায় ট্যান্ডির ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল এবং ট্যান্ডিওয়ালাকে নিজের জাহাজের নাম, ডকের নাম বলে শরীর এলিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল হাতে পায়ে বড় ব্যথা, সে ঘাড় নাড়তে পারছে না—পরাজিত এক সৈনিকের মত আত্মগোপনে ভুবে গেল।

গ্যাঙয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন পাঁচ নম্বর সাব এবং ডেক এপ্রেক্সিস উড হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙছে। ওরা ফেরার পথে প্রচুর মদ গিলেছে; ওরা সিঁড়ি ধরে সোজা হেঁটে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সতরাং কোয়ার্টার মাস্টার এক এক করে ওদের দুজনকে উঠে আসতে সাহায্য করলেন।

উড স্টার্বোর্ড সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

অবনীভূষণ বালকেডে ভর করে নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল। স্তিমিত আলো এসেওয়েতে। সে বড় মিস্ত্রি এবং মেজ মিস্ত্রির কেবিন পিছনে ফেলে যেতেই মনে হল পায়ের সঙ্গে কি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। সে যত পা আলাগা করতে চাইছে তত পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে এবার জুয়ে পায়ের নীচে হাত দিয়ে দেখল একটা কালো রঙের গাউন। সে আলোর ভিতর নাকের কাছে সেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলাগা করে ভ্রাণ নেবার সময় দেখল সামনে মেজ মালোমের কেবিন, কেবিনের দরজা খোলা, মেজ মালোম বাঁকে উগুড় হয়ে মৃতবৎ পড়ে আছেন। ঘরে সেই বিকেলের যুবতী নেই। মেজ মালোম এক হাতে কোন রকমে প্যাণ্টটা কোমর পর্যন্ত তুলে রেখে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন। অবনীভূষণ বলল, শালা মদ খেয়েছে। বলে, গাউনটা দরজা দিয়ে মেজ মালোমের মুখের ওপর ফেলে দিল। মেজ মালোমের এখন মুখ ঢাকা এবং শরীর প্রায় উলঙ্গ। সে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মেজ মালোমের কেবিন। তারপর এন্জিন ঘরের সিঁড়ির মুখে নিজের কেবিনের দরজা খুলতে গিয়ে মনে হল ভিতর থেকে কে যেন বন্ধ করে রেখেছে। সে রাগে দুঃখে অপমানে দরজার উপর ভীষণ জোরে লাথি মারল। দরজা খুলছে না। সে তার অবসর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার

দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে বলল, বাস্টার্ড। সে গাল দিল, সোয়াইন। সে তারপর বাংলা ভাষায় খিন্তি করে ভিতরে ঢুকে বিশ্রিত—সে চোখ গোল গোল করে দেখল, সেই বিকেলের যুবতী ওর বাংকে আশ্রয় নিয়েছে। এবং অসহায় বালিকার মত চোখ। যুবতীকে এখন বুনো কাকের মত শীর্ণ মনে হচ্ছে অথবা গর্ভিণী শালিখের মত রোঁয়া-ওঠা। প্রথম সে কী করবে ভেবে গেল না। তারপর বিশ্বয়ের ঘোয় কেটে গেলে সে বলল, কি গো একেবারে বাঘের মুখে!

যুবতী কিছু বলল না। চোখে মুখে ভয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। যেন এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই, সব হয়ে গেছে, হয়ে যাবে ভাব। ঝড় এবং জীবনের আর্তনাদ কোথাও খেমে থাকছে না। যুবতী তবু ধীরে ধীরে বাংক ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। বলল, সরি মিষ্টার। সে তার শীর্ণ হাত বালিশের উপর রেখে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল।

অবনীভূষণ যুবতীটিকে পড়ে যেতে দেখেই বুল—সেই বিকেল থেকে বাদরের হাড় চুষে চুষে যুবতীর এক কঠিন অস্থ, এক কঠিন স্থবির অস্থ—যা এতক্ষণ অবনীভূষণকে এই শহরময়, নগরময় এবং দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বারংবার ঘুরিয়ে মারছে—। অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি যুবতীকে ধরে ফেলল। না হলে বাংক থেকে যেন পড়ে যেত মেয়েটি, হাত পা কেটে মাথায় আঘাত লাগতে পারত। যুবতীর পড়ে যাবার মুখে কললটা শরীর থেকে সরে গিয়েছিল। অবনীভূষণ দেখল আঁচড়ে কামড়ে যুবতীর শরীর মেজ মালোম ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। লঙ্কানিবারণের জ্ঞাত অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি ফের কললটা শরীরে তুলে দিল এবং গুয়ে পড়তে বলে ঘড়িতে সময় দেখল—একটা বেজে গেছে, এখন ওকে সামান্য গুশ্রাবা করলে সামান্য সময়ের জন্য এই বন্দর শুভ-বার্তা বহন করবে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ দরজা ভেজিয়ে চীফ কুকের গ্যালী পর্যন্ত হেঁটে গেল। নেশার ঘোর কি করে যেন একেবারে কেটে গেছে এবং ভিতরের সব দুঃখ ক্রমশ নিরাময় হচ্ছিল। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। সে গরম জল করে যুবতীর শরীর ভাল করে ধুয়ে সামান্য গুশ্রাবার পর বলল, আমার জন্য সামান্য খাবার আছে। ইচ্ছা করলে আমরা দুজনে ভাগ করে খেতে পারি।

যুবতী কষ্ট করে হাসল। আপনি আমাকে বরং একটু সাহায্য করুন।

অবনীভূষণ বলল, কি করতে হবে?

—সেকেন্ড অফিসারের ঘর থেকে দ্রব্য করে আমার পোশাকটা এনে দিন।

অবনীভূষণ মেজ মালোমের ঘর থেকে পোশাকটা এনে দিলে মেয়েটি বলল

আমাকে দয়া করে বন্ধরে নামিয়ে দিন। একটা ট্যান্ডি ভেকে দিলে ঘরে চলে যেতে পারব।

—বেশ চলুন। বলে তুলে ধরতেই মনে হল যুবতীর মাথা ঘুরে গেছে। সে বসে পড়ল।

—আপনি বন্ধরের রাস্তাটুকু হেঁটে পার হতে পারবেন না। বরং এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন।

—আমার ভয় করছে মিষ্টার, সে আবার আসতে পারে। অত্যন্ত কাতর চোখে অবনীভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

—আপনি ঘুমোন, আমি বরং দরজায় পাহারা দিচ্ছি।

যুবতী আর কথা বলতে পারল না। চোখ জলে ভার হয়ে গেছে।

আর অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘ দিন পর সে এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছে। সে বলল, আমি বাইরে বসে থাকছি, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন—বলে অবনীভূষণ দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ভিতর পা মুড়ে বসে থাকল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল—দ্বীপের স্বপ্ন, বড় এক বাতিঘর দ্বীপে—সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক, খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই। স্মৃতরাং সে উঠল না এবং এই দুঃখকর রাত্রি জীবনের প্রথম আলোর পথ বলে মনে হল অবনীভূষণের।

## দুই

সমুদ্রে বুষ্টি পড়ছে। প্রথমে ইলশে-গুঁড়ি, তারপরে জোরে। জোরে বুষ্টি নামল। মাঝুলের গা বেয়ে বুষ্টি ডেক ভিজাল। এখন ফন্ডা ভিজছে। গ্যালীর ছাদ থেকে ত্রিজের ছাদ, চার্টরুমের ছাদ সব ভিজছে। কুয়াসা-ঘন ভাব বুষ্টির। সেলিম ফোকসালে কাসছে। বুষ্টি, সমুদ্র এবং জাহাজ সেলিমের বুকের যন্ত্রণায় কাতর হল না। বুষ্টি পড়ছে—পড়ছে। সমুদ্রে তরঙ্গ। জাহাজ নীল জলে নোনা রঙে সঁতার কাটছে। সেলিম শরীরে কঁকল জড়ালে তখন। ফোকসাল যখন খালি, বাংকে যখন কেউ নেই, জাহাজীরা যখন ডেকে দড়িদড়া টানছে তখন কঁকলের নীচে শুয়ে বিড়ি ধরানো যাক। সে বিড়ি ধরালো এবং কঁকলের নীচে বিড়ির ধোঁয়াকে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর কঁকলটা দিয়ে গোটা ধোঁয়াকে চেপে ধরে দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। কেউ সিঁড়ি ধরে নামছে না। সে নিশ্চিন্ত হল। অথচ পোর্টহালের কাঁচে সমুদ্র এবং আকাশের প্রতিবিম্ব। সেলিম সে কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বও দেখল। চোখ-দুটো ওর পালক ওঠা মুরগীর মতো। চোখ-দুটো পোর্টহালের কাঁচে আকাশ এবং সমুদ্রের মতো নীল হতে পারেনি। সাদাটে অথবা বরফ-ঘরের চার-পাঁচ মাসের বাসি গোস্তের মতো। সেলিম কাসির সঙ্গে রক্তের দলাটা কঁাত করে গিলে ফেলল এবার।

দুপুর থেকে শুনে আসছে—উপকূল দেখা যাচ্ছে। সকলে ডেক-এ চীৎকার করছে—কিনারা দেখা যাচ্ছে। সকলে উপরে হুলা করছে। সেলিম কোনরকমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল, সেও মাটি দেখবে, মাটি দেখে উত্তেজিত হবে, কিন্তু সিঁড়ির মুখেই সারেঙের ধমক, কোথায় যাচ্ছ মিঞা! ময়ূরের দাওয়াই কানে বাধতে চাও। সেলিম ভয়ে ফের ফোকসালে নেমে এসেছিল। সে বাংকে শুয়ে সব যেন ধরতে পারছে—যেন কিছু সমুদ্রপাখী কন্ডায় বসে ভিজছে। পাখীরা কন্ডায় একদা বসতের মতো আশ্রয় নিয়েছে। উপকূল দেখে অথবা বীপ দেখে

ওরা উড়ছে। এমত ভেবে সেলিম কাসল। সমুদ্রপাখীরা হয়ত এতক্ষণে উড়ে গেছে। ওর জানার ইচ্ছা হল ওরা আকাশে উড়ছে, না দীপের পাশাপাশি কোথাও উড়ছে। আর কেন জানি এই সময় বারবার ওর বিবির কথা মনে হচ্ছে। বিবির মুখে সুখের ইচ্ছা, সখের ইচ্ছা। সেলিমের শরীরে যন্ত্রণা, বৃকে যন্ত্রণা। সে যেন বলতে চাইল—এবার আমরা ফিরব, বিবি। ছোট ঘরে তুই তোর খসমের মুখ দেখবি। জাহাজ এবং সমুদ্র উভয়ই আমাদের বিনাশ করতে পারেনি। আমি ফিরব, ফিরব। আমরা ফিরব। খতে এমন একটা প্রত্যয়ের কথা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে সেলিমের।

দীর্ঘ সফর, নোনা পানীর অগ্নীল একবেয়েমি এত দিন ওকে দেশে ফেরার জন্তু মাতাল করতে পারেনি। সেলিম দুবার দুটো ওয়াচ করেছে, ফোকসালে এসে শুয়েছে হাত-পা ছড়িয়ে, অগ্নীল চিন্তা করতে করতে সমুদ্রের বৃকে ঘুম গিয়েছে; অথবা হিসাবের কড়ি গুণে—সফর শেষ হতে কত দেরী—এইসব ভেবে স্থান-কাল-পাত্রের কিংবা বন্দরের বেঞ্জামেয়ের হিসাবের কড়ি গুণেছে। গুণতে গুণতে ওর একদিন দুটো কাসি উঠল। বিকেলে তিনটে এবং এই করে জর। বন্দর থেকে বন্দর ঘুরে জর বেড়েছে। শরীর ভেঙেছে। শেষে এক বন্দরে কাপ্তানের কাছে আর্জি পেশ করেছে—সাব, একবার হাসপাতালে যাব। কাসির দেমাকে আর বাঁচছি না। মনে হচ্ছে মরে যাব।

এই নিয়ে অগ্নি ফোকসালে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, এ বন্দর নিয়ে পাঁচ বন্দর হবে অথচ সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সেই কবে ফ্রি-ম্যান্টেল বন্দরে ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল, আর নয়, আর জাহাজে রাখা চলবে না। বন্দরে নামিয়ে দিতে হবে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এ-অবস্থায় জাহাজে রাখা নিরাপদ নয়।

সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সে কাসছে। কাসির সঙ্গে রক্ত উঠলেই কৌত করে ঢোক গিলছে। কিছুদিন থেকে এটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সে সকলকে বলছে কাসির ব্যামোটা তেমন নয়। ওটা ছেড়ে যাবে। কোম্পানী দামী দামী ওষুধ দিচ্ছে। দিচ্ছে বলেই এবং বাড়ীয়ালা গা করছেন দেখে সেও বুঝেছে ওটা ধীরে ধীরে সেরে যাবে। কাসি যখন বেশী হয় তখন সেলিম অপরাধের কথা ভাবে। নিজের অপরাধের কথা। বিবিকে নিয়ে অথবা বন্দরে দেখা কোন মেয়েকে নিয়ে বিছানার পড়ে থেকে অগ্নীল ধারণায় অথবা অগ্নীল আবেগ মেখে শরীরে উত্তাপ সঞ্চয়ের বুধা চেষ্টা না করলেই হত। অথচ রক্ত কম উঠলে ওষুধে

কাজ করছে এমন ভেবে সে খুশী হয়। ওর ইচ্ছা ওর দুরূহ রোগের কথা কেউ না জাহুক, কেউ না ভাবুক সে দুরূহ রোগে ভুগে মরে যাবে। অথচ সে প্রত্যয়ের ঘোরে এই ভেবে খুশী—সে ঘরে কিরবেই। বিবি তার খসমের মুখ দেখে উজ্জল হবেই। এ-শরীর সে কিছুতেই সমুদ্রে অথবা বিদেশে-বন্দরে রেখে যেতে চাইছে না। সে সকলকে শুধু বলছে—জাহাজ কবে কিরবে? কবে আমরা ঘরের বন্দর পাব?

জাহাজীরা কেউ বলেছে, সিডনী থেকে পুরানো লোহা নিয়ে জাহাজ যাবে জাপানে।

কেউ বলেছে, গম নিয়ে তেলবাড়ী।

সেলিম এইসব খবরে বিষণ্ণ হয়েছে। খুব অসহায় ভঙ্গীতে পোর্টহোলে মূগু-রেখে দিগন্তরেখায় নিজের দেশকে খুঁজছে। কখনও অপলক সমুদ্র দেখেছে। জলের নীল বিস্তৃতি দেখেছে।

সেলিম স্থির করল কাপ্তানকে শেষবারের মতো বলবে, আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন, মাস্টার। ঘরে কিরে আমি বিবির কোলে মাথা রেখে মরব। জাহাজে আমি মরবনা। সমুদ্রে আমি মরব না। বিদেশ-বন্দরে আমি মরব না। শুয়ে শুয়ে সেলিম এইসব ভেবে উত্তেজিত হতে থাকল।

তখন সিঁড়িতে শিস দিচ্ছে বিজন। সেলিম শুয়ে শুয়ে শুনেছে। 'এ-কেবিন সে-কেবিন সে উকি মারল। এন্জিন-পরীদাররা ঘুমোচ্ছে। এন্জিন-পরীদাররা (যারা চারটা-আটটা পবীদার) গল্প কবছে। বিজন লক্ষ্য করল শিস দিতে দিতে, সতেরো মাস সফর ওদের ক্লান্ত করতে পারেনি। বিষণ্ণ করতে পারেনি। জাহাজটা আরও যদি সতেরো মাস সমুদ্রের নোনা জল ভাঙে, যদি আরো সতেরো মাস বন্দরে না ভিড়ায় তবু নিশ্চিত নির্ভয়ে জাহাজ চালিয়ে যাবে। বিজন দ্বিতীয় সিঁড়ির মুখেই শুনল—সেলিম কাসছে। কাসিব জন্য দম নিতে পারছেন না। বিজন আর শিস দিল না। প্রতিদিনের মতো সে ফের সেলিমের জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সে ফোকসালে ঢুকে বলল, এবার কাপ্তান সাহেবকে বল হাসপাতালে দিতে। এ-ভাবে আর কতদিন বাঁকে পড়ে থাকবি। রাতে জাহাজ বন্দর খরঁবে।

সেলিম মুখের ওপর থেকে কঞ্চলটা সরাল। চোখদুটোতে নোনা পানী অথবা আকাশের রঙ নয়, কালো রঙ নয়, অথবা বেতকলের মতো রঙও ধরতে পারেনি—অথচ আশ্চর্য এক রঙ ধরেছে যা দেখলে সকলের ভয় হবে। অথচ

মায়ী হবে। সকলের মনে হবে, সেলিম রহমানে রহিম হওয়ার জন্য শরীর স্থির করতে চাইছে। এবং বাংকের সঙ্গে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হতে চাইছে।

বিজ্ঞান বলল, বলিস তো আমরা সকলে মাস্তার দ্বি'। সারেঙকে বলি মাস্তার দিতে। এভাবে আর কতদিন ভুগবি। জর কাসি—দেখেগুনে তো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।

সেলিম সহসা উঠে বসল। তারপর আশ্চর্যকর্মের সিন্ধু এবং করুণাঘন মুখ করে হাসল। তারপর ফের দুঃখময় প্রকাশে বলল, বিজ্ঞান রে তোর মতো যদি একটু ইংরেজী বুলি জানতাম, তবে আমার সব হত। সারেঙ আর কাপ্তান কি বুঝিই করেছে খোদাই জানে। তুই সকলকে বলে কয়ে মাস্তার দে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বল। দেশে ফিরে বাঁচি।

বিজ্ঞান এই বাংলা বসে কি করে যেন বুঝল সেলিমের এই দুর্ভাগ্য রোগ নিয়ে জাহাজে যত্ন চলছে। সে ভেবে অবাক হল, কেন যে সারেঙকে বলল না, ওকে এবার অন্য ঘরে রাখতে হবে আর অন্য উপায় নেই অথবা কেন যে মেজ মালোমকে ডেকে একবার চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা বলতে পারেনি এতদিন! সেও আজ পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্র দেখল। তারপর উপকূল। উপকূলে পাখীরা ফিরে যাচ্ছে। সেলিমের মুখ পাণ্ডুর। জাহাজটা চলছে এবং সেলিমের শরীর নড়ছে। সেলিমকে দেখলে আত্মহননের কথা মনে হয়। বিজ্ঞান বাংলা থেকে ওঠার সময় সেলিমকে ফের লক্ষ্য করল। ওর কবলের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে হাসল। সেলিমও হাসল। ওরা পরস্পর দুঃখটুকু ধরতে পেরে ফের দুজনই অন্যমনস্ক হতে চাইল। বিজ্ঞান দরজা ধরে বের হচ্ছে। সারেঙের ঘরে উঁকি মেরে সে দেখল, তিনি নেই। কোকসালে নেই। নিশ্চয়ই মেজ মালোমের কেবিনে অথবা ফরোয়ার্ড-পিকে আছেন। বিজ্ঞান ডেকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকল।

বন্দরে জাহাজ ভিড়বে বলে সারেঙ ডেক-কসপের নিকট দড়িদড়ি সব বুঝে নিচ্ছে। বিজ্ঞান ডেক অতিক্রম করে কসপের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে একবার দাঁড়াল। বড় মালোমের পোর্টহোলে উঁকি দিল। বড় মালোম কেবিনে নেই। বিজ্ঞানের ইচ্ছা হল বলতে বড় মালোমকে—আপনার জাহাজে এমন একটা দুর্ভাগ্য রোগ পুবে রাখছেন, সেলিমকে হাসপাতালে দেওয়া হবেনা, দেশে পাঠানো হবেনা, কোম্পানীর টাকা বাঁচানো হবে, অন্যান্য জাহাজীরা পর্যন্ত নিরাপদ নদ—এমতাবস্থায়ও আপনারা চুরি করে মদ গিলতে পারছেন!—আশ্চর্য। সে ভেবে



আন্দ্রুল। সে হাঁটল।

সে সারেঙকে বলল, চাচা, চোখ বুজে আর কতদিন থাকবেন ?

সারেঙ কিসকিস করে বলল, তোমার এত মাথাব্যথা কেন ? বেশ তো আছ।  
সকর করছ। তোমার তো কোন অসুবিধা করছে না কোম্পানী।

—সেলিমের মুখ দিয়ে ককের সঙ্গে রক্ত উঠছে। আপনি জানেন এটা  
অন্যান্য জাহাজীদের পক্ষে কত ক্ষতিকর। তাছাড়া দেখছি সেলিম বিনা  
চিকিৎসায় মরে যাবে। এ নিয়ে পাঁচ বন্দর হল অথচ কোন বন্দরেই ওকে  
হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করছেন না।

—সব জানি বাপু। সব বুঝি বাপু। অথচ জেনে শুনেও চুপ করে আছি।  
বাড়ীয়ালার ইচ্ছা নয় সেলিম হাসপাতালে থাকুক। কোম্পানীর অযথা এত  
খরচ করতে বাড়ীয়ালা রাজী হচ্ছে না।

—তবে ওকে দেশে পাঠিয়ে দিন। দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

দু-একজন করে তখন অন্য জাহাজীরাও ওর চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ওরা  
শুনছে। ওরা সারেঙের মুখ দেখছে। বিজ্ঞকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেই লঘু  
পরিহাসজনিত অথবা হাল্কা সুরের শিস দেওয়া মুখ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে  
গেছে। সমুদ্রের উদার নীল বিস্তৃতিতে ওরা কয়েকজন কেমন অসহায়ের ভঙ্গীতে  
পদচারণা করছে ডেকে। এন্জিনের শব্দ, সমুদ্রের তরল ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের  
নিঃশব্দ এই ভাবটুকুকে নিদারুণ দুঃখময় করে তুলছে।

রাত্রিতে সব জাহাজীরা যখন একত্রিত হল, একমাত্র আটটা-বারোটার  
পরীদাররা যখন নীচে বয়লারে কাজ করছে, যখন ওরা সকলে শুনল, জাহাজ বন্দর  
ধরবে সকাল দশটায়—রাতে আর পাইলট-বোট আসছে না, ডেক-জাহাজীরা  
নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, তখন ওরা বিজ্ঞের ঘরে জড়ো হয়ে বলল, আমরা সকলে  
একযোগে বিদ্রোহ করব। আমরা সকলে জাহাজ চালাব না। কাপ্তান আন্থক,  
ডেক-সারেঙ, এন্জিন-সারেঙ আন্থক—কেউ আমাদের নড়াতে পারবে না।  
আমাদের কথা শুনলে আমরা ওদের কথা শুনব। সেলিমকে হাসপাতালে পাঠালে  
অথবা দেশে পাঠালে আমরা কাজে যাব। জাহাজ চালাব।

একজন বলল, জাহাজী বলে আমরা গরু-ভেড়া নয়।

অন্যজন বলল, জাহাজী বলে আমরা বিনা নোটিশে মরব তেমন দাসবাড়  
দেওয়া নেই।

অথচ দেবনাথ বলল—বিজ্ঞ, এটা নিয়ে তোমার ক'সকর জাহাজে ?

বিজ্ঞান বিস্তৃত হল। দেবনাথ ভালোভাবেই জানে এটা ওর ক'নধর সফর। ভালোভাবেই জানে প্রথম সফরে সে কোন্ কোম্পানীর কোন্ জাহাজে কাজ করেছে। তবু দেবনাথ যখন এমন একটা প্রশ্ন কবল এবং দেবনাথ যখন খুব জরুরী ভেবে ওকে প্রশ্নটা কবেছে তখন একটা যথোচিত উত্তর দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সে বলল, তুমি তো জান, দেবনাথ—এটা আমার দু'নধর সফর।

—এখনও তুমি ঠিক জাহাজী হওনি। তাবপব কি ভেবে বিজ্ঞানকে দেবনাথ অন্য কোকসালে নিয়ে গেল। এখানে কেউ নেই, কেউ থাকে না। জাহাজীরা এখানে কাজে যাওয়াব আগে জামা-কাপড় ছাড়ে। ঘরটা একেবারেই খালি। দেবনাথ ভিতর থেকে দবজাটা বন্ধ কবে দিল। এবং বলল, তুমি এব মध्ये থেক না। শেষে সকলে বেঁচে যাবে, কেবল তুমি মাঝে পড়বে। কাপ্তান তোমাং নলী খাবাপ কবে দেবে। তখন তোমার পিছনে ওবা কেউ দাঁড়াবেনা। আমি ওদেব ভালোভাবে চিনি।

• বিজ্ঞান কথা বলল না। চুপ কবে দেবনাথের পরামর্শ শুনল। শেষে জবাব দিল, কিন্তু সেলিম যে মবে যাবে ?

—মবে যাবে তো তুমি কি কববে ? তোমাং উপব ট্যাংল আছে, সারেঙ আছে—ওবা দেখছেনা, তুমি দেখে কি উপকাবটা সেলিমের কববে ? এটা মাত্র তোমাং দু'সফর। অনেক দেখবে কিন্তু জাহাজে বিদ্রোহ কবলে চলবে না।

—তাব জন্য কোন প্রতিকাবেব দাবী আমবা তুলব না।

দেবনাথ খুব অভিজ্ঞ লোকেব মতো বলল, বস্বেব নৌবিন্দ্রোহেব আমি আসামী। তাই তোমাকে এতগুলো কথা বললাম। তোমাকে মাস্তাব দিতে বাবণ কবলাম। তা ছাড়া আমি এইসব জাতভাইদের চিনি। ওবা শেষ পর্যন্ত তোমাং কথা কেউ বলবে না। ওরা ওদেব জাতভাইদের কথা বলবে, সারেঙেব কথাই শুনবে। মাঝখান থেকে তুমি ব্ল্যাক-লিষ্টেড্ হবে।

বিজ্ঞান আব কোন কথা না বলে দরজা ঠেলে বেব হয়ে এল। সে দেখল, সকলে ওর ঘরে তখনও পরামর্শ করছে। সকলে উদ্গ্রীব হয়ে আছে। বিজ্ঞানকে দেখে ওরা বলল, চল মাস্তাব দি বোট ডেক-এ।

বিজ্ঞান দেবনাথের কথাগুলো আর একবাংয়ের জন্য ভেবে নিল। অীর একবাংয়ের জন্য সকলের মুখ দেখল। সকলের মুখ ভয়ানক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান বুঝতে পারল—এই সমস্ত মুখের ছবি মিথ্যা হবার নর। ওরা কখনই ওকে অন্ধকার পৃথিবীতে ঠেলে দেবে না। বিজ্ঞান দৃঢ় গলাং কিছু বলতে বাজিল, তখন

সারেঙ নীচে নেমে এসে ডাকল—ইসকান্দার, সামসুদ্দিন, রহমান, শোভান।  
 ওরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে একান্ত বশংবদের মত বের হয়ে যাচ্ছে। সারেঙ  
 বলল, কাপ্তান তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এই ঘটনায় বিজন খুব ভেঙে পড়ল। এবং অসহ্য উত্তেজনায় ভুগতে থাকল।  
 প্রচণ্ড শীতের ভিতর সে ওর নিজের ঘরে পায়চারি করছে। দেবনাথ উপরের  
 বাংকে শুয়ে নির্বিশেষে ঘুমুচ্ছে। পোর্টহোল দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বলে বিজন  
 কাঁচটা বন্ধ করে দিল। সারেঙের সেই রক্তচক্ষুর কথা মনে হল এবং ভাবল কত  
 সহজে সব নাবিকদের নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সে এই ফোকসালে, এই  
 ঠাণ্ডায় পায়চারি করতে করতে ধরতে পারছে। ধরতে পারছে—সারেঙ ওদের  
 কি বলছে এবং কি বলে ওদের ভয়ানক প্রত্যয়কে ভেঙে দিচ্ছে। সেলিম এখনও  
 কাসছে তার ফোকসালে—ফোকসালের অগ্নি বাসিন্দা কোরান-শরীফ পাঠ করছে  
 বাংকে। সে পায়চারি করতে করতে সব গুনল। জাহাজটা নোঙর কেলে  
 আছে—বলে স্টীয়ারিং-এন্জিনে কোন শব্দ নেই। সব কেমন নিঃশব্দ, সব কেমন  
 নিঃশব্দ যেন। ডেক থেকে সারেঙের কথা ভেসে আসছে। সকলকে সারেঙ  
 জোর গলায় কথাগুলো বলল। বলে ওদের ভয়ানক বিদ্রোহের প্রতিবিম্ব মুছে  
 ছিল। সারেঙ ওদের বলল, তোরা তো জানিস কলকাতা বন্দরে চল্লিশ হাজার  
 নাবিক খোদা হাক্কেজ বলত, এখন কিছু কিছু লোক ঈশ্বর, ভগবান বলতে শুরু  
 করেছে। তোরা যদি বাঙালীবাবুদের কথায় মাতিস, তোরা যদি জাহাজে বিদ্রোহ  
 করিস তবে তোদের চল্লিশ হাজার চল্লিশে নামতে আর বেশী দেবী নেই।

এক সময় কাপ্তান সারেঙকে ডেকে পাঠালেন।

ত্রিজ থেকে কাপ্তান বললেন, কি বলছে সব?

ভাড়া ভাড়া ইংরেজী এবং হিন্দিতে ডেক-সারেঙ বলতে থাকল, সব গুড, সাব।  
 সব ঠিক হায়া। জাহাজী লোক ভেরী গুড, সাব। বাঙালী বাবুলোক নো গুড,  
 সাব। বাঙালী বাবুলোক গিড্‌স্ ট্রাব্‌ল্‌। বাঙালী বিজন, ইয়েস বিজন  
 ডেইশ রূপায়াকা খালাসী, ও তো সাব রিংলীডার আছে। দুইটা চারটু ইংলিশ  
 স্পীকিং আছে, সাব। প্যাসেট্‌কে নিয়ে কুচ কাইট দেনে মাংতা। লেকিন  
 নাও অলরাইট, সাব। বিগ্‌ বিগ্‌ টক্‌ লেকিন নো জব্‌। ভেরী লেজী বাগার।  
 সারেঙ এই পর্যন্ত বলে পায়ের কাছে থুথু ফেলল। কের মুখ তুলতেই দেখল  
 বাড়ীয়ালা নিজের কেবিনে ঢুকে গেছেন। কেবিনে পেয়লা-পীরিচের শব্দ।  
 নীচে অকিসার-গ্যালারীতে চীক কুক আঙুন পোহাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে নামবার

সময় সে এখানেও থুথু কেলল।

সমুদ্রে সূর্য উঠছে। একদল পাখী উডছে আকাশে। দূরে ইতস্তত জাহাজ নোঙর করা। অনেকগুলো বয়্য অতিক্রম করে পাইলট-শিপ। অনেকগুলো জেলেডিডি এই শীতেব ভোরেও মাছ ধবতে বের হয়ে পড়েছে। আকাশ নীল, সমুদ্র নীল। জাহাজেব চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। ওরা সমুদ্র ধবে উপকূলে উঠে যাচ্ছে। উপকূলের স্বাই-জ্যাপারগুলো ম্যাচবাক্সের মতো মনে হচ্ছে। এইসব দেখাব জগু জাহাজীরা ডেকে দাডাল। অথবা দড়ি-দড়া টানাব জগু ডেক থেকে টুইন-ডেকে নেমে যাচ্ছে। এখন ওরা দড়িদড়া টানছে। হাসিল নীচে নামিয়ে দিতে চাইছে। মেজ মালোম গলুইয়ে চল এসেছেন। বড মালোম ফরোয়ার্ড-পিকে চল গেছেন। বিজন হাসিল কাঁধে বড মালোমেব পিছুন ছুটছে। ভিনটে টাগ্‌বোট এসেছে, পাইলট এসেছেন। পাইলট ডেক থেকে বোট-ডেকে এবং শেষে ব্রিজে উঠে গেলেন।

বড মালোম বললেন, গতকাল তুমি জাহাজীদের উত্তেজিত কবেছিলে ?

বিজন হাসিল পায়ের নীচে বেখে বলল, হ্যাঁ, স্ত্রাব। করেছিলাম।

—আমি খুশী হয়েছি শুনে। বড মালোম কসপকে স্টোর-কমে যেতে বলে এ-কথাগুলো বিজনকে বললেন।

ওদেব ভিতব আর কোন কথা হল না। একদল জাহাজী ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে গেছে। ওবা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরাচ্ছে, ওরা উইঞ্চ চালাচ্ছে। তারপব হাপিজ-হাডিয়া এই ধরনের কিছু শব্দ। বিজন এবং অন্যান্য জাহাজীরা প্রায় আধঘণ্টা ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে কাজ কবল, বিজন এবং অন্যান্য জাহাজীব, সেলিমের দুঃখ, বন্দরের জীবন এবং দেশে ফেরার অথবা জাহাজে প্রথম দিনেব গল্প নিয়ে কিছু সময় মস্করা, কিছু কাঁচা খিস্তি করল। কাজ শেষ হলে নীল উর্দি ছেড়ে ওরা দাড়িয়ে থাকল ডেকে। কেউ নীচে নামল না। খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। ওরা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখল। সমুদ্রের খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। দুপাশে পাথরের পাহাড়; অতিকায় তিমি মাছেব মতো কালো কালো সব পাথর। পাথরের পাহাড়। কুৎসিত এইসব পাথরের পাশে ছোট ছোট অনেকরকমের কার-জাতীয় গাছ। পাতাগুলো শীতের হাওয়ায় কাঁপছে। নীচে সব নোকো-বাইচ হচ্ছে। দুপাশের জনতা চীৎকার করছে। এইসব দৃশ্যে ওরা সকলে মাটির গন্ধ নিতে চাইল এবং এই জনতার মতো উন্মত্ত হতে চাইল। এইসব দৃশ্য দেখে বিজন জাহাজী যন্ত্রণার উপশম খুঁজছে।

অথচ বিজন দীর্ঘ দু'সকরে প্রকৃত জাহাজীর মতো বাঁচতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুব বিব্রত হয়ে পড়ছে। পরিবারের কিছু সংস্কার, বিশেষত ধর্মের—সে কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। এখনও বীক্-গ্যালারীতে এলে সে ভালোভাবে খেতে পারে না। দেবনাথের মতো গোমাংস-ভক্ষণে তৃপ্তি নেই। জাহাজীদের প্রচণ্ড বকমেব ইতব জীবনকে সে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ এইসব ইচ্ছাগুলো তাকে মাঝে মাঝে টানে। তখন সে কাঁচা খিস্তি কবে, শিস দেয়, অযথা কোকসালে বসে বড়ের টব বাজায় এবং কাপ্তান ও তাঁর পাবিশদদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য কবে।

বিজন একদা কিছু লেখাপড়া করেছিল অর্থাৎ গ্রামের বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করেছিল। অন্য দশটা অসামাজিক ছেলেছোকরার মতো বাড়ী পালিয়ে জাহাজের খালসীতে নাম লেখানি। বেঁচে থাকার জন্য এবং এই জীবনকে আবও দীর্ঘ করার জন্য এই জাহাজের কাজ, জাহাজী হওয়া। ‘হালিসহব’ এবং ‘ভল্লা’র ট্রেনি শেষ করেছে একদা, জাহাজের প্রথম সর্কবে দুনিয়া ঘুরেছে এবং ইংবেজী বুলিতে বপ্ত হযেছে। জাহাজী হয়ে উপবী পাওনা হিসাবে চটপট পবিবেশকে মানিয়ে চলাব স্বভাব এবং দেহজ আবেগধর্মিতাব জন্য মাল্লষের ভালো করার স্নুকোমল বৃত্তিব কিছু অধিকার সহজে পেয়ে গেছে। সেজন্য সেলিমকে কেন্দ্র করে একটি অশেষ দুঃখ ওকে এখনও মাঝে মাঝে উত্তেজিত করেছে। খাডিব সন্ধীর্ণতা এবং মাল্লষের এই আনন্দ সেই অশেষ দুঃখকে যেন আবার বাড়িয়ে দিল। সে বড় মালোমকে বলল, কতদিন থাকব এখানে স্তার? যেন তার জাহাজ ভালো লাগছে না।

বড় মালোম বললেন, বলতে পারছি না। এন্জিনরুমে ইন্সপেকশান আছে।

সারেঙ বলল, সরকাই হবে জাহাজে। জাহাজ বন্দবে বসবে। ঠিক তখনই বিজন দেখল দুজন জাহাজী সেলিমকে ধবে ধরে বোট-ডেকে নিয়ে তুলছে।

কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে সেলিম বলল, সাব, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। সাবের ভাড়া ভাড়া ইংবেজীতে কথাটা অস্বাভাবিক বলে শোনাল।

কাপ্তান বললেন, আমিও তাই চাইছি। হাসপাতালে দিলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়বে না। জাহাজ এখান থেকে তোমার দেশেই যাচ্ছে। এই বলতে গিয়েই দেখলেন কাসিব সঙ্গে সেলিমের মূখে রক্ত। সকলের সামনে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে সে এখানেও ককটা গিলে ফেলল। কাপ্তান ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন। তাহলে অন্যুখটা অনেকদূর গড়িয়েছে। কোম্পানীর ওয়ুথ এবং ইন্জেকশন কোন কাজে আসেনি। তিনি সারেঙকে ডেকে বসেছিলেন ওকে সকলের

সঙ্গে রাখা চলবেন। ওকে ওপরে তুলে আন এবং কোন খালি কেবিনে ফেলে রাখ। ওর ভাতের থালা এবং মগ ভিন্ন করে দাও। তোমরা কেউ ওর জিনিসপত্র ব্যবহার করবে না। কাপ্তান সারেডকে অন্যত্র নিয়ে কথাগুলো বললেন। বললেন, সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে সেলিম দুর্ভাগ্য রোগে ভুগছে। যে কটা দিন বাঁচে এ-জাহাজেই বাঁচুক।

তারপর তিনি সেলিমের সামনে এসে বললেন, জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই তোমাকে কোম্পানীর ভালো ডাক্তার দেখানো হবে। আশা করছি তুমি শিগ্গীরই ভালো হয়ে উঠবে। ‘ঈশ্বর তোমায় করুণা করুন’ এই বক্তব্যে তিনি স্বয়ং যেসাস-এব মতো চোখ বুজলেন।

বাড়ীয়ালাল এই পাত্রীশূলভ চেহারাতে সারেড বিমুগ্ধ হল। পীরপয়গম্বরের মতো তিনি হয়ত কোন ওস্তো সারেডকেও দোয়া জানাবেন। সে এবারে বলল, সাব, ইউ ফাদার। ইউর শিপ, ইউর ম্যান, ইউ সি সাব এভরিথিং। সারেড এইসব বলে এই মুহূর্তে দোয়া ভিক্ষা কবছে। অর্থাৎ সেলিমের প্রতি বিগলিত করুণার অংশীদার হতে চাইছে।

বিজ্ঞান ডেকে কাজ করতে করতে সব দেখল। সে জাহাজ জেটিতে বাঁধতে দেখল। বন্দরের পথ ধবে সব সहरবাসীরা সামনের বুলবুল ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। কিছু টিনের গোল্ড অতিক্রম করে মাঠ। সেখানে মেয়েপুরুষরা এই শীতেও ক্রিকেট খেলছে। সে দেখল সেলিমকে ডেকের উপর দিয়ে দুজন লোক সেই নিঃসঙ্গ কেবিনটায় নিয়ে যাচ্ছে। সেলিম সেখানে থাকবে, সেখানে খাবে, সেখানে শোবে। বিজ্ঞান এও বুঝল যেন সেলিম আব বেসীদিন বাঁচবেন। জাহাজের ওই ঘরটাতেই অন্যদিন বিজ্ঞান এবং অন্যান্য কয়েকজন জাহাজী মিলে কিছু পাথর, দুটো বড় গানী-ব্যাগ যত্ন করে এক কোণায় রেখে দিয়েছিল। জাহাজে মৃত্যু হলে সমুদ্রে এইসব পাথর এবং গানী-ব্যাগ দিয়ে সলিল-সমাধি দেওয়া হবে। দেহজ আবেগ-ধর্মিতার জন্য ওর স্নাকোমল বৃত্তির। ওকে ফের অশেষ দুঃখময় যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কাপ্তানের নিবেদন আছে বলে সে আর ঘরে ঢুকল না। পোর্টহোলের কাঁচ কাঁক করে দেখল, সেলিম বাঁকে গুয়ে সেই পাথর এবং গানী-ব্যাগগুলো দেখছে। শরীরটা ওর স্থির। সে এখন কক চুরি করে গিলে খাচ্ছে। এখন সে নীচের পাথ্রে কক ফেলছে। এবং সঙ্গে কিছু রক্ত পুঁজ ফেলছে। পোর্টহোল দিয়েই বিজ্ঞান কথা বলল, বিকেলে ভাবছি কিনারায় যাব। তোর জন্য কিছু আনব কি ?

—কি আর আনবি। মুখে আমার বিশ্বাস শুধু।

—কিছু কমলা, কিছু আপেল ?

—সে অনেক দাম। অত দামের ফল আনবি না। আমার টাকার বড় দরকার, বিজন। দেশে ফিরব। শরীরের চিকিৎসা আছে, বিবি আছে, বাচ্চা আছে। ওদের জন্য ঘর করতে হবে। জমি করতে হবে। ঘর জমি হলে জাহাজে আর সফর দেব না। জমি-জিরাত দেখে, বিবি বাচ্চা দেখে আল্লার ঘরে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

বিজনের মুখে বিষন্ন হাসি। পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করে দেবার সময় সে ইচ্ছা করেই সেলিমের শরীর থেকে জোর করে চোখ তুলে নিল। ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভিতর যে মুখ, যে মুখে একদা বসন্ত হয়েছিল, যে শরীর বাচ্চার জন্ম দিয়েছে—সেই মুখ। শরীর এবং দাড়ি ওর চোখের সামনে মৃত অক্টোপাসের মতো পচা দুর্গন্ধময় ফুলোফুলো সব হয়ে যাচ্ছে। সে জোর করে পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করে দিল এবং ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

ভোর থেকেই সমুদ্র হতে হাওয়া 'উঠে' আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া। বিকেলে সে-হাওয়ার গতি আরো বাড়ল। প্রচণ্ড শীতে বিজন ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল এবং কোনরকমে মাচটা বের করে সিগারেট ধরাল। এখানে হয়ত দু'দিন পর বরফ পড়বে, সে এমত ভাবল। প্রচণ্ড শীত মাটির শেষ উত্তাপটুকু যেন শুবে নিচ্ছে। দূরে পাইনগাছগুলো থেকে পাতা ঝরছে। গাছগুলো ক্রমশ হালকা করছে শরীর। তারপর একদিন এই শীতের দৃশ্য প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রস্তরীভূত হবে যেন পাইনগাছগুলো। পাখীরা এদেশে থাকবে না। ওরা অন্য দেশে পালাবে। ওরা অন্য দেশে ঘর বাঁধবে। আশির মতো আকাশ। রোদের উত্তাপশূন্য হলদে রঙ জাহাজের উপর ছায়া ফেলে অনেকদূর চলে গেছে। পাইনের শাখাপ্রশাখায় পাখীর বাসাগুলো ঝুলছে। রোদ সেখানেও যেন চুরি করে উত্তাপ দিচ্ছে। তারপর জেটি অতিক্রম করে পথ। সে পথের মেয়েপুরুষদের দেখতে দেখতে নীচে নেমে গেল। একটি বাদামগাছের নীচে দাঁড়াল। এখানে দুটো পথ। সে কোন পথে যাবে এমত চিন্তা করল দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দর ধরলে এক অনন্য স্মৃতির সন্ধান সে পায় এই মাটির স্পর্শে। বাদামগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ মাটির স্পর্শ নিয়েছিল। সামনে শুধু সড়ক। ইট কাঠ। মাটির কোন গন্ধ নেই সেখানে। সেখানে শুধু যানবাহন কিছু কোঁরীপাইনের ছায়া পথের দু'পাশে অথবা এভিছার মোড়ে মোড়ে আলো।

জলছে—কাঁচের ঘর, মাংসের দোকান, রেস্টোরাঁ, ক্যাফে, পাব্। কোথাও ডেইজী ফুলের প্রদর্শনী অথবা আরো পিছনে সমুদ্রের বাঁড়ির অভ্যন্তরে নৌকা-বাইচ। এইসব ভালো লাগলেও মাটির স্পর্শেব মতো সুখপ্রদ নয় যেন এরা। তবু সে হাঁটছে। তবু এই মানুষেব ভীড়ে মাটির গন্ধের জন্যে হারিয়ে যেতে ভালো লাগছে। সে দেবনাথের সঙ্গে বের হয়নি। দেবনাথ জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই কোন পাব্ অতুসন্ধান করবে, প্রথমে পেট ভবে অন্তত বিয়ার খাবে এবং মাতলামো করে সমুদ্রের নীল যন্ত্রণা কিছু সময়ের জন্যে ভুলে থাকবে। কোন পাব্ অথবা কুকুরের রেসে না গিয়ে এখন শুধু এইসব সুন্দরী বমণীদের ভীড়ে বিজনের হাবিয়ে যাওয়া। সে এই ভীড়ে হাবিয়ে যেতে চায়। কেমন এক অঙ্গীল শব্দী চিন্তায় দু'দণ্ড সে ওদের সঙ্গে কথা বলে সুখ পায়। অথচ সে ওর দেহজ কামনাকে রূপ দেবার ভঙ্গিটুকু এখনও ইচ্ছা কবে আবিষ্কার কবেনি। মূলত সে ভালো ভাবের জাহাজী হয়ে বাঁচতে চায়।

সে একটা দোকানে ঢুকে কিছু ফল কিনল সেলিমের জন্য। মেয়েটি ওর হাতে ফলের প্যাকেট দিয়ে মাথা নোয়াল এবং হাসল। বিজন একগুচ্ছ মিমোসা ফুল দেখেছিল মিসিসিপি নদীর তীরে—কোন যুবতী ওকে ফুলের গুচ্ছটি দিয়েছিল, এ-মেয়েব হাসি সে-যুবতীকে স্মৃতির কোঠায় এনে দিল।

সে ফলের দাম দিয়ে প্যাকেট হাতে রাস্তায় নেমে এল। ফেস্ট-ক্যাপটা আর একটু টেনে দিল কপালেব উপর। এবং ওভারকোট টেনে পথের ভীড়, বিশেষ করে পথের সব সুন্দরী রমণীদের দেখতে দেখতে বুলন্ত ব্রিজের রেলিঙে এসে দাঁড়াল। সমুদ্র থেকে এখন তেমন জোরে হাওয়া উঠে আসছেনা। সে এখানে দাঁড়িয়ে তা টের পেল, দুটো খোলা গাড়ীতে পুরুষ-রমণীরা হাসতে হাসতে বন্দর থেকে সহরে উঠে যাচ্ছে। দুজন যুবক-যুবতী পরস্পর কোমর ধরে হাঁটছে। সে দেখল—ওরা দুজন নেমে যাচ্ছে এবং নীচে নেমে ব্রিজের ধামের আড়ালে দাঁড়াল। সে স্পষ্ট দেখল ওরা দুঃসহ যন্ত্রণার কলভোগে পীড়িত হচ্ছে। এইসব দেখে বিজন হাঁটতে পারছে না। সস্তায় কিছু মদ এবং সস্তায় যৌন সংযোগের ডাঙ্কনায় সে বিভ্রত হয়ে পড়ল। নাইটক্লেব ধরে রাত যাপনের ইচ্ছায় সে পীড়িত হতে থাকল। অথচ যেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার জন্ম হয়েছে এবং যেমন করে প্রতি বন্দরে এ-ইচ্ছার যত্নাকামনা করেছে আজও সেমত ধারণার বশবর্তী হয়ে সে হাঁটতে থাকল। ভালভাবের জাহাজী হতে গিয়ে সে গোলাপী নেশা করে জাহাজে কিরবে এমন ভাবিল।



সে জাহাজের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল। সেলিমের কোকসালের দরজা বন্ধ। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। ডাকল—সেলিম, ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

সেলিম উঠে দরজা খুলছে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে দরজা খুলতে সেলিমের খুব কষ্ট। তবু সেলিম দরজা খুলবে এবং ওকে একটু ওর পাশে বসতে বলবে। দু'দণ্ড গল্প করতে চাইবে। দেশের গল্প, জোত-জমির গল্প। বিবি-বাচ্চার গল্প। অথবা মাছ এবং বনমুরগী ধরার গল্প। অথবা বর্ষাকালে কোড়া ধরবার সময় ধানক্ষেতের আলে কেমন করে নৌকায় ঘুপটি মেরে পড়ে থাকতে হয় অর গল্প। তখন দেখলে মনে হবে সেলিম যেন এ-জাহাজেও কোড়া ধরছে। কোড়া শিকার করছে।

দরজা খুললে সে ফলগুলো সেলিমের হাতে দিয়ে বলল, তোর জন্য এনেছি।

—এতগুলো !

বিজ্ঞান একটু হেসে বলল, ভয় নেই। এবাবেও তোর কাছে টাকা চাইব না। আমি তোকে খেতে দিলাম।

বিজ্ঞান বাইরে এসে দাঁড়ালে সেলিম বলল, কোন খবর পেলি ? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, কবে ছাড়ছে ?

—ঠিক কিছু বলা যাচ্ছেনা। এজেন্ট-অফিস থেকেও কোন খবর আসেনি। বড় মালোম শুধু বললেন, জাহাজে সরকাই হবে। কাল সব সাহেব-স্ববোরা আসবেন। এন্জিন-রুমে মেরামতের কাজ আছে অনেক। জাহাজ এখানে কতদিন বসবে কান্থান নিজেও বলতে পারেন না।

এবার চুপি চুপি সেলিম বলল, জানিস, কান্থানকে আমি বললাম, সাব আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে গেলেই আমি ভালো হয়ে উঠব। কান্থান বললেন, সেজন্যই তো তোমাকে হাসপাতালে দিচ্ছি। একবার হাসপাতালে গেলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়তে চাইবে না। তার অনেক আগে তুমি দেশে পৌঁছে যাবে।

বিজ্ঞানের বলতে ইচ্ছা হল, তা ঠিকই যাবি। তার আগেই যাবি। সে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। সারেঙ এবং কান্থান মিলে সেলিমকে নিশ্চিত স্বত্বার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে আর কোন কথা বলতে পারল না সেলিমের সঙ্গে। সেলিমের বিবগ্ন দৃষ্টি ওকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে জেকে এসে নামল। কী মাছবটা কী মাছব হয়ে গেল, ভাবল। সে সিঁড়ি ধরে কের উপরে উঠেছে। সমস্ত জাহাজে আতুত এক নিঃসঙ্গতা। জাহাজের উপরে এখন যেন কেউ নেই।

কিছু কিছু জাহাজী বন্দরে নাইটিভেল ধরতে বের হয়ে গেছে—তাদের কিরতে দেবী হবে। যারা শুধু নেশা করে কিরবে তারা একটু বাদেই কিরবে। বিজয় গলুই খবে হাঁটল। সে এখানে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরাল। অন্য জেটিতে কাজ হচ্ছে বলে তার কিছু শব্দ। নীল আর্শির মতো আকাশ। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্রগামী জাহাজের আলো অথবা গ্যালীর পাশে ইঁদুরের ঘব দেখলো। কাল ভোবে এ-জাহাজের মাল নামতে শুরু করবে। অন্ধকার বাত থেকে সব লোক উঠে আসবে ডেকে। ওরা কাজ করবে, গ্যালীর আগুনে ওবা হাত-শরীর গরম করবে। আব তখন বাংকে পড়ে পড়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে কাসবে সেলিম।

ভোরবেলায় বিজয় এন্জিন ঘরে নেমে গেল। তখন সমস্ত ফকায় কাজ হচ্ছে। উইঞ্চ-ড্রাইভারবা সিগারেট ধরাবার ফুবসত পাচ্ছেন। ফ্রেন-মেশিন-চালকেরা টুপি মাথায় নীচেব ফকায় উঁকি মারছে। ফকায় ফকায় সব কুলীদেব কোলাহল। এজেক্ট-অফিস থেকে ক্লার্ক এসেছেন। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। মেজ মালোম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন এক ফকায় থেকে অন্য ফকায়। পাঁচ ফকায় পাঁচজন লোকের মুখে হাড়িয়া-হাপিজ শব্দ। মাল জাহাজ থেকে উঠছে, ফের বন্দরে নেমে যাচ্ছে।

এইসব দৃশ্যগুলো এখন জাহাজেব ডেকে ঝুলছে।

গ্যালীতে ভাগুরী নেই। বাটলারের ঘরে সে জু-দেব রসদ আনতে গেছে। ব্রিজ কাপ্তান পায়চারি করছেন। মেজমিন্ত্রী নীচে নেমে গেছেন। বড়মিন্ত্রী এইমাত্র হাই তুলতে তুলতে টর্চ হাতে নীচে নামছেন। বন্দর থেকে সব কিনারার লোক উঠে আসছে। ওরা ডেক অতিক্রম করে এন্জিন-রুমে নেমে গেল। বড়মিন্ত্রী ওদের নিয়ে সব এন্জিন-রুমটা ঘুরলেন। বয়লারের ঘর দেখালেন। ছয়টা বয়লারের ট্যাঙ্ক-টপ, চক, টানেল পথ, কন্ডেনসার, এমনকি স্নোক-বজ্ঞগুলো পর্যন্ত। তারপর ওরা বাংকারে বাংকারে ঘুরল। বিজয় অন্ধকারে কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখল। ওরা উপরে উঠে যাচ্ছে। সে ওদের দেশীয় ইংরেজী কথাগুলো কিছু কিছু ধরতে পারছে। জাহাজ এখানে বসবে অনেকদিন—এমত ওরা যেন বলল। যেন বলল, জাহাজে অনেক কাজ, জাহাজডুবি হয়নি—জাহাজীদের সৌভাগ্য।

বিজয় যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেটা পোর্টসাইডের বয়লারের নীচু অংশ। হাঁটু পর্যন্ত ছাই জমে আছে এখানে। নীচে কিছু পুরানো বোলচে, শাবল, র্যাগ, স্লাইশ। কিছু কাটার-ব্রিজের প্লেট। ওপরের আলোটা নেই। এখানে অন্ধকার। সে এখান থেকে এন্জিন-কম্পার ঘরে উঠে গেল। ডেক-কম্পার জন্য ছুটো ডায়ার

মেট চাইল। তারপর সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই বন্দরের একজন শ্রমিক বলল, শুভ মর্নিং, মিস্টার।

—ইয়েস, শুভ মর্নিং।

বিজন বুঝল লোকটি কাজের ফাঁকে ওব সঙ্গে একটু গল্প কবতে চায়। লোকটি হয়ত সন্ধ্যা সিগারেট কিনতে চায়।

লোকটি ফের বলল, ইয়ু গ্যাণ্ডিম্যান ?

বিজন বলল, ইয়েস্।

—দেবনাথ গ্যাণ্ডিম্যান ?

বিজন বলল, ইয়েস্।

দেবনাথের সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে দেখে বিজন বিস্মিত হল।

লোকটি ফের বলল, অল্ ড্যাভিওয়ান্না পাকিস্তানী ?

লোকটি তবে এইসব খবরও রাখে। সে বলল, ইয়েস্।

বিজন হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। শ্রমিকটি ওর পিছু পিছু এল। এবং পকেট থেকে একটি ইউক্যালিপটাসের বোতল বের কবে বলল, ইট্‌স্ ফর ইউ।

বিজন এবাবেও আশ্চর্য হল। দামী এই অয়েলটুকু পেয়ে বিজন খুব খুশী হল। বলল, কাম্‌ অন্। কত দাম দিতে হবে ?

—কোন দাম নেই। আমাকে এক শিশি সব্বের তেল দেবে। দেবনাথও দেবে বলেছে। তেনটা আমি মাখায় দিচ্ছি। ইণ্ডিয়া থেকে জাহাজ এলেই আমি এ-তেলের জন্য ডেকে কাজ নিয়ে উঠে আসি। তেল সংগ্রহ করি এবং তেলটা মাখায় দি'। রাতে আমার ভালো ঘুম হয়।

ওরা সেলিমের কেবিন অতিক্রম করার সময় সেলিম পোর্টহোলের ভিতর থেকে কয়েদীর মতো উঁকি দিল। সেলিম বাংকে বসে পোর্টহোল দিয়ে এইসব মানুষদের কাজ দেখছে। হাড়িয়া-হাপিজের শব্দ শুনছে। ড্যারিক উঠতে নামতে দেখছে। এইমাত্র এই পথ দিয়ে বড় মালোম গেলেন। দুটো মেয়ে গেল—বোধহয় বড়মিজীর ঘরে অথবা ছোটমিজীর বাংকে। সে এখানে বসে দূরের পাইনগাছ দেখতে পেল। এবং পোর্টহোলের কাঁচ দিয়ে বিজনকেও চলে যেতে দেখল।

শ্রমিকটি বলল, ম্যান ইজ্‌ সিক্‌।

সে বলল, ইয়েস্‌, সিক্‌। টিবিতে ভুগছে।

—টিবিতে ভুগছে! হাসপাতালে দিচ্ছে না! বড় আশ্চর্য! যেন শ্রমিকটি

ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল।

—বড় আশ্চর্য! বিজন হাঁটতে থাকল। লোকটি ওর পাশাপাশি হাঁটছে। সে বলল ফের, এ নিয়ে পাঁচ বন্দর ঘোরা হল। কাপ্তান এতদিন হাসপাতালে দেবেন-দেবেন করছিলেন, এখন গুনতে পাচ্ছি দেওয়া হবেনা। জাহাজ দেশে ফিরবে। সেও দেশে ফিরবে।

—এসব দেখেও তোমরা চুপ করে আছ!

বিজন দেখল লোকটি যেন এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করে সকলকে জানাত্তে চাইছে—জাহাজে একজন জাহাজী টিবিতে ভুগছে অথচ ওকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছেনা, কাপ্তান কোম্পানীর টাকা বাঁচাচ্ছে। আপনাবা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পেশ করুন।

অমিকটিকে বেশ চিন্তিত দেখাল। পাশের অন্যান্য কুলীলোকদের সে ঘটনাটা খুলে বলল। ওরা সকলে একত্র জমা হচ্ছে। ওরা এই নিয়ে জটলা পাকাতে চাইছে যেন। ওরা যেন বলতে চাইছে—তোমরা সেলর, তোমরা এইসব সমুদ্রগামী জাহাজগুলোকে বন্দর থেকে বন্দবে নিয়ে যাও, ঝড়ের দরিয়া পার করে জাহাজের কোম্পানীর প্রতিপত্তি বাড়াও—আর তোমাদের চিকিৎসা হবে না, তোমাদের জন্য হাসপাতালের বন্দোবস্ত থাকবে না, কোম্পানী বেইমানী করবে, তোমরা ভেড়ার মতো ঘাস খাবে—সে ঠিক কথা নয়। তোমরা বিদ্রোহ কর। সে বিদ্রোহে আমরা যোগদান করব। তোমাদের একতার অভাব, আমাদের একতা ইচ্ছা করলে ধার নিতে পার। দেউলিয়া হবার ভয় নেই।

ভিতর থেকে লম্বা লোকটি বের হয়ে বিজনকে বলল: ইউ বেটার গো টু মিটার ট্রয়। তিনি সিম্যান-ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ঠিকানা—পাঁচ কলিন ষ্ট্রীট। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যে বড় এভিনিউটা পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে সেখানে গিয়ে থোঁজ করবে। তাঁকে পেলে, ঘটনাটা খুলে বলবে। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিজন ওদের ধন্যবাদ জানাল। এবং কেবিনে ঢুকে লোকটিকে এক বোতল সরবের ভেল দিয়ে বলল, ইউ হ্যাভ ডান এনাক্। আমি আজই মি: ট্রয়ের কাছে যাব।

অথচ সে দেবনাথের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল—এইসব আবেগধর্মিতার লক্ষণগুলো ভালো নয়। সেলিমের উপকার করে তোর কি আখের হবে এমন ভাব দেবনাথের মুখে। সুতরাং স্পষ্টতই দেবনাথ যেতে রাজী হল না।

বিকেল। শীতের বিকেল। চারটে না বাজতেই শীতের সমুদ্রে অলস সূর্য

উত্তাপের জ্বালায় ডুব দিচ্ছে। গাছগুলো নেড়া নেড়া। ইউক্যালিপটাসের পাতা খসে পড়ছে। আকাশ থেকে যেন শীতের তুষার বরছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—হাত-পা জমে যাবে ভাব। বিজ্ঞান হাতেব দস্তানা টেনে দিল। টুপিতে কপাল ঢেকে দিল। তারপর ধীবে ধীবে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। সমুদ্র থেকে শীতের হাওয়া কের উঠে আসছে।

ইচ্ছা হল বন্দরে নেমে ট্যান্কি করা। ইচ্ছা হল দু'শিলিং-এব আপেল কেনা। এবং ইচ্ছা হল এভিনিউ টিন-কার্টের ঘবেব ভিতব ঢুকে দু'দণ্ড জুয়া-খেলাব। তবু সেলিমের জ্ঞান আপাতত হাঁটতে থাকল সে। ধীবে ধীবে হেঁটে গেলে ঝুলন্ত ব্রিজ অতিক্রম করতে পনেবো মিনিট, সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে বেলওয়ায়ে স্টেশন অতিক্রম করতে অনধিক পনেবো মিনিট—তাবপবই চড়াই পথে উঠতে গিয়ে কলিন ষ্ট্রীট মিলবে। নাস্তাব ফাইভ কলিন ষ্ট্রীট। মনে মনে নন্দব মুখস্থ কবাব মতো উচ্চারণ কবল কথাটা এবং ছোটো স্মন্দবী মেয়েকে বমণীষ হতে দেখে শিস দিয়েও ফেলল। এবং যদি ওবা প্রশ্ন কবে অস্তুতঃ ওব শিস শুনে, তুমি সিম্যান ?

সে বলবে, ইয়েস্।

যদি বলে, ইণ্ডিয়া থেকে এলে ?

সে বলবে, ইয়েস্।

যদি বলে, তুমি গান জান ?

সে বলবে, ইয়েস্।

—তুমি ক্রিকেট খেলতে পার ?

সে বলবে, ইয়েস্।

সুতবাং ওব গান, খেলা এবং এই শর্ততা সবই ইয়েসেব কোঠায় পড়বে।

বিজ্ঞান নিজের মনেই হেসে ফেললে। স্মন্দবী রমণীবা এখন ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে উঠে যাচ্ছে। ব্রিজের রেলিং ধবে কিছু মেঘপুরুষ গুঞ্জে মশগুল। অথচ স্মন্দরী বমণীবা ওকে দেখেও প্রশ্ন কবলনা। ওর শিস দেওয়ার অর্থকে ব্যতিক্রম বলে ভাবল না। সুতরাং সে জোরে জোরে হেঁটে ওদের পিছনে ফেলে নীচে নেমে একটি চলন্ত ফলের দোকান থেকে দু'শিলিং-এব আপেল কিনল। তারপর ব্লু-ফাইটেব বিজ্ঞানী মাটাডরের মতো এইসব স্মন্দরী রমণীদের এবং স্মন্দর পুরুষদের ভীড় ঠেলে বের হয়ে গেল। বের হয়ে যাচ্ছে। সে হাঁটিছে। এখন বেন মহলা মনে হল সেলিম পীড়িত। সে বাংকে গুরে রক্ত তুলছে মুখে। দেশে একমাত্র 'পসিমা' বেঁচে আছেন, তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে। আজও বরফা স্মন্দরী রমণীদের

দেখলে সে তার মাকে স্বভাবের কোঠায় সংগ্রহ করতে পারে। সে সামনের বয়স্ক।  
সুন্দরী রমণীকে প্রসন্ন করল, উড ইউ হেল্প মি? আপনি কি আমাকে কলিন  
ট্রাটে যেতে সাহায্য করবেন?

বয়স্ক সুন্দরী রমণী বলল, তুমি কি স্ট্রেন্জার?

সে বলল, ইয়েস। আমি সেলব।

—এ বন্দরে প্রথম এলে?

—ইয়েস, এই প্রথম এসেছি।

—ইওর কান্ট্রি?

বিজ্ঞ দেশের নাম বলল।

—অল রাইট। তুমি এস। তুমি গ্যাণ্ডিয়ান। তুমি ভালো লোক আছ  
এমত ভাব যেন বয়স্ক সুন্দরী রমণীর চোখে।

বিজ্ঞ শেষ পযন্ত নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেল। সে দীর্ঘস্থায়ী আলাপে রাজী  
হল না। নতুবা এদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংশয় আব দুঃসহ রকমেব প্রশ্নের মুখে পড়ত  
—এখনও দুর্ভিক্ষ আছে? এখনও মহামারী হয়? এখনও সন্ন্যাসীরা গাঁজা খেতে  
খেতে ধর্মালোচনা কবে? এখনও হিমালয়ের বকে নাক জাগিয়ে সাধু মহাস্তবা  
বরফের নীচে ঈশ্বর-উপাসনা করছেন?

প্রায়শই সে এইসব ক্ষেত্রে চটপট উত্তর দেবার ভঙ্গীতে সহজ হয়ে দাঁড়ায়।  
এবং কিছু বলে পরিত্রাণ পাবাব চেষ্টা করে। সত্য-মিথ্যা—যে-কোন প্রকারে।  
এসব ক্ষেত্রে সে কখনও নিজেকে ছোট করবে না। নিজেকে, নিজের দেশকে ছোট  
করার ইচ্ছা তার কৌনদিন হয়নি।

একদা ভিক্টোরিয়া বন্দরে একজন ব্রেজিল-গার্ল বলেছিল, তোমার চোখ বড়  
গভীর, তোমার চোখ কবিতার মতো।

সে বলেছিল, আমি যে কবিতা লিখি।

একদা একটি চিলি-কন্যা বলেছিল, তোমার কোমল খুব সুরু। তোমার এই  
দীর্ঘ কোমল চেহারা নাচিয়ের মতো।

সে বলেছিল, একদা আমি ব্যালেতে নাচতুম।

বিজ্ঞ এইসব ভাবনার ভিতর এভিহুথ খরে উপরে উঠে যাচ্ছে। রেল-স্টেশন  
অভিক্রম করে সে ডাইনে মোড় ঘুরল। এখানে সে কিছু ফুলের গাছ দেখল।  
মিমোসা-ফুলের শুচ্ছের মতো এইসব ফুলেরা গাছে ঝুলছে। বারা পথ খরে যাচ্ছে,  
ফুলেরা তাদের শরীরের উপর ঝরে পড়ছে। বিজ্ঞের হু-ব্র্যাক কোটের রঙে জাকরী

রঙ ধরাল। সে অনেকক্ষণ এইসব গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিকে নিম্ন আলো, কাঁচের ঘরে আলো জ্বলছে। এই আলোর ভীড়ে এইসব খেতাব রমণীদের বিজনের বড় ভালো লাগল। ওর আর ইচ্ছে হচ্ছেনা এক পা নড়তে। ওর ইচ্ছে নেই এখন কলিন ষ্ট্রিটের পাচনঘর বাড়ীতে ঢুকে নীরস আলোচনায় ডুবে যেতে। তার চেয়ে বরং এই ভালো। বিদেশী এইসব ফুলের ভীড়ে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড সাগরের দুঃখকে ভুলে এই সুখদুঃখে ডুবে যাওয়া।

অথচ সে দাঁড়াতে পারলো না। বন্দরে সেলিম, ওর কাসি, ওর নিরীহ মাছের মত চোখ বিজনকে ত্যাগ দিচ্ছে। বিজন ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে বড় হলঘরটায় ঢুকে গেল। গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা—পাঁচ, কলিন ষ্ট্রিট। পাথরের উপর খোদাইকরা সাইনবোর্ড। লেখা আছে—ন্যাশনাল সিম্যান ইউনিয়ন। নীচে লেখা রয়েছে—জাহাজীরাও আপনার আমার মতো মানুষ।

এইসব বড় বড় হরফে বড় বড় কথা পড়তে পড়তে বিজন হলঘরে ঢুকে গেল। পাথরের দেয়ালে বড় বড় সব ছবি ঝুলছে। পায়ের নীচে মশণ পাথরে ওর প্রতিবিম্ব সচল। মশণ পাথরে ওর চেহারা আয়নার মতো ধরা পড়েছে। বিজন সম্ভর্ণণে হাঁটল। সম্ভর্ণণে পাথরের আঁশিতে নিজের মুখ দেখল, কারণ অন্য কোন মুখ অথবা অন্য কোন শব্দ এ-হলঘরে ভেসে উঠছে না। সে বিস্মিত হল। পাথরের দেয়ালে কিছু তৈলচিত্র। কিছু দামী আলো এবং এইমাত্র পালিশ-করা জুতোর রঙে এইসব দেয়াল, এইসব ছবি। সে একবার ডাবল বরং চলে যাওয়া যাক। বরং কাল দেবনাথকে বলে কয়ে একসঙ্গে আসা যাবে। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে বিজন ভীত এবং বিহ্বল হয়ে পড়ল। অথচ সে এখন দেয়ালের কিছু কিছু তৈলচিত্র চিনতে পারছে—ওরা সেক্সপীয়ার, টলস্টয় এবং আরও সব মনীষীদের পাশে ট্যাগোর—জন্ম ১৮৬১...মৃত্যু... কি একটা সালের নাম। ট্যাগোর...তারপর জন্মমৃত্যুর কথা ভেবে ওর কিস্তি সাহস জন্মাল। সে চারিদিকে চোখ তুলে একবার তাকাল। উত্তরের দিকে পাথরের দেয়ালের একটা দরজা স্বয়ং খুলে যাচ্ছে। এবং একজন প্রোট বের হয়ে আসছেন। তিনি যেন কোন যক্ষপুত্রী থেকে উঠে আসছেন। সে তাঁকেই কোনরকমে প্রণাম করল, মিঃ ষ্ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রণাম করে ট্যাগোরের ছবির প্রতি কের নজর ফেলে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গৌরব বোধ করল।

ভদ্রলোক বললেন, দরজা ঠেলে ভিতরে যান। ওঁর ষ্ট্রেনো এলবি আছেন। তাঁকে প্রণাম করুন। শেষে ভদ্রলোক ওকে গুডবাই ভঙ্গীতে বিদায় জানানলেন।

বিজ্ঞান একান্ত বশবদের মতো দরজা ঠেলতেই ভিতর থেকে জবাব এল, কাম ইন, কাম ইন !

বিজ্ঞান এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কোন মুখ দেখতে পাচ্ছেনা অথচ অপ্রত্যাশিত মেহমানের মতো ডাক শুকে বিচলিত করছে। যেন সে দেয়াল-ঘেরা কোন যক্ষপুরীতে এসে ঢুকেছে। সেখানে দেয়ালের ভিতর থেকে একটিমাত্র নারীকণ্ঠের জবাব, কাম ইন, কাম ইন। এবং সে ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে বলেই দেখতে পেল মেয়েটি টেবিলের উপর খুঁকে কাজে ব্যস্ত। সে একবার চোখ তুলে দেখেছেন। দেখল না। কে এল কে গেল সে দেখল না। সে হাত তুলে ইসাবায় শুকে সামনের চেয়ারে বসতে বলছে। ছোট চিলতে করিডরের মতো এই একফালি ঘরে একটি টেবিল সহ মেয়েটিকে খুব ভিন্নধর্মী বলে মনে হচ্ছে।

সে চেয়ারে বসে ইতস্তত দেয়ালে নজর দিতেই দেখল মেয়েটির দেয়ালের কীলকেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং—যেন উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্মিত হাসিতে এইসব অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন। ছবিটি হাতে আঁকা বলেই বিজ্ঞানের মনে হল। কোন ছবিব যেন নকল। এইটুকু দেখে এবং ভেবে বিজ্ঞানের বিচলিত ভাবটুকু কেটে গেল। সে প্রশ্ন করল, মিঃ ট্রয় থাকলে দেখা করতাম।

এল্‌বি চোখ তুলে বিজ্ঞানকে দেখলো। একজন সুপুরুষ বিদেশী যুবাকে দেখল। যুবাকে দেখে চোখে ওর নির্লজ্জ ভাব। চোখের পাতা পড়ছেন। বিজ্ঞানকে দেখে লেজারের হিসাব কষছে এমন ভাব চোখে। চোখের পাতা পড়ছেন—দৃষ্টি এমত দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ে গভীর। এই নির্লজ্জ ভাবটুকু বিজ্ঞানের ভালো লাগল না। বস্তুত বিজ্ঞান খুব আড়ষ্ট বোধ করছে।

—তিনি তো নেই। তোমার কি দরকার আমাকে বলে যাও। তিনি এলে বলব।

বিজ্ঞান বলল, প্রয়োজন আমার অনেক। তোমাকে আমার প্রয়োজনেব কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হবে।

—শুনব।

সব ঘটনাই মিঃ ট্রয়কে কিন্তু বলতে হবে।

এল্‌বি হাসল। এল্‌বি বিদেশী যুবাকে ফের কৌতূহলের চোখ নিয়ে দেখছে। এবং সেই পুরুষের মতো দৃষ্টি—যা বিজ্ঞান সহ্য করতে পারছে না। সে এলবিকে সাধারণ যুবতীর মতো দেখে, খুশী হতে চাইল।

এল্‌বি বলল, তুমি বল, আমি নোট করছি।

বিজ্ঞানের ভুলটুকু বুঝতে পেরে বিজ্ঞানও হাসল।—তোমাকে নোট নিতে হবে না।



মুখে বললেও চলবে। ঘটনাটা হচ্ছে পার্থ বন্দরে...

এল্‌বি এ-সময় বাধা দিল বিজ্ঞকে, জাহাজটার নাম বল। তোমরা কোন্‌ ক্রু, কোন্‌ দেশ থেকে এসেছ সব বলতে হবে।

—জাহাজটার নাম ‘এস/এস টিবিড্‌ ব্যাংক্‌’। আমরা ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি।

—তারপর ?

বিজ্ঞ জাহাজেব সব ঘটনা, সেলিমের বর্তমান গবস্থা, এমনকি সারেঙ এবং কাপ্তেনের গোটা ষড়যন্ত্রেব কথাও খুলে বলল। বিশেষ কবে মেয়েটির স্বাভাবিক আগ্রহে সব খুলে বলতে পাবল। এখন সে আর কোন আড়ষ্টতায় ভুগছেন। এখন সে রবীন্দ্রনাথকে দেখে বীতিমতো উত্তেজিত হতে পাবে। সে এবাব একটু ঝুঁকে বলল, এব একটা বিহিত করতেই হবে দয়া করে। নতুবা বেচারী বিনা চিকিৎসায় মাঝে পড়বে। বেচারাব ঘরে বিবি আছে। ছোট একটা মেয়ে আছে। ওবা সব ভবই পথ চেয়ে বসে আছে।

এখন বিজ্ঞকে দেখলে কে বলবে, এ জাহাজী বিজ্ঞ! কে বলবে এ বিজ্ঞন কথায় কথায় শিস দেয়! কথায় কথায় মিথ্যাকথা বলে বিদেশী রমণীকুলে বাহবা নিতে চায়। বিজ্ঞের চোখ মুখ মান্নষেব ভালো করার প্রবৃত্তিতে বস্তুতই সজল হয়ে উঠছে এখন।

এল্‌বি বলল, নিশ্চিত থাক। মিঃ ট্রয় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে এ জিন্দে ভাবতে হবে না। জাহাজীদের ভালো করাই আমাদের কাজ।

বিজ্ঞ ওঠাবাব সময় ফের রবীন্দ্রনাথকে দেখল এবং অদম্য কৌতূহলকে চাপতে না পেয়ে বলল, আমরা ট্যাগোবেব দেশ থেকেই এসেছি। তোমরা ট্যাগোবের ভক্ত দেখছি। দেখি তোমরা এখন আমাদের জন্য কতটা করতে পার।

—তুমি ভারতবর্ষের লোক? কিন্তু ভারতবর্ষতো বিরাট দেশ! এখানে পাঁচ বছর আছি। ভারতবর্ষ থেকে আসা কিছু কিছু জাহাজীদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অথচ দুর্ভাগ্য ওরা কবির ছবি দেখেও কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। বিল্ডী ধরনের পোশাক পরে ওরা এখানে এসেছে। চেয়ারে না বসে মেয়েতে বসে পড়েছে। শীতে দেখেছি ওরা ভয়ানকভাবে কাঁপত।

বিজ্ঞ বলল, ওরা এখনও আছে। জাহাজে গেলে তুমি ওদের এখনও দেখতে পাবে।

এল্‌বি বলল, ভারতবর্ষের লোক ভাবতে তোমাকে কষ্ট হয়।

বিজ্ঞ বলল, মাপ করবে। যারা তখন ছিল এখনও আছে। তাদের জাহাজী

জীবনের এক বিচিত্র অধ্যায় আছে। ওরা আসছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দ্বীপ অঞ্চল থেকে। ওরা অজ্ঞ। চাষী পরিবার থেকে ওরা আসছে।

বিজন ভাল—এইসব জাহাজীদের জাতীয় পোশাকের প্রতি এল্‌বির তীব্র ঘৃণা। বস্ত্রত লুপ্তি এবং কাঁধে গামছা ফেলে এইসব জাহাজীদের বড় বড় এভিন্যু ধরে হাঁটা এবং নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দেওয়া এল্‌বির কাছে বিশ্ব-কবিরই যেন অবমাননা। সেজন্য বিজনের দুর্লভ ইংরেজী বলার কায়দা এবং উজ্জ্বল বিদেশী পোশাক, উপরন্তু কবির প্রতি শ্রদ্ধাটুকু এল্‌বিকে বিজন সম্বন্ধে অভিভূত করেছে। বস্ত্রত এল্‌বি ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে সহ্য করতে পারত না। আজও পারছে না। ওর চোখে মুখে এইসব যেন ধরা পড়ছে।

বিজন বলল, ওরা অজ্ঞ নিরক্ষর বলেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওদের কোন কৌতূহল নেই।

এল্‌বি সহসা বলল, বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। তুমিও কবির দেশের লোক। তুমি কবিকে দেখেছ?

সহসা এই জবাবে বিজন কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। ওর জাহাজী মনটা ধীরে ধীরে ওর অস্তিত্বকে গ্রাস করেছে। সে বলল, নিশ্চয়ই। নিমতলা থেকে বটতলা বেশী দূর নয়। নিমতলার কাছেই জোড়াসাঁকো। আমরা ছেলেবেলায় ও-পাড়ায় কত খেলতে গেছি। কতদিন আমরা কবিকে দেখে প্রণাম করেছি। তিনি তখন প্রায় অচল।

—তুমি ঠুঁকে প্রণাম করেছ! তুমি ঠুঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ!

বিজন বিনয়ের আধার হয়ে গেল। বিজন বলল, কবি আমাদের আশীর্বাদ করতেন। বলতেন, ভালো ছেলে হবে, দেশের দুঃখ দূর করবে।

এল্‌বি ফের আশ্চর্য এক শ্রদ্ধার ভঙ্গীতে বলল, তুমি ঠুঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ, প্রণাম করতে পেরেছ!

বিজন দেখল এল্‌বির চোখ দুটো শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে উঠছে। এল্‌বি একবার ঘাড় ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখল, একবার বিজনকে দেখল। কবির খুব নিকটের একজন যুবাকে স্পর্শ করার প্রকট ইচ্ছায় সে হাত বাড়িয়ে দিল। যেন বলতে চাইছে—তুমি বি-জন, তুমি কবিকে স্পর্শ করেছ, তুমি কবির দেশের, ধরের লোক। এল্‌বির মনে এইসব ভাবগুলো কাজ করছে।

এল্‌বি বলল, বাবা তখন ইউরোপে ছিলেন। বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। বাবা মাকে এবং আমাকে বলতেন, হি ইজ এ সেন্ট, জার্সি অ্যাজ

পিটার অর পল। বিজন সেই ঋষিপুরুষের আশীর্বাদ পেয়েছে। এল্‌বি বিজনের আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

এল্‌বি বলল, তোমরা আব কতদিন থাকবে এ-বন্দে ?

—প্রায় মাস দুই। জাহাজ এখানে মাস দুই বসবে। ড্রাইডক্ হবে। মেবামত হবে।

সহসা এল বি বলে বসল, আমার একটা অনুবোধ তোমায় বন্ধা কবতে হবে।

বিজন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু সে বলল, বল, বাখব। যদি ক্ষমতায় কুলোয় নিশ্চয়ই বাখব।

—তোমার কাছে আমি ট্যাগোবেব কবিতা বাংলা-ভাষায় শুনতে চাই। আমার অনেকদিনেই ইচ্ছা। যখন থেকে ট্যাগোবেব কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই তখন থেকে ইচ্ছা—তোমার দেশে যাব, ভাবতবর্ষকে দেখব। কবিব শাস্তি-নিকেতন দেখব। আমি এইজন্ত প্রথম থেকেই টাকা জমিয়ে আসছি। কবির কবিতা বাংলাভাষায় শুনব—কত দিনের ইচ্ছা আমার।

—তাব জন্য কি আছে? সেলিমের ঝামেলাটা চুকে যাক। তাবপব একদিন তোমায় শোনানো যাবে।

এল্‌বি চোখ বুজল। যেন রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর দেশকে, বিজনকে অনুভব করার জন্যই চোখ বুজল। বিজন এই আবেগধর্মিতায় বিমুগ্ধ হল না। ববং পীড়িত হল। সাহিত্যের অ-আ-ক-খ সম্বন্ধে যাব কোন স্পৃহা নেই, তাকেই এই নিদারুণ সত্যে টেনে আনাব কী যে অর্থ, বিজন বুঝতে পাবল না। তবু সে ভাবল, হাতে অনেক দিন, পরে ভেবে যা হয় কিছু একটা বলা যাবে।

বিজন এবার উঠতে চাইল এবং বলল, তোমার নামটা জানা হল না।

এল্‌বি বলল, আমাকে সকলে এখানে এল্‌বি বলেই জানে। পুবে নাম সিসিল এলবার্টি। মিস এলবার্টি বলেও ডাকতে পার।

এলবি পুনরায় স্বরণ করিয়ে দিল, আমি তোমায় কবিতা শোনাবো। ট্যাগোবের কবিতা।

বিজন ভাবল, আচ্ছা ঝামেলার পড়া গেল।

সে চলতে থাকল।

এসময় এলবি ওর সামনে এসে দাঁড়াল এবং হাওশেক কবল। তারপর প্রব্র করল, জাহাজ তোমার কোন্‌ ডকে নোডর ফেলেছে ?

—সাঁউখ-ওয়াৰ্কে’। বিজন এবার দৌড়ে পালাবার মতোই হলধর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে গেল এবং দুঃসহ ভার থেকে যেন মুক্ত হল।

ডেকে তখন পুরোধমে কাজ চলছে। এন্‌জিন-রুমেও। এন্‌জিন-রুমে বড় বড় প্লেট সব ফ্রেপ করা হচ্ছে। বড় বড় সব অক্সিজেনের বোতল নামানো হচ্ছে। কন্ডায় কন্ডায় কাজ; জাহাজীরা রঙ করছে কানেলে, বোট-ডেকে। একজন দুজন কবে সকলে উঁকি মেবে যাচ্ছে সেলিমের কেবিনে। বিজন গতকালের ঘটনার কথা কাউকে বলেনি, সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়। শুধু আজ সে কিনারার লোকদের ডেকে সেলিমের অবস্থা দেখাচ্ছে। দেখাল— এইখানে সেই লোকটি থাকে, তাকে তোমরা দেখে যাও।

প্রচণ্ড শীত এবং হাওয়াব জন্তু জাহাজীদের হাতে কাজ তেমন জমছে না। ওরা কানেলের উপর ঝুলে অথবা বোটের উপর দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে গ্যালীতে গিয়ে আগুনের উত্তাপ নিয়েছে। শক্ত হয়েছে ওরা এবং রাত্রির কোন আকস্মিক ধৌন ঘটনার কথা ফলাও করে বলে কোন জাহাজী বাহবা নিতে চাইছে।

বিজন নীচে দাঁড়িয়ে কানেলে যে রঙ করতে উঠে গেছে তার দড়িদড়া টিল দিয়ে অথবা শক্ত করে ঝেঁধে রেখে কাজে সাহায্য করছে। আকাশ তেমনি আশীর মতো। বন্দরের পাইনগাছ থেকে তেমনি পাতা ঝরছে। এ শীতেও এন্‌জিন-ট্যাঙল পুরানো কোট গায়ে লুঙ্গি পরে নীচে নেমে গেল। জেট ধরে হাঁটতে থাকল। গতরাতেও এন্‌জিন-ট্যাঙল শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরে নেমে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরের পথ ধরে সহরে উঠে গেছে। পুরানো বাজারে গিয়ে দু-শিলিং তিন-শিলিং দাম দিয়ে পুরানো জামা-কাপড় কিনেছে। জাহাজীরা আফ্রিকার বন্দরে অথবা কিজি বীপে ওগুলো বিক্রি করবে। গতরাতে ফেরার পথে ট্যাঙল শীতে যখন আর হাঁটতে পারছিল না, যখন সন্তায় ধৌন সংযোগের দায়িত্ব পালন করে আর হাঁটতে পারছিল না, তখন বুড়ি মেমসাব এই বুড়ো ট্যাঙলকে একটা দামী ওভারকোট গাড়ী থেকে দয়াপরবশ হয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ভোরে সে দামী ওভারকোটটাকে সকল জাহাজীদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন বলেছে—বুড়ী মেমসাব দিল। শীতে রাস্তায় কাঁপছিলাম, বুড়ী মেমসাব দিয়ে দিল। গতকাল এইসব ভারতীয় নাবিকদের কথাই এলবি হুঃধ করে বলছিল। বিজন কানেলের নীচে দাঁড়িয়ে এন্‌জিন-ট্যাঙলকে সহরে উঠে যেতে দেখছে আর বিরস্কিতে কেটে পড়ছে।

বিজ্ঞান ফানেলের পাশ থেকে অল্প জাহাজীকে উদ্দেশ্য করে বলল, মকবুল, দেখলি এন্জিন-ট্যাণ্ডলের কাণ্ড। আজও এই ভোরে শীতের ভিতর লুজি পরে বন্দরে নেমে গেল। দেশেব জাত-মান সব ডুবাচ্ছে। তোরা কিছু বলতে পারিস না ওকে ?

বিজ্ঞান দেখল মকবুলেব মুখেও এমত ইচ্ছা—শীতের বাতে নীলরঙের পায়জামা পরে ছেঁড়া কোট গায়ে বেব হয়ে যাওয়া, পথে দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট পাওয়া এবং কোন পুরুষ অথবা মহিলাব দাক্ষিণ্য গ্রহণ কবা। বিজ্ঞান ভাবল, শীতেব রাত, রাত্তায় বরফ পড়ছে, তবু নীল মার্কিন কাপডেব জামা পায়জামা শবীবে এঁটে এইসব জাহাজীদের ভীড কিনাবায। এইসব জাহাজীবা ভাবতবর্ষ থেকে আসে। বড় গবীব, বড় নিঃস্ব। এইসব জাহাজীদের ইংবেজ জাহাজ কোম্পানীব মালিকেবা কলকাতা বন্দর থেকে ধবে নিয়ে আসে। তাদের খেতে দেওয়া হয় বাসি গরুর ঘাস, ডাল ভাত। মাঝে মাঝে বাঁধাকপিব তবকাবি দিয়ে কোম্পানী বদান্ততা দেখায়। এইসব জাহাজীবা বন্দবে লুজি পবে, ছেঁড়া ওভাকোট গায়ে শীতেব রাতে ঘন আঁধাবে বুড়ী মেমসাবদেব খুঁজে বেডায়। দাম যত কমে হয়, জিনিষ যত নীবস হয় ক্ষতি নেই, তবু ঘোঁন সংযোগটুকু বক্ষা কবতেই হবে। তখন বিদেশে এলবির মতো বমগীবা ভাবে ওবা অসভ্য, ওবা বর্বব। একদা পৃথিবীব সব বন্দব-গুলোতে কলকাতা বন্দরেব এইসব নাবিকেরা ঘুবে বেড়িয়েছে। পৃথিবীব সব বন্দবে বন্দবে ভাবতবর্ষকে ওবা নোঁবা নিঃস্ব প্রতিপন্ন কবেছে। আজও কবেছে। অথচ বিজ্ঞান ভাবল, এব বিক্ষো নালিশ নেই। যতদিন এবা থাকবে—এন্জিন-ট্যাণ্ডলেব মতো এইসব লোকগুলোও থাকবে।

বিজ্ঞান এইসব ভেবে এত বিবক্ক এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে কখন মকবুল কলঙ্কার দড়িতে টিল দিতে বলেছে, কখন ইটন এসে ওব পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য কবে উভয়ে হাসছে—বিজ্ঞান তাব কিছুই ধবতে পারে নি ইটন বলল, গুড মনিং।

বিজ্ঞান বলল, ইয়েস, গুড মনিং।

তারপব ওবা সকলেই লক্ষ্য কবল জাহাজে কেমন একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছে। অনেকগুলো মোটরগাড়ী এসে বন্দরে থেমেছে। সব লম্বা চৌকো মুখওয়াল লোকেবা জাহাজে উঠে আসছে। ডেকের উপব সব জাহাজীরা, কিনারার লোকগুলো হাত তুলে আকাশ দেখছে। ইটনও আকাশ দেখল, বিজ্ঞানও আকাশ দেখল। দেখে বিস্মিত হচ্ছে। ইটনের মুখ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, ইটন

বলছে—কেমন, কাজ হল তো।

কানেলের চূড়ায় ঝুলে মকবুল প্রাঙ্গণ করল, আকাশে এরোপ্লেনটা কি লিখছে রে ?

বিজ্ঞান দেখল একটা এরোপ্লেন আকাশটাকে স্লেটের মতো ব্যবহার করছে। গ্যাস দিয়ে বড় বড় হরকে ভোরের খবর দিচ্ছে। ‘দি ডেইলি হেরাল্ড’-এর খবর। হয়ত উড়োজাহাজটা ভাড়া করা—কিংবা ওদেরই। বিজ্ঞান দুটো বড় খবরের পর পড়ল : দি শিপ এস/এস টিবিড ব্যাংক উইল বি ব্ল্যাক ব্যান্ড, ইক্ সেলিম...।

মকবুল কানেল থেকে বিরক্ত করছে। মকবুল বার বার প্রাঙ্গণ করছে—আকাশে জাহাজটা কি লিখছে রে ? বিজ্ঞান এইসব পড়ে অধীর হয়ে উঠেছে। সে মকবুলকে বলল, সেলিমকে হাসপাতালে এফুর্নি না দিলে জাহাজের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সিম্যান-ইউনিয়নের সেক্রেটারি এই ছমকি দিয়েছেন।

ইটন বলল, কাল রাতে এখান থেকে যারাই কাজ করে ঘরে ফিরেছে তারাই ইউনিয়নে খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বিজ্ঞান ভাবল, সব যেন মন্ত্রের মতো কাজ কবল। এখন জাহাজে খুবই লোকের ভীড়। সকলে কাজ খামিয়ে দিয়ে ব্যাপাবটা দেখছে। কোম্পানীর এজেন্ট পর্যন্ত জাহাজে উঠে এসেছেন। মিঃ ট্রয় এবং আরো অনেক সব লোক। ক্লার্করা এসেছেন। ওরা প্রথমে ব্রীজে উঠে গেল। কাপ্তানের ঘরে ঢুকে গেল অনেকে। কাপ্তানকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তিনি এই খবরে প্রথমে খুবই অধীর এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন। দুই সারেডকে ডেকে প্রাঙ্গণ করেছিলেন, কে এ-খবর ইউনিয়নে পৌঁছে দিয়েছে, কার এমন হিম্মত ? সেলিমের দরজা কে খুলেছিল ? ওর পোর্টহোল কেন বন্ধ ছিল না ? এইসব প্রশ্নের শেষে তিনি দেখলেন স্বয়ং এজেন্ট এবং অন্যান্য সব দায়িত্বশীল কর্মচারীরা ওঁর কেবিনে ঢুকে যাচ্ছেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না—এত উত্তেজিত। তবু এইসব দায়িত্বশীল কর্মচারীদের দেখে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মিঃ ট্রয় নানারকম প্রাঙ্গণ করে ওঁকে আরো বিব্রত করে তুলেছেন। বিজ্ঞান, ইটন এবং মকবুল, পরে দেবনাথ পর্যন্ত কানেলের গুঁড়িতে এসে সন্তর্পণে কাপ্তানের কেবিনের সব খবরগুলো শুনছিল। ওরা শুনে বলল, শালা ঠিক জন্ম হয়েছে এতদিনে।

বিজ্ঞান মনে মনে এলবিকে ধন্যবাদ জানাল। এলবির লম্বা চোখ এবং ডিম্বের মতো মুখের গঠন ওর চোখে এখন খ্রীতির জোয়ারে ভাসছে। ওর কালো চুলে মনোরম গন্ধ, বিজ্ঞান গতকাল তা টের পেয়েছে। গতকালের অসহিষ্ণু ভাবটুকু আর ওর ভিতর নেই ! এলবিকে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলে খুশি হবে এমন

ধারণায় বোট-ডেকে এবং নীচে ভীড়ের ভিতর এলবিকে খুঁজল। এবং খুঁজতে থাকল। অথচ এলবিকে যেই বোট-ডেকে উঠে আসতে দেখল, বিজন তাড়াতাড়ি মাস্টের আড়ালে আত্মগোপন করল।

এলবি, মিস্ এলবার্ট এবং সিসিল এলবার্ট যে-কোন নামেই ওকে ডাকা চলে। সে এই ছায়া-ছায়া অঞ্চলে যদি এই নামে ডাকে নিশ্চয়ই এলবির সাড়া পাবে। এলবি এখন ছান্দর বোটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও যেন কাপ্তানের ঘরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বিজন সব দেখেও এলবিকে গুড মর্নিং বলতে পারল না, কৃতজ্ঞতা জানাতে পারল না। এলবির সঙ্গে যে-কোন পরিচয়ই এ-মুহূর্তে এ-জাহাজে মারাত্মক। কাপ্তান তাঁর বিরক্তিবটুকু কলকাতা বন্দর পর্যন্ত পুষে রাখবেন। সারেঙ সেই ভাবটুকু কলকাতা পর্যন্ত জিইয়ে রাখবেন। তারপর এক শুভদিনে বিজনের নলীতে লাল দুটো দাগ পড়বে। বিজন ব্ল্যাক-লিস্টেড হবে।

সুতরাং সে এলবিকে দেখে আত্মগোপন না করে পারল না। তাই সে এলবিকে দেখেও এই মাস্টের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এলবি সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সে যেন কোন জাহাজীকে প্রশ্ন করছে, বি-জন, বি-জন কোথায় কাজ করছে?

বিজন আঁতকে উঠল। সে ধীরে ধীরে টুইন ডেকে নেমে গেল। এবং দু'লাকে ফকা পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে নিজের ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে অন্য জাহাজীদের বলে দিল, কেউ ওকে যদি খোঁজ করে তবে যেন বলা হয়, সে জাহাজে নেই। বন্দরে নেমে গেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাঁকে বসে হাঁপাতে থাকল।

কি সর্বনাশ—বিজন ভাবল। বিজন নিজের ভুলের জন্য নিজেই ক্ষেপে গেল। গতকাল যা ওর সবচেয়ে বেশি বলা দরকার ছিল, এলবিকে তাই বলা হয়নি। ওর বলা উচিত ছিল, এ খবর তোমাদের আমি পৌঁছে দিলাম এ কথা। যেন জাহাজের কেউ না জানে। তবে আর গরীবের চাকরীটা থাকবে না। সেলিমের সঙ্গে তবে আমিও মরব। অথচ সেই কথাটাই এলবিকে বলা হয়নি।

এলবি এদিকে এসে দেবনাথকেও প্রশ্ন করল, বিজন কোথায়?

দেবনাথ ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বলল, বিজন তো এখানেই ছিল। বলে ইতস্তত এদিক ওদিক চোখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, চল কেবিন। বোধহয় সে সেখানেই আছে।

নীচে নামবার আগে এলবিকে নিয়ে দেবনাথ একবার ভীড়ে বিজনকে খুঁজে দেখল। তাকে ওবা সেখানে পেল না। সেলিম ভীড়ের ভিতর স্ট্রীচারে শুয়ে আছে। সেলিম কাঁদছে। সাবেও বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে। বলছে, ভালো হয়ে গেলেই কোম্পানী তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। কাঁদছিস কেন? ভালোর জন্যই তোকে হাসপাতালে দিচ্ছে।

বিজন এই বাংকে বসেও যেন টেব পাচ্ছে—এইমাত্র সেলিমকে ধরাধরি করে নীচে জেটতে নামানো হল। সেলিম কাঁদছে। সে বলেছিল, বিবিব কোলে মাথা বেথে মববে। সে বলেছিল, আমার দেশের মাটিতে আমার কবর হবে। সে একথাগুলো বিজনকে বলেছিল। ওব খুব দুঃখ হচ্ছে এসময়—সে কাছে থাকতে পাবল না, বলতে পাবল না—বোজ আমি যাচ্ছি। বিকেলে যাব। তুই ভয় পাবি না। তুই ভালো হয়ে উঠবি—বলতে পারল না...তখন দবজাটা কে যেন ঠেলেছে। সে এই বাংকে বসে দেবনাথের গলার শব্দ পেল। দেবনাথ বলছে—এই, দবজা খোল। দবজা বন্ধ কবে ভিতবে কি কবছিস?

বিজন দবজা খুলতেই এলবিকে দেখল। এলবি দেবনাথের একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বিজন বলল, শুড মনিং।

—তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়বান।

—কেন, এখানেই তো ছিলাম।

—এখানেও খুঁজেছি।

বিজন বিব্রত হয়ে পড়ল।

এলবি ভিতরে ঢুকে বলল, ড্রয়কে কিন্তু সব কথাই খুলে বলতে পেরেছি।

বিজন ধন্যবাদ জানল। তাবপর বলল, বোসো।

ছোট ঘর, সোফা নেই। একটা ইজিচেয়ার আছে, কিন্তু পাতবার জায়গা নেই।

ওরা তিনজন এমত কথায় হাসল।

এলবি বলল, আমি বেশীক্ষণ বসব না। হাতে অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দেরী হয়ে গেল। ওরা হয়ত এতক্ষণে চলে গেছে। সেলিমকে রয়েল হাসপাতালে রাখা হচ্ছে। আশা করছি বিকেলে ওকে দেখতে যাবে। যেতে অনুবিধা হলে, আমার ওখানে চলে যেও, সেখান থেকে আমি তোমায় নিয়ে যাব। বলে সে আর বসল না। তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।



ওরা দুজন কোকসালে বসে এলবির পায়ের শেষ শব্দটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যেতে শুনল। দেবনাথ আবও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল বিজনেব। বলল, কি কবে এ-মেয়েকে ধরলি ?

বিজন গোপনীয়তা বক্ষাব জন্য ব্যস্ত। স্মৃতবাং সে এ-ব্যাপাবে আদৌ উচ্ছল হল না। আদৌ মুখব হল না। সে জবাবে শুধু বলল, পথে আলাপ।

তাবপব ওবা দুজন চুপচাপ। গ্যালীতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। ওবা সেই গন্ধ নীচে বসে পেল। ওবা দুজন কথা বলল না, তখন এক এক কবে সকলে এসে নীচে নামছে। যে যাব হাত মুখ ধুলো। খালা-মগ ধুলো। এবং ধীবে ধীবে উপরে উঠে গেল। ওবা ভোবেব এই আকস্মিক ঘটনায় বিস্মিত হয়েছ, খেতে বসে সকলে এমত ভাব প্রকাশ কবতে চাইল।

বিজন এই শীতেব বিকেলে ডেকে এসে দাঁড়াল। ওব পোশাক এবং মুখেব কমনীয়তায় শীতেব বঙ অথবা সমুদ্রেব বঙ। ওব শবীবের বঙে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। শীতের দেশে ঘূবে এবং সমুদ্রেব নোনা হাওয়ায শবীবের বঙ কমনীয় হতে হতে ~~কমলা~~ এক ভাবে বিজন যেন বিদেশী মতো কথা বলতে শিখল।

সে বেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখল দুটো সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দবে এসে নোঙব কবেছে। সে ওদেব ফানেলেব বঙ দেখেই বুঝল ওবা আমেরিকান জাহাজ। সে বন্দর দেখে বুঝল ওবা এখানে ইম্পাত-জাতীয় দ্রব্য নামাবে। এব' হয়ত অন্য কোন বিকেলে ভেড়াব মাংস অথবা ফলেব রসদে বোঝাই হয়ে অন্য বন্দবে পাড়ি দেবে।

শেষে অন্যান্য অনেক জাহাজী মতো সেও সেলিমের কণ্ঠ ফোকসাল অতিক্রম কবে গ্যাংওয়ে ধবে বন্দবে নেমে গেল। অন্যান্য দিনেব মতো সে আজ সাধারণ জাহাজী হয়ে পথ ধবল না। সব কিছু দেখেই সে চোখ ফেবাল না। সে চলতে থাকল। একজন স্থায়ী বাসিন্দাব মতো সে এই বাবা পাইনেব পথ ধবে সহরে উঠে যাচ্ছে। বুলন্ত সেতু অতিক্রম কবে বন্দবের সিম্যান-মিশান বাঁয়ে ফেলে উঠে যাচ্ছে। সেই পাচ কলিন ষ্ট্রীট ও সেই মেয়ে এলবি। সে নির্দিষ্ট আন্তানায় উঠে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকল। মোটরে বসে এলবি এবং ওর ইউনিয়নের হলঘব, ওব চিলতে বসটুকু... এলবি স্মন্দরী, সে স্মখে আছে... এলবির চোখ গভীর, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়...এলবিকে মনে মনে স্মন্দরী বিদেশী রমণী অথচ আপনার মতো করে দেখার এক সবিশেষ কৌতূহলে সে স্নীতিত হতে

থাকল। এবং সহসাই স্বরণ করতে পারল—এলবি যদি বাত্বিকগ্রস্ত রুগীর মতো  
 স্কের বলতে থাকে—তুমি ট্যাগোরের কানট্রি থেকে এসেছ, তুমি কবির কাছে  
 লোক, তুমি কবিকে দেখেছ স্মরণে তুমি কবির আবৃত্তি করে শোনাও। তুমি  
 আমাকে বাংলাভাষা শেখাও। আমি মূল কবিতার রস পেতে চাই। তা হলে...  
 তা হলে! সে শরীরের আড়ষ্টতায় এমত উচ্চারণ করে কেমন জড়বৎ বসে থাকল,  
 সে ডাইভারকে বলতে পারল না তুমি বন্দরে চল, পাঁচ কলিন ষ্ট্রীটে যেয়ে আমার  
 দ্বকার নেই।

হলঘরের দরজায় বিজন এলবিকে দেখতে পেল। বিজন ট্যাক্সি থেকে  
 নামল ফুটপাথে। এলবি সিঁড়ি ধবে নেমে আসছে। ওরা পরস্পর অভিবাদন  
 জানাল। তারপর উভয়ে মোটরে চড়ে সেলিমকে দেখতে রয়েল হাসপাতালে  
 যাবার জন্য প্রস্তুত হল। শীতের সন্ধ্যা। এলবির হাতের দস্তানা লাল রঙের।  
 মোজা বেগুনি রঙের। বব-করা ব্লগুচুলে দুটো প্রজাপতি-ক্লিপ। গলায় সন্ধ্যা  
 সোনার চেনে পাথর বসানো। হলদে স্কার্ট, লাল জ্যাকেট শরীরে। শীতের  
 সন্ধ্যায় এলবিকে এইসব রঙে এইসব পোশাকে অতীব তীক্ষ্ণ মনে হল।

সহরের বড়রাস্তা ধরে ওরা চলেছে। আপাততঃ ওরা কোন কথা বলছে না।  
 এলবি স্টীয়ারিং করছে। বিজন সহর দেখছে। বড়রাস্তা, স্মরণে বড় বড় সব  
 গাচ-মোড়া আসবাবপত্রের, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের, পোশাকের অথবা মোটরের  
 দোকান। ভিন্ন ভিন্ন সব বিজ্ঞাপন বুলছে। এলবি দুটো-একটা কথা বলছে  
 এখন। সহরের এইসব দোকানের এবং কোন মুহূর্তে ধরে কিভাবে রয়েল হাসপাতালে  
 যাচ্ছে এইসব খবর দিয়ে নিঃশব্দ ভাবটুকু অতিক্রম করছে।

এলবি বলল, জাহাজ তবে অনেকদিন থাকল।

—তা থাকল।

—প্রায় দু'মাসের মতো হবে।

—তা হবে।

পাশের পত্রিকাটা তুলে বিজনকে দেখাল। সামনে মোড় ঘুরতে হবে। নীল  
 বাতি জ্বলছে না। স্মরণে এলবি দু'হাতেই পত্রিকাটা বিজনের হাতে  
 তুলে দিল।—খবরটা পড়েছ?

—আকাশে দেখেছি এবং পড়েছি। আচ্ছা এলবি...বিজন একটা প্রশ্ন  
 তুলে ধরার ইচ্ছায় ঘাড়টা বাঁকাল।—আচ্ছা এলবি, তোমাদের ভিতর থেকে  
 কেউ তো বলেনি এ-ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত। পত্রিকায় তেমন খবর নেই

তো! বিজন পত্রিকাটা ধীরে ধীরে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এল। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটুকু পড়ল। এবং এলবির মুখ দেখে যেন বুঝতে পারছে বিজনের এই দুঃসহ জডতায় এলবি পীড়িত হচ্ছে।

এলবির কঠিন মুখ সহসা নানা রঙে ক্রমশঃ নরম হচ্ছে।—বিজন, তুমি পাকা জাহাজী হও নি। তুমি দেখছি মিঃ ট্রয়কে খুব কাঁচা লোক ভেবেছ। পত্রিকা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে এ-ব্যাপাবে আমরা কিনারার কুলী লোকদের উপর বেশী নির্ভর কবেছি। কথা কি জান, এখানকাব ইউনিয়নের মতো এত জোরালো ইউনিয়ন পৃথিবীর কম বন্দরেই আছে। পাঁচ কলিন স্ট্রীটে পাঁচ বছর থেকে আছি। এ-ব্যাপাবে আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে জড়ালে কাপ্তান অল্প বন্দবে তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ?

ওদেব মোটর হাসপাতালের দরজায় এসে থামল। মোটর পার্ক কবে পার্কবোর্ডে নাম লিখে ওবা সদর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিজন দেখল, দুটো বৃত্তের মতো বাগান দু'পাশে কেঁথে ওরা উঠে যাচ্ছে। এলবি ব্যাগ থেকে ডায়েরী বেব করে সিট-নম্বর এবং ব্লক-নম্বর দেখে নিল। তাবপর হিসাব মিলিয়ে ওবা একসময় সেলিমের বিছানার পাশে পৌঁছে গেল।

এলবি বলল, গুড ইভনিং। তোমাকে এখন ভালো দেখাচ্ছে।

বিজন সেলিমের বিছানার পাশে বসে ওর চুল হাত দিয়ে বলল, এমন ভেঙে পড়েছিস কেন? আমি রোজ বিকেলে তোকে দেখতে আসব। জাহাজ এখানে অনেকদিন থাকবে। আশা করি ততদিনে ভালো হয়ে উঠবি।

সেলিম পাশ কবে গুল। ওব খুব যেন কষ্ট হচ্ছে। বুকে কষ্ট, হাতে পায়ে যন্ত্রণা। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। এলবি কিছু ফল এনেছিল সঙ্গে। সেলিমের টেবিলে ফলগুলো রাখল। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। সেলিম কৃতজ্ঞতায় হুয়ে পড়েছে এমন ভাব ওর চোখে মুখে। অথচ এইসব যন্ত্রণার ভিতরও সেলিম হাসল। একজন ডাক্তার, দুজন নার্স ওর পাশে এসে এখন দাঁড়িয়েছে। ওরা ওর শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করল। ওরা সেলিমকে বাঁচাব জন্ত উৎসাহিত করল।

এলবি একজন সিস্টারকে প্রার্থ করল, কাল নিশ্চয়ই প্রেট নেওয়া হচ্ছে?

—আজ রাতেই হবে। মিঃ ট্রয় সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

এলবি সিস্টারের প্রতি ধন্যবাদসূচক অব্যয়ে মাথা নোয়াল।

বসন্ত বিজন এই অন্তঃ পরিবেশে সহজ হতে পারল না। এই অন্তঃ

পৰিবেশেৰ ভিতৰ সেলিমকে দেখে সে আহত। সব যুৱতী নাৰ্সবা এগুন শৰীয়ে জড়িয়ে ধীবে ধীবে অথচ সত্ৰব পা ফেলে শৰীবে সংযমী ভাবটুকু ৰক্ষা কৰে ঘোৰাকৈ কবছে। ওবা মহীয়সী ৰমণী হওয়াব ইচ্ছায় দীৰ্ঘদিন ধৰে অভ্যাসে বত। অথচ হতে পাৰছে না অথবা বিজন ওদেব মহীয়সী ৰমণীৰূপে দেখাব চেষ্টা কবছে না। সে এলবিব মতো একজন নাৰ্সেব সন্ধে আলাপ কবতে চাইল। আলাপ কৰে জানতে ইচ্ছা হল—এই যে তোমবা তোমাদেব মুখ মোমেব মতো সাদা নিষ্পাপ কৰে বেগেছ এমত তোমবা নিষ্পাপ অথবা কৰুণাঘন কি না।

ওবা উঠে পড়ল। সব ভিজিটাবেব শেষে ওবা প্ৰশস্ত পথ ধৰে বড় বড় সব চত্ৰব পাব হয়ে সিঁড়ি ধৰে উপৰে ডঠে, ফেব সিঁড়ি ধৰে নীচে নেমে হাসপাতালেব সদব দৰজায় গৈছে হাজিৰ হল। এলবি বলল, চল একটু ঘূৰে আসি। একটু ইউনিভাৰ্চিটিব সামনেব পাৰ্কটায় বসব। একটু গল্প কবব। বাত ঘন হলে তোমাকে জাহাজে পৌছে দিয়ে বাডীতে ফিৰে যাব।

মোটবেব ভিতৰ বসে বিজন প্ৰশ্ন কবল সেলিম শীগগিৰই ভালো হয়ে উঠবে—কি বল ?

—নিশ্চয়ই। খব জোব দিযেহ ঘন এল ব কথাটা বলল। সেলিম ভালো হয়ে উঠলে, তুমি আমি সেলিম জীলগে যাব। সেখানে আমাব বাবা মা থাকেন। বাবা তোমাকে পেলে কিছুতেই ছাড়তে চাইবেন না। তোমাকে পাশে বসিয়ে কেবল ট্যাগাবেৰ কবিতা শুনতে চাইবেন। আমাদেব পৰিবাৰেৰ সকলেৰ ‘গীতাজলি’ব কবিতা মুখস্থ। ব’লে এলবি মোটেবে ষ্টাৰ্ট দিল এবং জোবে জোবে বিগুন্ধ সঙ্গীতেব মতো কবিতা উচ্চাৰণ কবল :

**“When the warriors came out first from  
their master’s hall, where had they hid  
their power ? Where were their armour  
and their arms ?**

**They looked poor and helpless, and  
the arrows were showered upon them  
on the day they came out from their  
master’s hall.**

**When the warriors marched back  
again to their master’s hall where did  
they hide their power ?**

They had dropped the sword and  
dropped the bow and the arrow ; peace  
was on their foreheads, and they had  
left the fruits of their life behind them  
on the day they marched back again to  
their master's hall.

কবিতা আবৃত্তি কবাব সময় আবার সেই ভাবটুকু এলবির মুখে—তুমি কবির দেশেব ছেলে, তুমি কবিকে দেখেছ, প্রণাম কবেছ, তোমার ঘনিষ্ঠ হয়ে কবিতা-আবৃত্তিতে অশেষ আনন্দ। তখন মোটব চলছে। তখনো এলবি কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে মোটব চালাচ্ছে। সহরের সব ছোট-বড় দোকান, বোশনাই আলো, গিয়েটাব-হল অতিক্রম কবে ওবা পশ্চিমের দিকে চলছে। এলবি ফের বিশুদ্ধ জগতের বাসিন্দা হয়ে যেন প্রাপ্তিধ্বনি কবল—পিস ওয়াজ অন দেয়াব ফোবহেডস্। অথচ বিজনের কপালে এখন নিষ্ঠুরতা চিহ্ন। সে এলবির এই সাহিত্য-প্রীতিতে পীড়িত হচ্ছে। যেন বলাব ইচ্ছা—আমি বাপু জাহাজী মানুষ, আমাব ইতস্তত মিথ্যা বলাব নিদারুণ অভ্যাস আছে। সাহিত্য-প্রীতি কোনকালে ছিল না, এখনও নেই।

এলবি বিজনের দিকে মুখ না তুলেই বলল, আমবা এসে গেছি। আমরা এখানে বেশীক্ষণ বসব না। জলপাই গাছের নীচে বসে তুমি কবির কবিতা বলে। আমি শুনি।

বিজন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সে বলতে চাইল—আমি কবির কবিতা আবৃত্তি করতে পারব না। জাহাজী মানুষের কবিতা কণ্ঠস্থ করে লাভ নেই। এই নীরস জীবনে সত্যতার আশ্রয়ে বাঁচা নিরর্থক। তবু এলবি ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এলবিকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অহুসরণ করছে। এলবি যেখানে বসল, সে সেখানেই বসে পড়ল। এলবির প্রতি বিক্রপের ইচ্ছায় অথবা মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় নিরন্তর সে কঠিন। এলবি এখন কোন কথা বলছে না। এলবি ঘন হয়ে বসল। এলবি বসন্তঃ বিজনকে কবির প্রতীকীতে অনন্ত করে রাখতে চাইল।

বিজন মরিয়া হয়ে শিশু-বয়সের পড়া কোন কবিতার কথা মনে করতে পারল। (দশম শ্রেণীতে কবির কবিতা সে কিছু পড়েছে—কিন্তু এখন বিধির বিধানে তাও মনে করতে পারছে না। তা ছাড়া ঘটনাটা এমন শীঘ্র ঘটবে সে তাও ভাবতে পারে নি।) সে আবৃত্তি করল। ওর কণ্ঠ মন্থণ

বলে কবিতা-আবৃত্তির বিপ্লব ভবীটুকু এলবিকে আগ্নুত করল।

বিজ্ঞান টেনে টেনে আবৃত্তি করছে—

“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল

কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটল।

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে

শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।”

ওরা পরস্পর কথা বলতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ওরা উভয়ে যেন গম্ভীর এবং ঘন। উভয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিপ্লব ইচ্ছার পরস্পর মহৎ ভাবটুকু রক্ষা করছে।

বিজ্ঞান এলবির নিকট রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীতে বাঁচবার ইচ্ছায় এও বলল, মোটরে যে কবিতা আমাকে শোনালে এ-কবিতা তারই মূল ভাষা।

বিজ্ঞান ভাবল—বন্দরে আমি এলবির চোখে রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঁচব।

তারপর এলবির মোটর থেকে এক সময় বিজ্ঞান জাহাজে উঠে ফোকসালে ঢুকে দেখল, দেবনাথ বাংকে ঘুমিয়ে আছে। অত্যাগত কেবিনেও বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ানক শীতে সব জাহাজীরা কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজে ঘুমোচ্ছে। সে ফোকসালে দাঁড়িয়ে কিছু কাসির শব্দ শুনল। দু-একজন জাহাজীর আলাপ শুনল। এ-শীতে উপরে উঠে ওর হাত-মুখ ধুতে ইচ্ছা হল না। কোনরকমে লকার থেকে খাবারটা বের করে খেয়ে নিল। তারপর ঠাণ্ডা জলে কুলকুচা করে পোটহোলে মুখ ধুলো। এবং বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছায় হাত-পা সটান করে দিল। অথচ ঘুম এল না। ঘুম আসছে না। বিজ্ঞান অন্য ফোকসালে ফের কিছু জাহাজীর আলাপ শুনছে। এখন হয়ত এলবি ঘরে কিয়ে অন্য কবিতা আবৃত্তি করছে। এই বাংকেও সে এলবির কাছে মিথ্যার মুখোসের জন্য ছটকট করছে। অথচ সে স্পষ্ট হলে সাময়িক যন্ত্রণা, দুঃখ এবং নিষ্ঠুরতার গ্লানিকে ধৈর্য ধরে লালন করতে হত না; এই করে সে এক মিথ্যার জন্য হাজার মিথ্যায় জড়িয়ে পড়ছে।

ওর ইচ্ছা হল একবার দেবনাথকে ঘটনাটা খুলে বলে। সাহিত্য-প্রীতি এবং স্পৃহা দেবনাথের যথেষ্ট আছে। বরং সে দেবনাথকেই সঙ্গে নেবে। অথবা দেবনাথকে প্রসন্ন করে জানবে—ওর কাছে কবির কোন বই অথবা কোন কবিতা কণ্ঠস্থ...যদি থাকে তবে...তবে...সে নিঃসংশয় হতে পারছে না তবু। দেবনাথ! দেবনাথ! সে যেন ডেকেই উঠল। মনে মনে ওর এই ডাক এবং এলবির সরল

‘বিশ্বাস, দুটো চোখের ঘনিষ্ঠতা—সব মিলিয়ে ওর চোখে জালা। ওর ঘুম আসছে না। এলবি ‘পাখীসব করে রব’ ইংরেজী হরকে লিখে নিতে চেয়েছিল। সে হয়ত এইসব মুখস্থ করে অন্য কোথাও আবৃত্তি...কিংবা বাহবা...কিন্তু বিজ্ঞান বলেছে তখন শব্দবটী ভালো নেই। আবার কাল হবে। আবার সে ছলনাকে কেন্দ্র করে ধাঁচতে চাইল। এলবির ঘনিষ্ঠতা, সঙ্গ এবং দু’দণ্ডের আলাপ থেকে বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতায় সে ধাঁচতে চাইল না। বিশেষত এই বিদেশিনীকে কাছে স্পষ্ট হওয়াব দক্ষন কোন পরাভবকে স্বীকার কবাব দক্ষন কোন গ্লানিকে ধৈর্য ধরে সহ্য করতে পারত না। অপমানবোধটুকু বিজ্ঞানের অসামান্য। সেজন্য এই মিথ্যার মুখোসে আপাতত জাহাজী ভাবটুকু বক্ষা কবতে পেয়েছে ভেবে সে খুশী।

ভোরবেলায় জাহাজে অনেক কাজ। সালফেট নামানো হচ্ছে। হাড়িয়া-হাপিজ হচ্ছে ফন্ডায় ফন্ডায়। ভোরে আজ সূর্য উঠল না। আকাশ মুখ গোমড়া করে আছে। সমুদ্রের বাতাস পর্দা। বন্দবের পাইনগাছে কোন পাখী বসে নেই। শীতের জন্য ওবা পৃথিবীতে চলে যাচ্ছে। শীতের জন্য এইসব জাহাজীরা হি-হি করে কাঁপছে। ওবা সাবান-জল নিয়ে হাজ ছুটে ছুটে কাজ কবতে পারছে না, ওরা স্থাপুর মতো নীল উর্দির ভিতর শুটিয়ে আসছে। ওরা পুরানো জামা-কাপড় সব আফ্রিকার বন্দরে বিক্রি করে এখন পস্তাচ্ছে। শীতের কষ্ট ভয়ানক কষ্ট।

পাশের জাহাজে কিসের যেন সোবগোল। পাশের জাহাজের নাবিকেরা পোর্ট-সাইডের ডেকে জড়ো হয়েছে। ওবা রেলিঙের উপর ঝুঁকছে। ওদের সকলের চোখ বন্দরের জলের উপর। এই জাহাজের নাবিকেরা ঘটনাটা ধরতে না পেরে গলুই-এ জড়ো হয়েছে। মেজ মালোম অন্য জাহাজীদের ডেকে ঘটনার কথা জানতে চাইলেন। ওবা সকলে এখন খবরটা শুনেছে। পাশের জাহাজের তিন-নম্বর মিস্ত্রী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা কবেছে। ঘটনাটা তারপর আরও বিস্তৃত হল। বন্দরের সব লোক জমেছে। এ-শীতেও কিছু লোক জলে নেমে অহুসন্ধান করছে তিন-নম্বর মিস্ত্রীকে অথচ মিস্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইংলেও ওর জী এডালট্রি কেসে জড়িয়ে পড়েছে—এই খবরটা এখন জাহাজীদের মুখে মুখে।

ভোরের এইসব সাত-পাঁচ ঘটনায় বিজ্ঞান অনামনক হয়ে পড়েছিল। ওর মনে নেই এবং মনে পড়ছে না—গতকাল এক রমণীয় পরিবেশে কোন এক সুন্দরী সুবতীর পাশে মরিয়া হয়ে মিথ্যার পসরা খুলেছিল। মনে পড়ছে না আজও এমনতর বটেতে পারে। একজন জাহাজীর আত্মহত্যা এবং সালফেটের গন্ধ আর এই.

প্রচণ্ড শীত ওকে ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিলকূল বিপরীত ধারণার বশবর্তী করেছে। সে ভাবল যত্নাই শ্রেয়, যত্নাই শ্রেষ্ঠ। পিস্ ওয়াজ অন দেয়ার ফোরহেডস্—সে একথাও ভাবল। সেলিমের কপালে শাস্তির রেখা ফুটে উঠেছে হয়ত। এলবির সেই মুখ—সেখানেও একদিন শাস্তির রেখা নামবে—কবিতা আবৃত্তির সময় এলবির সেই গভীর দৃষ্টি, সেই দৃঢ় অথচ শ্রীতিপূর্ণ চোখ সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে নিঃশ্ব পাইনের আঁধারে সহসা যেন দেখল। এলবি তাকে ভালবাসতে চায়। ববীন্দ্রনাথের মতো করে ভালবাসতে চায়। বিজ্ঞ যেন এখন কবির প্রতীকীতে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে ডাকল—দেবনাথ, দেবনাথ নীচে এস, কথা আছে। বিকেলের কথা রাখার জন্য সে নীচে সিঁড়ি ধবে ফোকসালে ঢুকে গেল।—তুমি তো অনেক বই এনেছ সঙ্গে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন বই আছে তোমার কাছে? এইসব বলার ইচ্ছা হল।

সে দেবনাথের কাছেই ‘গীতাঞ্জলি’ পেল। সে তিক্ত বিশ্বাদে বইটির পাতা উলটাচ্ছে। সে বার বার করে একই কবিতা পড়ল। পড়ে মুগ্ধ কবল। সে পড়ল—

“জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই  
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে”

বিকলে মোটর নিয়ে এলবি বন্দরে হাজির। বন্দরে সে বিজ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করছে। কিনারার শ্রমিকেরা এখন জাহাজের কাজ ছেড়ে বাড়ী ফিরছে। ওরা সকলে এলবিকে অভিবাদন জানাল। কোয়ার্টার-মাস্টার তখন খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন বিজ্ঞকে। বিজ্ঞ একবার গলুই-এ উঠে উকি দিয়ে এলবিকে দেখল। সে একবার আবৃত্তি করল সিঁড়ি ধরে নামার সময়। সে একবার সেলিমের হাসপাতালের দৃশ্য, পরে এই কবিতার সুরে এবং আরও পরে পোশাকের ভিতর ঢুকে গিয়ে অগ্নান থাকার ইচ্ছায় শিস দিতে থাকল।

নীচে নেমে ওরা উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল। বিজ্ঞ মনে-মনে কবিতা আবৃত্তি করল—সেই নির্দিষ্ট কবিতা, সেই সুরে, সেই নিঃশ্ব অথচ ভরা কোটালের মতো আবেগধর্মিতায়। অথচ এলবিকে জানতে দিল না মনে মনে সে এখন কবিতা আওড়াচ্ছে। মনে-মনে সে এখন কবিতার মতোই বিস্তৃত ভাব নিয়ে বেঁচে আছে। সে সেলিমের পাশে বিস্তৃত ভাব নিয়ে বসবে। সে সেলিমের মাথার হাত বুলিয়ে বিস্তৃত শাস্তি দেবে। বলবে, তুই ভালো হয়ে উঠবি। বলবে নাস’কে—প্রেট কি বলছে? আর কতদিন সেলিমকে এখানে থাকতে হবে?



মোটরে ওরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলল। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, এমনকি রয়েল হাসপাতালে দুজন ভারতীয় মেয়ে নার্স ট্রেনিং-এ আসছে এ-খবরও দিল এলবি। ওর বাবা পার্থে যাচ্ছেন। মা এবং বাবা হয়ত যাওয়ার পথে একবার এখানে এসেও যেতে পারেন। কারণ এলবি বিজন সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে দিয়েছে। স্মৃতবাং বাবা আসছেন, মা আসছেন।

এলবি মোটর চালাবার সময় একবার হাতের ঘড়ি দেখল। যেন আজ হাতে কিছুটা সময় বেশী আছে। খুব বিশেষ তাড়া নেই কাজেব। মোটরের গতি সাধারণ। এলবি খুব খুশী-খুশী হয়ে কথা বলছিল। বলছিল, আশা করি সেলিমের ভালো খবরই আমরা পাব।

ওরা হাসপাতালে কিন্তু শুনল অন্য কথা। মিঃ ট্রয় সেলিমের কাছে এলবির নামে একটা চিঠি বেখে গেছেন। এলবি চিঠিটা পড়ল। এলবিকে এখন বিষয় দেখাচ্ছে। বিষয়গত বিজনেও সংক্রামিত হল।

এলবি বলল, সেলিমের মেজব অপারেশন হবে। বাঁ দিকের ফুসফুসটা বাদ যাবে। এলবি এইসব কথা হাসপাতালের সিঁড়ি ধরে নামার সময় বিজনকে শোনাল।

বিজন বিছানায় বসে সেলিমের সঙ্গে বক্তামাসা করছিলেন। দেশে ফিরলে সেলিম বিবিকে প্রথম কোন জাহাজী বন্ধুব গল্প শোনাবে, প্রশ্ন করে বিজন জানতে চেয়েছিল আরও অনেক সব কথা—বিজন এখন সব যেন মনে কবতে পারছে না।

অন্যান্য দু-একজন জাহাজীও ওব পাশে বসে ছিল। সাবেঙ বলে পাঠিয়েছেন তিনি কাল এসে দেখে যাবেন। বিজন সেলিমের বিছানায় শেষ সময়টুকু পর্যন্ত কাটাতে পেরে খুশী। তাবপর ভিজিটারদের শেষ ঘণ্টা পড়ল। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সেলিমের অস্ত্রোপচাবের কথা শুনল। এবং এই শুনে বিজনের কেমন অন্যমনস্কতা বাড়ছে। এলবি মোটরে বসে লক্ষ্য করছে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় বিজন খুব ভেঙে পড়ছে। এলবির এখন বিজনকে উত্তেজিত করার ইচ্ছা। জাহাজী বিজন কেমন মক্ষলের মেয়েমানুষ বনে যাচ্ছে।

ওরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কটায় ঢুকে গেল, যেখানে মিমোসা-ফুলেরা ঝরে গেছে, যেখানে রেস্ট-রুমে বসে যুবক-যুবতীরা সন্ধ্যারী মজ্জার আর্তনাদ করছে, যেখানে বাটারকাপ ফুল ফুটে একলা স্তম্ভরী রমণীর টুপির পালকের মতো উদ্ধত হতে হতে শীতের তাড়নায় মলিন হয়ে গেছে—তার ভিতর দিয়ে জলপাইয়ের ঘন বন পার হয়ে ইউকালিপটাসের ঘন আলো-আঁধারে ওরা বসে পড়ল। পাতার

আড়ালে আড়ালে সব ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলো। আলোর ছায়া। আকস্মিক-কাটা  
রঙ ওদের শরীরে, মুখে। ওরা এসময় পরস্পর মুখ তুলে তাকাল।

বিজন বলল, সেলিম আমার সঙ্গে দু'সকর ধরে কাজ করছে। দু'সকর ধরে  
ওর সঙ্গে উঠে বসে কখন যে আমরা একে অপরকে ভালবেসে কেলেছি জানিনা।  
এখন বুঝতে পারছি ওর অভাবটা জাহাজে আমার কত বড় হয়ে বাজছে।

তারপর ওর। এইসব ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলোয় অথবা মনের আরও সব  
নীল ইচ্ছায় প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে—তারপর সেই কবিতার জগতে ফিরে আসা  
কবিতার জগতে ডুবে যাওয়া, ইতিহাসের মৃত নায়কের মুখের মতো ছবি হয়ে বসে  
থাকা এবং অবশেষে নিজেদের প্রাপ্য হিসাবে মনে-মনে অচঞ্চল থাকার বাসনা—  
এমন একদিন হয়নি, অনেকদিন হয়েছে। ওরা পরস্পর পরস্পরকে কবিতা আবৃত্তি  
করে শুনিয়েছে। এলবি বিজনকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ওর হাতের আঁকা ছবি  
দেখিয়েছে। তারপর কোন রেস্টুরেন্টে অথবা নীল আকাশের নীচে বসে সেলিমের  
অস্ত্রোপচারের দিনের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়েছে।

একদিন এলবি বলল, বাবা মা কাল আসছেন।

—জীলগু এখান থেকে কতদূর? প্রশ্ন করেছিল বিজন।

—খুব বেশী দূর নয়। পুরো তিনশ' আটচল্লিশ মাইল।

—কিসে ও'রা আসবেন?

—ট্রেনে আসা যায়। বাবা মোটরে আসছেন। খুব প্রেক্ষাপট জানি।

একটু থেমে এলবি বলল, ওঁদের সঙ্গে আলাপে তুমি খুব খুশী হবে।

—আমার সঙ্গে আলাপে ও'রা খুশী হবেন তো?

এলবি হাসল।

ছদ্দিন পর এলবি ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে বিজনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ও'রা  
বিজনকে বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য—তোমাকে আমাদের ভিতর পেরেছি।  
পরম সৌভাগ্য, এলবি এসময় খবর দিয়ে তোমার কথা জানিয়েছে। আমরা  
সকলেই কবির ভদ্রানক ভক্ত। তুমি তাঁর পাশের লোক। তুমি ওঁর স্পর্শলাভ  
করেছ—এবং আমরা তোমার সজলাভ করেছি ভেবে খুশী।

এলবির বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বিজন সত্যি খুশী। ভদ্রলোক  
অমায়িক। 'ভদ্রলোক প্রাণ-উচ্ছল অথচ কথাবার্তায় খুব সংযত। বিজনের মুখ  
থেকে কবির কবিতা শোনার একান্ত ইচ্ছা ওঁদের। বিজন পর পর কয়েকটি  
কবিতা আবৃত্তি করল।

ভীষণ শব্দে বললেন, তুমি আমাদের কথা দাঁও ডিনারে একদিন উপস্থিত থাকবে। আমরা খুব আনন্দিত হব তোমার উপস্থিতিতে।

—দিন স্থির করুন, আসব।

—কিন্তু একটা কথা। মিঃ চার্লটন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধবালেন এবং টেবিল ঘুরে এসে বিজনেব পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা তোমাকে চাইনিজ ডিশ দেব। খুব মনোরম খেতে। কিন্তু --।

এলবি এবার আর একটু প্রকাশ করল। —বাবা চায়নাতে অনেকদিন ছিলেন। এম্বাসিতে কাজ করতেন। সুতরাং বাবা কোন ভুললোককে ডিনার-পার্টিতে নিয়ন্ত্রণ কবলেই তাঁকে চাইনীজ ডিস দিতে ভালবাসেন।

চার্লটন আবার আবস্ত করলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে ট্যাগোবের দেশেব ছেলে তুমি—বলতে গেলে ঘবেব ছেলে। সুতরাং ট্যাগোব কি খেতেন এবং খেতে ভালবাসতেন নিশ্চয়ই তোমাব জানা আছে। মেহুতে ট্যাগোব-ডিশও একটু থাকবে—কি বল। তাব প্রিপারেশনের ভাব তোমাব উপব। কি কি লাগবে বলে দাঁও, আমি সব সংগ্রহ কবে বাখব। আগামী ববিবার ছুটির দিনে আমরা এখানে ফের আসব। এবার তিনি থামলেন। পাশে মিসেস চার্লটন উল বুনতে বুনতে লাকিরে উঠলেন, বড় চমৎকাব হবে। এলবিব পিসিকে বললে হয়। তারপর আরও দু-একজনের নাম তিনি বলে গেলেন।

বিজনেব বলল, রান্নাতে আমি বশ্ত নই। দেবনাথ বলে একজন জাহাজী আছে—সেও বাঙালী, সে ভালো রাঁধতে জানে। ওকে নিয়ে আসব।

এলবি টেবিলের উপর খাতা বেখে বলল, কি কি সংগ্রহ কবতে হবে বল।

—কিছুই দবকার হবে না। কাবণ মশলাপাতি তুমি এখানে কোথাও খুঁজে পাবে না। সরষের তেলও বোধহয় নেই। দেবনাথকেই বলব সব সংগ্রহ করতে, পার তো কিছু ডিম, মাংস এবং ডেজিটেবল সংগ্রহ করে বেখ—তাতেই চলবে।

এলবি দীর্ঘদিন পর আজ সকলকে পিয়ানো বাজিয়ে শুনাগেলো। বিজনেব দেখল আগুনের মত রঙ এলবির শরীরে। এলবির সাদা স্মার্ট এবং হলুদ জ্যাকেট থেকে সে-রঙ যেন চুইয়ে পড়ছে। বাইরে শীতের ঠাণ্ডার যেন তুবাব ঝরছে। ওরা ভিনজনেব আন্তনের পাশে বসে উত্তাপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মিসেস চার্লটন উজ্জনে কার্ট শুঁজে দিচ্ছেন। মিঃ চার্লটন চীনদেশের গল্প করছেন এখন। সে-দেশের কীতিনীতির গল্প করছেন। এলবি এখন আর পিয়ানো বাজাচ্ছে না। চেয়ারে বসে সেও বিদেশের গল্প শুনছে। সহসা এইসব কথার ভিতর বিজনেব যেন দেখল

ওরা সকলে একই পরিবারভুক্ত লোক হয়ে শীতের রাতে উহ্নের পাশে আশ্রয় পোহাচ্ছে। সহসা মনে হল বাংলাদেশেরই কোন পরিবারের ভিতর সে বসে যেন ঠাকুমার গল্প শুনেছে।

দেবনাথ এবং বিজ্ঞান সকাল-সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেল। ছুটির দিন। এই শীতের ভিতরও সহরের সব যুবক-যুবতীরা ছুটি ভোগ করতে দলে দলে বের হয়ে পড়েছে। ওরা সব রেন্টোর'য়, পাব-এ অথবা পার্কে কিংবা অনেকে সহরতলীতে ছড়িয়ে পড়েছে। দেবনাথ এবং বিজ্ঞান হেঁটে যেতে যেতে সব টের পাচ্ছে। ওদের হাতে ছোট নীল ব্যাগ—ট্যাগোর-ডিশের জন্ত যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা ওতে। ওরা গল্প করতে করতে অথবা অথথা উচ্ছল হতে হতে হাঁটছে।

ওবা বন্দর স্কেন, জনসন রোড ধরে ছোট পাহাড়টায় উঠে গেল। এখানে ছোট ছোট কার্টের ঘর—নীল অথবা হলুদ রঙের। দবজায় নীল রঙের পালিশ। বাড়ীর সংলগ্ন ছোট ফুলের বাগান, সবজির বাগান। প্রচণ্ড শীতের জন্ত বাগানে কোন ফুলের চিহ্ন অথবা সবজির চিহ্ন নেই। গোলাপেরা শুধু কুঁড়ি মেলার চেষ্টা করছে। ওরা দ-এর মতো পথে, কখনও সিঁড়ি ভেঙে, কখনও ঘুরে ঘুরে এলবির ছোট নীল আন্তানার গিয়ে হাজির হল। প্রথমেই ছোট কার্টের দরজা। সংকীর্ণ ফুটপাথের বাঁ পাশের ধামটায় লেখা 'শান্তির নীড়' তামার প্লেটে খুব চক্‌চক্‌ করছে। সদর দরজার উপর আইভি-লতার গুচ্ছ। পাতা নেই—শুধু লতাগুলো ছলছে। ভিতরে বাঁ পাশে মুরগীর ঘর। ডানপাশে ফুলের বাগান। 'এল' অক্ষরে পথ। পথের দু'পাশে নানারকমের সামুদ্রিক পাথর। অন্য পাশে কোমর-সমান কার্টের রেলিঙে কিছু নীল প্রজাপতি বসে আছে; মি: চার্ল'টন এবং মিসেস চার্ল'টন বের হয়ে তখন ওদের অভিযান জানালেন। বুললেন, গতকালই আমরা এসে গেছি।

এলবিও সেজেগুজেবের হল। যেন ফুলের মতো এই শীতের হালকা রোদে ফুটে উঠল। এলবি ওদের ভিতরে নিয়ে গেল। বিজ্ঞান দেবনাথের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। এলবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেবনাথকে সমস্ত বাড়ীটা দেখাল। এই ওর বাড়ী—এখানে সে থাকে, এই ওর ঘর—এখানে সে রাখে, এই ওর ঝেঁজল—এখানে সে ছবি আঁকে। দেবনাথ সব ঘুরে দেখল। এলবির একটি বিশেষ রুচি আছে—এ-বোথ ওর এখন জন্মাচ্ছে। ঘরে সব বড় বড় ক্যানভাস। নানা রঙের ছবি।

ওরা এসে পাশের ঘরটার বসল। মি: চার্ল'টন কডকগুলো ছোট ছোট 'কাটি' এনে পাশে রাখলেন। মন্থন করার জন্ত কিছু শিরিব কাগজ। তিনি সকলকে

কাঠিগুয়া দেখালেন— এগুলো রাইস-টিক্‌। তারপর দু'-আঙুলের ফাঁকে কাঠি চেপে কারদা-কাহ্ন শেখাতে থাকলেন দেবনাথ এবং বিজ্ঞকে। দেখালেন, কি করে টিক ধরতে হয়, কি করে মুখে ভাত তুলতে হয়। একটা খালি চিনেমাটির বাসনও রাখলেন সকলের সামনে। ছোটখাটো একটা ডেমনস্ট্রেশন দিলেন।

দেবনাথ এইসব দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। সে ঘড়ি দেখল। এখন দশটা বাজে। এখনও এলবি টেবিল সাজাচ্ছে। কখন রান্না হবে এবং কখন খাওয়া হবে এই ভেবে সে উন্মাদ প্রকাশ করল।

একটি ঘরকেই এলবি কার্ঠের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করে নিয়েছে। এ-ঘর থেকে সে-ঘরে যাওয়ার একটি মাত্র খোলা পথ। একটি মাত্র দরজা। দরজার পান্না নেই। দরজায় চাইনীজ মিস্কের দামী পর্দা। পর্দা সরালেই ঘরটা স্পষ্ট। পর্দা সরালেই ধবধবে বিছানা স্পষ্ট। দেবনাথ পর্দা সরিয়ে সব দেখল। বারান্দার দক্ষিণদিকে চিলতে রান্নার জায়গা। পরে বাথরুম, পাশে ছোট একটি লনের মতো জায়গা। সেখানে গরমের দিনে ইজিচেয়ার নিয়ে বসা যায়। সেখানে একটি 'ডাক্স ডেজেল' এখনও রেলিঙের সংলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। ছুটির দিনে এলবি সেখানে ছবি আঁকে।

ওরা উচু জায়গায় বসে বন্দর দেখল। বন্দরের জাহাজ দেখল। এখানে বসে অসীম সমুদ্রের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। পাহাড়ের নীচে সারি সারি ছবির মতো ঘর, ছবির মতো মাছঘেরা হাঁটছে। দেবনাথ চারপাশটা চোখ মেলে দেখল।

দেবনাথ কের ঘড়ি দেখে বাংলাতে বলল বিজ্ঞকে, এরা কি আমাদের নিমন্ত্রণ করে খালি-পেটে রাখার যোগাড় করছে নাকি! এখন বাজে সাড়ে দশটা—অথচ রান্নার কোন আয়োজনই করছে না।

বিজ্ঞ বলল এলবিকে, সব যোগাড় আছে তো? অর্থাৎ এই কথা বলে বিজ্ঞ রান্নার প্রসঙ্গে আসতে চাইল।

এলবি ফুলদানিতে কিছু সংগ্রহ-করা ফুল ভরে দিল। এলবি তারপর বিবাহিত রমণী-শুলভ চোখে বিজ্ঞকে দেখল এবং বলল, সবই এনেছি। তোমাকে ভাবতে হবে না। রান্নাঘরে ঠিক 'আমর' এগারোটায় ঢুকব। এবং আশা করছি ঠিক বারোটায় রান্না শেষ করতে পারব। ট্যাগোর-ভিশের কি কি মেছো হবে?—এলবি দেবনাথকে প্রশ্ন করল।

দেবনাথ বলল, মেছো বেশী করতে হলে অনেক সময়ের দরকার হবে। বস্তুত দেবনাথ ডিমের ঝোল অথবা মাংসের ঝোলই ভালো রান্না করতে পারেন। মাংসের

ঝোল করতে বেশী দেবী হবে বলে সে বলল, রাইস এবং এগ-কারী।

এলবি বলল, রাইস তো চাইনীজ ডিশেও থাকবে। সুতরাং একমাত্র এগ-কারী।

একসময় দেবনাথ এবং মিঃ চার্লটন রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। দেবনাথ সঙ্গে করে গুঁড়ো মশলা এনেছে। এলবি দেবনাথকে সিদ্ধ ডিমের কোঁটা খুলে বড় বড় কিছু ডিম বেব কবে দিল। মিসেস চার্লটন এবং বিজন গুঁদের সকলকে কাজে সাহায্য করলেন। গ্যাসেব উত্থানে আতপ চালের ভাত হল। এই ভাত রান্নার কোঁশলটুকু আয়ত্ত কবে মিঃ চার্লটন এখন গৌরব বোধ করছেন। তিনি ভাত রান্নার সময় গল্প করছিলেন—কোথায়, কখন এবং কি কোঁশলে তিনি এই দুর্লভ বিত্তা আয়ত্ত করেছেন। অন্তত হাজারবাব সেই নির্দিষ্ট চাইনীজ মহিলাটিকে তিনি ধত্তবাদ জানালেন। জানালেন ভদ্রমহিলা খুব হৃদয় দিয়ে তাঁকে এই বিত্তা আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছেন।

এলবি কোঁটা থেকে কিছু কর্ন-বীক বেব কবে দিল। মিসেস চার্লটন ময়দার ডেলা গোল গোল করে সেই কর্ন-বীক ভিতবে ভরে দিচ্ছেন। সেগুলো জলে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। এ-সময় ভয়ানক উৎকট গন্ধে বিজন ঘরে থাকতে না পেরে বাগানে চলে এল এবং অনেকক্ষণ ধবে একা-একা পায়চারী করল।

একঘণ্টার ভিতরেই প্রায় সব হয়ে গেল। বাতে ছোট একটা ভেড়ার বাচ্চা বোর্স্ট করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধু ওটাকে ফের চর্বি মাখিয়ে গরম করে নেওয়া হল। গ্রীন পীজ সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। কিছু স্ট্রালাড, স্ট্রাউটইচ। ইতিমধ্যে মিঃ ট্রয় এসে গেছেন, টনি এসে গেছে, এলবির পিসিও এসে পড়লেন। এবং অগ্ন্যান্ত আরও দু-একজন অপরিচিত ব্যক্তি ধারা সকলেই মিঃ চার্লটন অথবা মিসেস চার্লটনের বন্ধু পর্যায়ের। ওরা ঘরে ঢুকে সকলে সকলকে অভিবাদন জানালেন এবং পরিচিত হলেন।

খাবার টেবিলে ওরা সকলে সকলকে সাহায্য করলেন। খেতে বসার আগে এলবি বলল, আমরা ভগবানের পৃথিবীতে নিত্য দুটো আহাৰ্ঘ গ্রহণের সময় সকলে প্রার্থনা করব—বেচারী সেলিম আরোগ্য লাভ করুক। সকলে দাঁড়ালেন এবং মিনিট দুই কাল সেলিমের নিরাময়ের জন্ত অধোবদনে থাকলেন। তাঁরা সকলে প্রার্থনা করছেন। এলবিকে যথার্থই এখন কোন বাড়ালী আর্টপোরে গুহিগ্নয় মতো মনে হচ্ছে।

খেতে ঝুঁসই খুব উৎসাহের সঙ্গে চার্লটন ভোজ্যব্রব্যের কিরিস্তি দিলেন

প্রথম। কিছু রাইস-স্টিক পরস্পর পরস্পরকে দিলেন। প্রথমেই চীনেমাটিক বাসনে কিছু ভাত এবং আধসিদ্ধ মাংসপূর, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো চার্লটন সকলকে পরিবেশন করলেন। এবং কাঠির সাহায্যে সকলকে খেতে অহরোধ জানালেন। এইসব আধসিদ্ধ মাংসপূর, ভাত কাঠির সাহায্যে মুখে তুলতে গিয়ে বিজন ওয়াক তুলতে তুলতে বলে ফেলল, যথার্থই চমৎকার আপনার এই চাইনীজ ভোজ্যদ্রব্য। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চার্লটন মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, বলেছি না ওরা তারিক করবে! চীন ভারতবর্ষ পাশাপাশি দেশ। সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ওরা প্রায় এক।

দেবনাথ ছোট ছোট চোখে মিঃ চার্লটনকে দেখল। ইচ্ছে হল ডিশের সবগুলো ভোজ্যদ্রব্য চার্লটনের মুখে ছুঁড়ে দেয়। অথচ সেও বলল, ভেরী নাইস।

দেবনাথ এবার ট্যাগোর-ডিশেব এগ-কাবী সকলকে পরিবেশন করল। সে জানত লঙ্কার গুঁড়োটা একটু বেশীই পড়েছে। সে জানত বাল খেয়ে গুঁদেব জিব টাটাবে। সে বিক্রপ করে বলল, ট্যাগোর বাল একটু বেশী খেতেন।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল চার্লটনের মাথায় উঠে গেল। চার্লটনের মাথায় টাক—তিনি তালুতে ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। বাল খেয়ে অন্য সকলের টোট কুক্ষিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে। সকলে মাথায় ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। সকলে জল খেলেন প্রচুর। এবং গাদা গাদা চিনি খেলেন। চোখ সকলের ভারী হয়ে উঠেছে, লাল হয়ে উঠেছে। ওঁরা তবু কোনবকমে উচ্চারণ করলেন, গ্র্যাণ্ড! ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যাণ্ড!

দেবনাথ এবং বিজন ভাতের সঙ্গে ডিমের ঝোল বেশ তৃপ্তি করেই খেল। ওরাও বলল, ট্যাগোর-ডিশ গ্র্যাণ্ড। তারপর ওরা কাঠি দিয়ে ভাত খাওয়ার চেষ্টা করল। কিছু খেল, কিছু নষ্ট হল। তারপর শ্ৰাণ্ডউইচ, গ্রীন পীজ এবং লায়-রোস্ট খেয়ে ওরা খুশী হতে পারছে। ওদের এখন সেই জাহি-জাহি ভাবটুকু নেই। শেষে কফি খেয়ে ওরা সকলে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। সকলের মুখ দেখে মনে হবে এখন এইমাত্র টেবিলে বড়রকমের একটা ঝড় বয়ে গেছে।

বিকলে ষ্টেশন-ওয়াগনে মিঃ এবং মিসেস চার্লটন জীলগের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মিঃ ট্রয় ও অন্যান্য দু-একজন আগেই চলে গেছেন। এলবির পিকি গেলেন এইমাত্র। খাওয়ার আগে দেবনাথ এবং বিজনকে গুঁর ঘরে একটু নিয়ন্ত্রণ করে গেলেন। দেবনাথ গেল সকলের শেষে। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ওরা

তিনজন যখন গাড়ীতে উঠতে যাবে তখন দেবনাথ বলল, এবার আমি যাই।  
জাহাজে আমার একটু দরকার আছে।

গাড়ীর ভিতর এলবিকে আজ একটু উচ্ছল বলে মনে হল। এলবি বলল, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে। ওকে আজকে খুব ভালো দেখাচ্ছিল। সে নিজে এখন উঠতে নামতে পারছে। এখন অপারেশন হলে বাঁচি।

—আমিও আশা করছি আমরা একসঙ্গে দেশে ফিরতে পারব। একসঙ্গে ফিরতে পারলে খুবই আনন্দের ব্যাপার ঘটবে।

এলবি কথা বলল না। এলবি সন্তুর্ণণে ওর মুখ দেখল। বিজনের মুখে যেন এখন কোন যন্ত্রণার ছবি নেই। যেন সে এমত ঘটনায় যথার্থই আনন্দিত হবে। এলবি স্টীয়ারিং-এ বসে একটু অন্যানমনস্ক হয়ে পড়ল।

ওরা আবার জাকরী-কাটা আলো এবং পাতার ছায়ায় এসে বসল। বিকেল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে না। ওরা পাশাপাশি আজ বসল না। ওরা মুখোমুখী বসল। এলবি কেন জানি ইচ্ছা করেই পর পর চার-পাঁচটি কবিতা শোনালো বিজনকে। আজ বিজনকে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কোন অল্পরোধ করল না, এমনকি বিজন কতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে তাও লক্ষ্য করল না। এবং এই কবিতা-আবৃত্তির সময়ই এলবির একটু মদ খেতে ইচ্ছে হল। বলল, তুমি একটু মদ খাবে বিজন?

সে-রাতে উভয়ে মদ খেয়েছিল। অথচ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয় নি। পরস্পর গোলাপী নেশায় উন্নত হয় নি। তবু কেন জানি বিজন ঘাস থেকে উঠতে পারছিল না। সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ওর দস্তানা খুলে যাচ্ছে। পেটের ভিতর এক দুর্বল যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠছে। সে বলল, এলবি, আমি আর পারছি না।

এলবি সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজনকে তুলে ধরল এবং ধীরে ধীরে মোটরের ভিতর শুইয়ে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে বিজনকে নিজের খাটে শুইয়ে দিল এবং কোন তুলে ডায়াল করল; বলল, ক্যারল আছেন? জঃ ক্যারল। ব্রীজ কাইড বাই এইট নটিংহিল। পেশেন্ট সিরিয়াস।

ডাক্তার বিজনকে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, কন্সলিপেশনের জন্য এমন হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। দু'দিনেই ভালো হয়ে উঠবে। দু'রকমের পিল থাকল। এখন একটা খাইয়ে দিলেই ব্যাথাটা কমে আসবে। পেটে একটু গরম জলের নৈক দিতে পারেন।



ভাস্করবাবু চলে গেছেন। এলবি বিজনকে বলে দু'মিনিটের জন্য বাইরে গেছে। বিজন যন্ত্রণায় ছটকট করতে কবতে দেওয়ালের সব ছবি দেখল। বড় বড় সব ক্যানভাসে নানারঙের ছবি। কবির ছবি দেয়ালে। হলুদ রঙের দেয়াল। এলবির হাতে আঁকা কবির এই ছবি যেন বিজনকে বিক্রপ করছে। যেন বলছে বাপু! যাহোক তোমরা আমাকে নিয়ে তামাসা কবলে। বিজন এই যন্ত্রণাব ভিতরও প্রথম দিনের কথা ভেবে অতৃপ্ত। বস্তুত সে দুঃসহ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ওর প্রথম দিনের ইচ্ছাকৃত তামাসাব জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

এলবি ঘবে ফিবেই বিজনের কপালে হাত বেখে উত্তাপ দেখল। তাবপব জল এনে পিল খাইয়ে দিবে হট-ওয়াটার ব্যাগে পেটে সেক দিতে থাকল। অধীর আগ্রহে সাবাত জেগে ওব পাশে বসে থাকল। ভাববাতের দিকে দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে বিজন যেন মুক্তি পেল। বিজন পাশ ফিবে এলবির সেই আন্তরিক এবং প্রীতিপূর্ণ চোখের দিকে চেয়ে বলল, এলবি, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম।

এলবি ওব কপালে হাত রাখল শুধু। কোন কথা বলল না। বিজন ওর চোখ দেখেই বুঝল, বুঝতে পাবে এ-মুহুর্তে ওকে নিবাম্ব কবে তোলাব কী আকুল ইচ্ছা এলবির চোখে।

ভোবের দিকে বিজন ঘুমিয়ে পড়েছে। স্নতবাং ঘুম ভাঙতে ওব দেবী হল। জানালার রোদ ওব বিছানায় এসে নেমেছে। এলবি বাইবেব ঘবে আছে। কাকে এমন কোন কবল এইমাত্র। বিজন বিছানায় শুয়ে সব ধবতে পাবে—এলবি জাহাজে কোন কবে কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলছে, ওব অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর দিচ্ছে এবং সঙ্গে চাব-পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুব কবাব জন্য ফোনে আবেদনপত্র পেশ করছে।

এলবি এ-ঘবে এসে দাঁড়ালে বিজন ভাবল, কি দবকাব আর থেকে। শরীর আমার ভালো হয়ে গেছে। বেশ সুস্থ বোধ করছি। বরং আজ জাহাজে চলি। কিন্তু এলবির মুখের দিকে চেয়ে বলতে পাবল না কথাগুলো। চোখে ওব সারারাত অনিদ্রার অবসাদ। শরীরে ক্লান্তি। এলবি ওব কপালে হাত রেখে বলল, খুব ভয় ধবিয়ে দিয়েছিলে যাহোক।

—তাই নাকি!

—তা নয়ত কি! একটু মদ খেলে তো, অমনি ঘাসে লুটিয়ে পড়লে।

—তুমি তো জান এলবি, ওটা মদের জন্য হয়নি। ওটা আমার জাহাজে কাজ করার পর থেকেই হচ্ছে। মাঝে মাঝে হত, কিন্তু এখন কঠিন হত না।

একটু থেমে বিজন বলল, বরং এখন জাহাজে চলি।

—তুমি কি পাগল, বিজন! ক্যাবল তোমাকে পূৰ্বো পাঁচদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কান্টোনকে এইমাত্র খবর দিলাম। তিনি খুব ভালোমানুষের মতো বললেন, সেজন্য কি আছে। নিশ্চয়ই ও চাব-পাঁচদিন ছুটি পাবে।

—তুমি তো ছুটি নিলে। এখানে থাকাব অর্থই হচ্ছে তোমাকে অনুবিধায় ফেলা।

—আমাব কোন অনুবিধা হবেনা। পাশেব ঘবে আমি থাকব। যখন যা দবকার আমাকে বলবে।

বিজন পূৰ্বো পাঁচ দিন এবং পাঁচ বাতই ওব ঘবে থাকল।

পাঁচ বাতে ওবা পাশাপাশি ভিন্ন ঘবে গুয়ে জানালায় ববীজ্ঞনাথেব ছবি খতে দেখতে অথবা কবিত আবৃত্তি কবতে কবতে ঘুমিয়ে পডত। অথবা ঘুমিয়ে প ডাব ভান কবত। এলবি বালিশেব নীচে দুটো হাত সন্তর্পণে ঢুকিয়ে কি যেন বাব বাব খুঁজত। কি যেন বালিশেব নীচে ওব হাবিয়ে গেছে। কখনও এলবি বাতেব প্রজ্ঞাপতিদেব বিছানাব চাবপাশে দেখত। ওব প্রতীক্ষাব জগতে সেইসব প্রজ্ঞাপতিবা উড়ে উড়ে একদা অবসন্ন হত এবং সকালেব দিকে ওবা ঘুমিয়ে পডত। কোন কোন বাতে এলবি এই শীতেও জানালা খুলে বাতেব প্রজ্ঞাপতিদেব শবীব থেকে উড়িয়ে দেবাব চেষ্টা কবেছে। এই ঘন বাতে এবং শীতেব রাতেও ওর শবীব মধুব এক উত্তেজনায় অধীব হযেছে। বাঙালী এক নাবিকেব শবীবে কবির যুবা শবীবী বৃত্তিকে স্পর্শ কবাব ইচ্ছায় সে সহসা কাতব হত। আর বিজন নিজেকে ববীজ্ঞনাথেব অল্পগামী ভেবে সহজ ইচ্ছাব বৃত্তিতে কঠিন তাদনাযও ডুব দিতে পাবলে না। পর্দাব আডালটুকু ওদেব দুজনকে সেজন্য পবম্পব মহৎ কবে রাখল।

জাহাজে ফিরে এসে বিজন প্রথম বাতে অনিদ্রায, দ্বিতীয় রাতে অসহিস্কৃতায় ভুগে সাবাদিন কাজ কবাব অজুহাতে ডেক এ পড়ে থাকল। দুদিন এলবি ইউনিয়নেব কাজে সহব ছেড়ে অন্যত্র থাকছে মিঃ ট্রয়েব সঙ্গে। দুদিন দেখা-সাক্ষাতের কোন সুযোগ নেই। বিকেল কাটছে হাসপাতালে। পরবর্তী সময়টুকু আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। খুব নিঃশব্দ, নিঃশব্দ ভাব জাহাজে। কেউ থাকছে না। বন্দবে নেমে সকলে গলির আঁধারে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এইসব দেখে সে আর পারছে না, সহজ ভাবটুকু রক্ষা করতে পারছে না।

বন্ধুত্ব বিজন এক অহেতুক ঈর্ষায় পীড়িত হচ্ছে। মিঃ ট্রয়েকে কেন্দ্র করে এই

ঈর্ষার জন্ম। বিজ্ঞান প্রতিমূহুর্তে নিঃসঙ্গ জাহাজী যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। এলবিব অল্পপস্থিতি যন্ত্রণাব গ্রাসকে কঠোর কবে তুলল। নিদারুণ জাহাজী যন্ত্রণায় সে দেবনাথের সঙ্গে গোপনে সস্তায় একটু মদ এবং সস্তায় একটু যৌন-সংযোগ-বন্ধার্ধে সেজন্য বন্ধপবিকব। কিন্তু মুখের ভাবটুকু সকল সময়ের জন্য সরল নিঃস্বার্থ এবং যৌন জীবনে নিম্পাপ, যেন এই মহৎ পৃথিবীতে অগ্নীল হবাব মতো। কিছুই নেই। বিজ্ঞান দেবনাথের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে বলল, আব কতদূর তোমাব বাতের আস্তানা ?

অথচ বিজ্ঞান বাতের আস্তানায় দব কবতে গিয়ে দেখল যুবতী সব সময়ের জন্য চোখ-দুটো কোটবাগত কবে বেখেছে। প্রতিদিনের যৌন অভ্যাচাবে গালে অগ্নীল টোল। নগ্ন চেহাবাতে যাতকবের লাঠিব মতো ভেঙ্কি। এবং সমস্ত শবীবে কিসেব যেন দাগ—যেন অভ্যাচাবেব অগ্নীল উকি পবে নিত্য জাহাজী যন্ত্রণার সাক্ষী খেকেছে। পাশাপাশি দুটো চোখ—এলবিব চোখ এলবিব প্রীতিপূর্ণ চোখ...সে পাবল না। সে নগ্ন হয়ে নাচতে পাবল না বাতের আস্তানায। মদেব গোলাপী নেশা ছুটে গেলে সে যথাসম্ভব সজ্ব ছুটে পালাল।

সে জাহাজে কিবে দেখল ডেক খালি। কোন জাহাজীব সাদাশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ডেকেব উপব কিছু ইতস্তত আলো জ্বলছে। একটা বেডাল এ-শীতেও অকিসাব-গ্যালীতে থাবাব খুঁজছে। বিডালটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে এবং ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে। সে আবও এগিয়ে গেল। সে শুনল—ডেক-ভাণ্ডাবী মদ খেয়ে নীচে হলা করছে। নীচে নেমে দেখল সকল জাহাজীদের দবজা বন্ধ। যে দু-একজন জাহাজী এখনও কেবেনি তাব। আব এ-বাতে কিববে না। সে ধীরে ধীরে নিজেব দবজাব সামনে গিয়ে দাডাল। দেবনাথ আগে কিরে এসেছে। কোকসালের ভিতবে লকারের শব্দ। বুঝি দেবনাথ লকাব খুলছে। বুঝি দেবনাথ বাংকে বসে খাচ্ছে। বিজ্ঞান দবজা খুলে ভিতরে ঢুকে বলল, আমি পারিনি, দেবনাথ—আমি পাবিনি। মেয়েটির শবীব দেখে আমাব করুণা হল।

এই করুণাব কথা ভেবে যখন সে ক্ষতবিক্ষত তখন দেবনাথ খেতে খেতে বলছে—এলবি এসে এই বাংকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবে গেছে তোমার জন্য।

—তুমি কি বললে ?

—বললুম রাতের আস্তানায় গেছে।

—দেবনাথ ! সে চীৎকার করে উঠল। ইচ্ছা হল দেবনাথের গলা টিপে ধরতে। বিজ্ঞান লক্ষ্য করল, দেবনাথ দুজনের ভাত একাই গিলছে। ওর নেশা

এখনও প্রকট। সেজন্য দেবনাথের হাত কাঁপছে। এবং গোল গোল চোখে বিজনকে দেখছে।

—বললাম তুমি এলবিকে ঠকিয়েছ। তুমি ববীন্দ্রনাথের নামে ‘পাখীসব কবে বব’ শুনিয়েছ। বললাম তুমি পূর্ববঙ্গে ছেলে, বললাম দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসেছ। কোন এক কলোনীতে পিসিমাৰ ঘবে থাক। তোমাব বাড়ী বটতলায় নয়। স্মৃতবা\* বটতলা থেকে নিমতলা কাছেও নয়। আর কিছু বলল না দেবনাথ। কেব ভাত খাচ্ছে। অথবা বললে যেন এবকম শোনাও—বিজন, আমি ঈর্ষাব তাডনায় ভুগছি। তুমি এমন প্রীতিপূর্ণ চোখেব স্নেহচ্ছায়ার বন্দবেব দিনগুলো কাটাবে, তুমি বস্তুত ববীন্দ্রনাথের মতো বাঁচতে চাইবে, সে অ’মাব সহ্য নয়। সে বলল, কবিব প্রতীকী হয়ে তুমি এলবির কাছে বেঁচে আছ, আমি কোটবাগত চোখে জাহাজী হয়ে বেঁচে আছি, আমি ঈর্ষাব তাডনায় ভুগছি—আমি পাবি নি, আমি পাবি নি। ঈর্ষাব তাডনায় আমি একটু বেকাস হয়েছি।

বিজন বাংকে শুয়ে পডল। কোট প্যান্ট পবেই শুয়ে পডল। এ-মুহূর্তে সে আর কিছু ভাবতে প’বছে না। সে এলবির কাছে ধবা পড়ে গিযে বাংকে শুয়ে আজ যথার্থ জাহাজী কারদাষ বাত যাপন কবল।

সকালে জাহাজেব কিছু কাজ—দেঘালে বঙ কবা, দেঘাল সাবান-জলে পরিষ্কার কবা—সে সব কাজগুলো আজ নিখুঁতভাবে কবল। সে ইচ্ছা কবেই এলবিকে ভাবল না। সে ইচ্ছা কবেই কাঁচা শিস্তি কবল আজ। ভোরবেলায় দেবনাথ ওর পাশে স্নান হয়ে দাঁড়ালে, বলল, আমাকে ছোট কবে কি লাভ হল, দেবনাথ ?

দেবনাথ ওব দুটে হাত ধবে বলল, বিজন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। গত-রাতে আমাব বড ভুল হয়েছ। গতবাতে টাকার অভাবে আমাব বাতেব ইচ্ছাটুকু পূরণ হয় নি। বাধ্য হয়ে সস্তায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে নেশা কবেছি। মাতাল হয়ে জাহাজে কবেছি। কিরে তোমার বাংকে এলবিকে দেখেই ধৈর্য ধরতে পারি নি। আমি ওকে টেনে তুলেছিলুম। এলবি বিরক্ত হয়ে তাকাতেই তোমাকে ছশমন ব’লে ভেবেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কব, বিজন। ব’লে দেবনাথ যথার্থই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ওর পাশে দাঁড়াল।

বিকলে বিজন হাসপাতালে গেল। সেলিমের অন্ত্রোপচাব হয়ে গেছে। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। সেলিম কেব জাহাজের জাহাজী হয়ে একই সঙ্গে হয়ত ঘরে ফিরতে পারবে। এইসব ভাবনায় দেবনাথ এবং বিজন পথ চলাছিল। দেবনাথ বলল, এলবির কাছে তোর একবার যাওয়া উচিত।

—কোন মুখে যাব, বল ।

—আমার বড় তুল হয়ে গেল, বিজন ।

ওরা পরস্পর তাকাল । ওরা পরস্পর হাত ধরে হাসপাতালে উঠে গেল ।

সিঁড়ি ধরে নামবার সময় ডাবল, এলবি যদি আসে, এই হাসপাতালে এলবি যদি ওর জন্য অপেক্ষা করে, যদি বলে—বিজন, তুমি কি যথার্থই রবীন্দ্রনাথের নামে ‘পাখীসব করে রব’ শুনিয়েছ, তুমি কি যথার্থই কবিকে নিয়ে তামাসা করেছ—তখন, তখন সে কী উত্তর দেবে ! এইসব ভেবে বিজন, হাসপাতালে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল । এবং যখন দেখল সেলিমের বিছানার পাশে কেউ বসে নেই তখন সে এক অচেতুক আনন্দে কিঞ্চিৎ সান্ধনা পেল ।

সেলিমের শরীরে এখনও রক্ত দেওয়া হচ্ছে । সেলিম এমত দুর্বল যে, কথা বলতে পারছে না । ওরা ওর পাশে বসল এবং বৈচে থাকার জন্য উৎসাহিত করল ।

বন্দরে বিজন এলবিকে এড়িয়ে বাঁচতে চাইল । সামনে পড়লেই ধরা পড়বে অথবা কলিন ষ্ট্রীট ধরে হাঁটলেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা । সে সেজন্য জাহাজ থেকে কম নামল, বন্দর ধরে সহরে উঠল না এবং বড় বড় পথ ধরে পায়চারি করল না । সে শুধু বিকেলে হাসপাতালে গেল । এবং একদিন সেলিম বলল, সেলিম তখন ভালো হয়ে উঠছে, সেলিম তখন কথা বলতে পারছে—বলল, এলবি রোজ ভোরে আসেন ।

জাহাজে সারাদিন কাজের পর যখন ক্লান্ত হয়ে বিজন রেলিঙে এসে ভর করে দাঁড়াত তখন ওর মনে পড়ত নটিংহিলের সেই ছোট কাঠের ঘর, সেই ছোট অক্ষরে লেখা ‘শান্তির নীড়’, সেই ইজিচেয়ারটা এবং পাশের ভাঙা ঝেঁজলটার কথা । মনে পড়ত ওর কবিতা-আবৃত্তির কথা । এলবি ‘গীতাঞ্জলি’র সব কবিতাগুলিই যেন ওকে বার বার শুনিয়েছে । সে যেন এখন এই রেলিঙে দাঁড়িয়ে সব কবিতা-গুলিই ম্পষ্ট মনে করতে পারছে । ওর একান্ত ইচ্ছা—এলবি যদি আসত, যদি সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করত, যদি বলত, তুমি কবিতার মতো না বৈচে, জাহাজীর মতো বাঁচলে ! অথচ সে এল না । একদিন গেল, দু’দিন গেল, দু’সপ্তাহ গেল, অথচ সে এল না । পাইন-গাছগুলো তখন পাতা মেলতে শুরু করেছে । পাখীরা সব আবার কিরে এসেছে, গাছে গাছে তারা কোলাহল করছে । বসন্তের আগমনে এই ধরণী যেন উচ্ছল হুবার মতো অথবা গর্ভবতী তরুণীর মতো ব্যঙ্গী হতে চাইছে । অথচ এলবির আর দেখা নেই ।

কল্পে বত দিন বেতে থাকল তত বিজন এলবির কাছে নিজেকে অপরাধী

সাব্যস্ত করল। ততক্ষণে ভেঙে পড়ল। তত সে নিঃসঙ্গবোধে পীড়িত হতে থাকল। জাহাজ ছেড়ে দেবে দু'দিন পর। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। যে সেতুবন্ধটি গড়ে উঠেছিল সেলিমকে কেন্দ্র করে, সেলিম জাহাজে ফিরে এলে সেটুকুও শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোন এক ভোরে জাহাজে খবর এল—কাপ্তান হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা কবছেন—ডেক-এ ফের উদ্বেগ উত্তেজনা, সারেঙ ব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য জাহাজীরাও ব্রিজের নীচে অপেক্ষা করছে—ওদের চোখে পরস্পরের প্রতি সংশয়ের দৃষ্টি, তখন কাপ্তান বলছেন ব্রিজ থেকে—সেলিম ডেক—সেলিম মৃত।

বিকালে সব জাহাজীরা জাহাজ থেকে নেমে গেল। ঘন কুয়াশায় শীতের রঙ ক্যাকাশে। শীতের শেষে ওরা কোন তুষার-ঝড়ের মতো ভোরের রোদে ডুবে গেল, গলে গেল। ওরা হাসপাতালের দরজায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মৃত নাবিকের শরীর নিয়ে যাত্রার ইচ্ছায় উন্মূখ হয়ে থাকল। ওদের অবয়বের ইচ্ছা যেন এই—আমরা এই সন্ধ্যায় সকলে কববভূমিতে নেমে যাচ্ছি। আমরা নেমে যাচ্ছি, আমরা নেমে যাব। আমরা মরে যাচ্ছি, আমরা মরে যাব।

সহরবাসীরা নাবিকের শবযাত্রার পথে ভীড় করল। একদল বিদেশী লোক জাহাজী পোশাকে কোন নাবিকের মৃতদেহ নিয়ে সৈনিকের মতো পা ফেলে হাঁটছে। জানালায় যুবতী আঁর্শির আলোতে সেই শবযাত্রীদের দেখে মুখ ঘোরাল। কিছু স্বজাতীয় দেখল সেই শবাহুগমন—এলবি ককিনের বা পাশে পথ দেখিয়ে চলছে। মিঃ ট্রয় এবং কিছু জাহাজী শ্রমিক ককিনের আগে আগে চলছে। ভারতীয় নাবিকেরা পিছনে। বিজন সকলের পিছনে। ওরা নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করছে। ওরা সকলে সহর অতিক্রম করে ক্রমে পাহাড়ের উৎরাইয়ে নেমে গেল। ওরা সকলে আজ কোন কথা বলল না। কত নিঃসঙ্গ, কত নিঃশব্দ এই যাত্রা! ওরা পরস্পর অপরিচিতের মতো ব্যবহার করল যেন, অথবা এই শোকাবহ ঘটনার ওরা পরস্পর সামগ্রিক বেদনায় আত্মনিষ্ঠ। এলবি পর্বন্ত কোন কথা বলে বিজনকে কিংবা অন্যান্য জাহাজীদের সমবেদনা জানাল না। এলবি চোখ তুলে বিজনকে দেখল না। অথবা না-দেখার ইচ্ছায় সর্বদা ককিনের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। অথবা এলবির প্রত্যয় এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, সে বিজনকে ফের উৎসাহ দিয়ে বলতে পারল না, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে।

কববভূমির সদর দরজা দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকে গেল। বিজন ~~জাহাজীরা~~ সব-

বেদী দেখতে পেল। গীর্জাব মতো ছোট-বড় কবরের ~~পুঁজি~~ <sup>পুঁজি</sup> দেখতে পেল। অনেক সুখ-দুঃখের এপিটাক চোখে পড়ল। সেলিম ককিনে এখন শুয়ে আছে। সেলিমের স্ত্রী এখন হয়ত দবজায় বাস মেয়েটাকে আদব কবছে। অথবা মেয়েকে খসমেব খবব দিয়ে সুখ পাচ্ছে। সেলিমের কবর এখানেই হল। সে বিবিব কোলে মাথা বেখে মবতে পাবলনা। এইসব ভেবে বিজনেব অশেষ দুঃখ। ভবু একবার এলবিকে বলাব ইচ্ছা—কিছু বলাব ইচ্ছা—শোকাবহ ঘটনাব কথা বলে ববীজনাথকে স্ববণ কবাব ইচ্ছা—ওব সেই কবিতা-আবৃত্তিব ইচ্ছা—পিস্ ওয়াজ্জ অন্ হিজ কোব-হেড।

সেলিমের কবরের উপব প্রথম এলবিই মাটি দিল। সকলেব শেষে বিজন মাটি দিতে গিয়ে অসহায় মাহুমেব মতো বেঁদে উঠল। এই মাটিটুকু দিবে সে আজ কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ এমত ভাব প্রকাশ কবল। এলবি পাশে গিবে দাঁডাল। বিজন শেষ মাটিটুকু কববেব উপব চাপড়ে চাপড়ে দিচ্ছে এব° বাঁদছে। সে যেন এই মাটির স্পর্শ ছেড়ে উঠতে পাবছেন। উপবে আলো জ্বলছে। শীতেব কুবাশা আলোব ডুমটাকে অস্পষ্ট কবে বেখেছে। সকলে একে একে কবব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই যেন এই মৃত্যুতে দুঃসহ এক যাতনায় পবস্পব কথা বলতে পারছে না। পরস্পব সান্ধনা দিতে পাবছে না। সকলেই মাথা নীচু করে পাহাড়েব ঢাল ধবে চড়াইয়ে উঠে যাচ্ছে।

এলবি ডাকল, বিজন, ওঠো। সেলিমকে বহু চেষ্টায়ও বাঁচানো গেল না। মৃত্যুরই জয় হল। প্রভুকে ওব কথা বলে। ওব আত্মাব শান্তি কামনা কবো। এলবি বিজনকে টেনে তুলল। ওবা পবস্পব তাকাল। তাবপব হাত ধরে কববভুমি কেলে পাহাড়েব চড়াই ভেঙে সমুদ্রেব ধাবে এসে বসল। এলবিই বিজনকে এই অসীম সমুদ্রেব আঁধাবে বসতে অহুবোধ কবল।

অন্য তীব্রে সব বড বড সমুদ্রগামী জাহাজ। ওবা এপাবে নির্জন জারগায় বসে শোকটুকু তুলতে চাইল। এলবি বিজনকে এই মৃত্যুশোক তুলে যেতে অহুরোধ করল। এলবি ভিন্ন ভিন্ন বকমেব কথা বলে বিজনেব শেষ দুঃখটুকু মুছে দিতে চাইল—মুছে দেবাব ইচ্ছায় ওকে শেষ পৰ্বন্ত নটিংহিলেব ছোট কাঠের ঘরে নিয়ে এসে বলল, এ-ঘব তোমার। তুমি এখানে থেকে যাও। যেন আরও বলতে চাইল—তোমাব জাহাজী নিঃসঙ্গতাটুকু আমি, আমি—সব দিবে জরে তুলব।

বিজন মনে মনে ডাবল—মূলত আমি নটচরিত্রের মাহুয। কলত তুমি

আমার এ-ঘরে রেখে শান্তি পাবে না। বিশেষত কবির প্রতীকী হয়ে দীর্ঘদিন আমি বাঁচতে পারব না। আমার জাহাজী চরিত্র আমাকে সমুদ্রের মতো অশান্ত করে রেখেছে। বন্দরে বন্দরে চরিত্র নষ্ট করে বেড়াতে না পারলে আমার জাহাজী চরিত্রের শান্তি নেই।

বিজন বলল, আশা করেছিলাম তুমি একদিন অন্তত অভিযোগ করতেও জাহাজে আসবে।

এলবি বলল, ভোরে সেলিমকে দেখে, সারাদিন অকসেসে কাজ করে বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পার্কে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।

বস্তুত উভয়ে এক দুর্বিনীত অভিমানে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে অভিযোগ করতে পারে নি। এলবি জলপাই গাছের নীচে বসে যত আশাহত হয়েছে তত এক ক্ষুদ্র আক্রোশে ঘরে ফিরে মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় জানালায় প্রজাপতি গুনেছে। যখন একান্ত উত্তেজনায স্থির থাকতে পারেনি তখন রবীন্দ্রনাথের ছবির নীচে বসে একের পর এক কবিতা উচ্চারণ করে এক অশেষ আনন্দে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা ঈশ্বরের মতো ইচ্ছায় বিজনকে কবিতার মতো স্নেহ করে ভোলার প্রবৃত্তিতে এলবি প্রতিদিন ছটফট করত। রবীন্দ্রনাথের নামে ‘পাখীসব করে রব’ এবং জাহাজীদের রাতের আস্তানা উভয়ই নষ্টচরিত্রের লক্ষণ জেনেও সে থাকতে পারে নি। বিজনকে রমণীয় স্থতির অন্তরে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণায় সে গর্ভবতী হতে চাইল।

এলবি বলল, তিনমাস ধরে তোমাকে পেয়ে কোন নাচঘরে যেতে ভুলে গেছি। তুমি এমত আমার আপনায় করে রেখেছ।

এলবি যেন মনে মনে বিজনকে অহুরোধ জানাল, বিজন, তুমি যদি নষ্টচরিত্রের মাহুষ হতে চাও তবে আমারও নষ্টচরিত্রের করে রেখে যাও। আমি আর এমত ভাবে বাঁচতে পারছি না। দেয়ালে কবির ছবি, আমরা নীচে বসে এমত ভাবছি—আমরা পরস্পর প্রীতির সম্পর্কে বাঁচছি—তুমি আমার আরও ঘন হয়ে বসো, আমার এতদিনের ঘোঁন আদর্শকে ভেঙে দাও; তোমার হাতে আমি নষ্টচরিত্রের হয়ে বাঁচি। তোমার স্পর্শে কবির স্পর্শ এমত ভাব নিয়ে বাঁচি। এলবি ক্লেষ বলল, তুমি থেকে যাও, বিজন। বাকিটুকু বলতে পারল না। বাকিটুকু এলবির চোখে ধরা পড়ল—এ পৃথিবীতে বিজন ব্যতীত এলবি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ভুগবে। এ পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এক রূপকথার মতো যুবকের ঘন গভীর প্রীতির সম্পর্ক এলবিকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রাখবে।



বিজ্ঞান ইঞ্জি-চেয়ারে শুয়ে থাকল। সে কোন কথা বলল না। এলবি দাঁড়াল।  
 ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘন হয়ে দাঁড়াল এবং বিজ্ঞানের শীর্ণ ঠোটে ধীরে ধীরে  
 ছুয়ে চুমু খেল। বিজ্ঞান এই ঘটনায় এতটুকু উত্তেজিত হল না, বরং সে কেমন  
 ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হতে-হতে একসময় ইঞ্জি-চেয়ারের সঙ্গে ঘেন মিশে গেল। বস্তুত  
 বিজ্ঞান কবির প্রতীকীতে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মতো শিথিলতায় অথবা কবির  
 প্রতি ঠাণ্ডা ঈর্ষায় এই ঘন চুমুনে কোন ঘোঁন সংযোগের উত্তেজনা পেল না। বরং  
 সে এলবির প্রতি করুণাঘন হল। এলবি মাথায় হাত বুলিয়ে ঈশ্বরের মতো  
 বলল, আবাব যদি এ বন্দরে আসি, তোমার ঘরে আসব। জাহাজী মানুষের  
 মতো আসব। বস্তুত বিজ্ঞান নিজের সহজ সত্যায় এলবির ঘরে বাঁচবার ইচ্ছায়  
 উঠে দাঁড়াল।

বিজ্ঞান বলল, কাল ভোরে আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। তুমি ভোরে  
 যেও।

এলবি উত্তর দিতে পারল না। সে খাটে পড়ে বালিকানুলভ কান্নায় ভেঙে  
 পড়ল।

বিজ্ঞান বুঝল এ-সময় কোন কথা বলে এই আশাহত বিদেশিনীকে সাহায্য  
 দেওয়া যাবে না। সে সেজন্য অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে থাকল এবং ওকে  
 কাঁদতে দিল।

অনেকক্ষণ পর যখন বিজ্ঞান দেখছে এলবি আর কাঁদছে না, বিছানায় মুখ ঝুঁজে  
 পড়ে আছে, তখন ওর হাত ধরে টেনে তুলল এবং বলল, চল, জাহাজে তুমি  
 আমায় পৌঁছে দেবে।

মোটরে বসে বিজ্ঞান ভাবল—সেলিম এবং তুমি উভয়ে আমার আত্মার  
 আত্মীয়। দুজনকেই আমি এ বন্দরে ফেলে যাচ্ছি। হয়ত পৃথিবীর অন্য কোন  
 এক বন্দরে আমার জাহাজ ভিড়বে। সেখানে সেলিমের মতো কোন পাইনের  
 ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি তোমার জানালায় সেদিন আত্মার গভীরে যে অজ্ঞাত  
 দুঃখের স্পর্শ টুকু পাবে—সে আমারই। তখন তুমি জানালায় বসে এই সমুদ্রকে  
 দেখে কবির কবিতা আবৃত্তি কোরে। সে কবিতার ভিতর আমার, এইসব মৃত  
 নাবিকেরা ঈশ্বরকে খুঁজব।

বিজ্ঞান বলল, এলবি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো। এভাবে চুপচাপ মোটর  
 চালালে আমার খুব কষ্ট হয়।

এলবি কথা বলার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কবিতা আবৃত্তির সময় দেখল—এই

সহরের পথের সব আলোগুলো এখনও জেগে আছে। ইতস্তত দুটো-একটা মোটর ওদের অতিক্রম করে বের হয়ে যাচ্ছে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশের বুটের শব্দ—পুলিশ টহল দিচ্ছে। দোকানের শো-কেসে আলো জ্বলছে না। এলবি এই ঘন রাতে বিজনকে কোন কথাই বলতে পারল না—সে ভেঙে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে শেষ প্রিয় কবিতাটি সে আবৃত্তি করে বিজনকে বিদায় জানালো—

“Art thou abroad on this stormy night  
on thy journey of love, my friend ? The  
sky groans like one in despair.

I have no sleep to-night. Ever and  
again I open my door and look out on  
the darkness, my friend !

I can see nothing before me. I  
wonder where lies thy path !

By what dim shore of the ink-black  
river, by what far edge of the frowning  
forest, through what mazy depth of  
gloom art thou threading thy course  
to come to me, my friend ?”

## তিন

কাকাতিয়া দ্বীপ থেকে ফসফেট নিয়েছে জাহাজটা। জাহাজ আগামী দশদিন পাশাপাশি সব ওসানিক দ্বীপপুঞ্জ সকল অতিক্রম করে অনবরত জল ভাঙবে। দশদিন জাহাজীরা মাটি দেখতে পাবে না, তেরো মাস সফরে যেমন এক বন্দর থেকে অগ্র বন্দরে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল ভেঙে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, তেমনি এ-দশদিনও শুধু জলই দেখবে অথবা অসংখ্য নক্ষত্র এবং রাতের আঁধারে অগ্র জাহাজের আলো।

তখন বিকেলের ঘন রোদের রঙ জেটিতে, ফসফেট-কারখানার প্রার্থনা-হলের গম্বুজে এবং দূরে, দূরে নারকেল গাছের ছায়াঘন চত্বরে অথবা শ্রমিকদের ভাঙ্গা কুটিরে, আকাশ অথবা নীলের গভীরতায় মগ্ন। সমুদ্র জলের নীল অথবা সবুজ ঘন রঙের ছায়া সাহেবদের বাংলোগুলো উজ্জ্বল করে রেখেছে। কিছু কিছু শ্রমিক বিকেলের আনন্দ হিসাবে ছোট ছোট স্কীপ নিয়ে ঝড়শী নিয়ে সমুদ্রে ভেসে গেল। এবং তারা এই জাহাজের পাশ দিয়ে গেল, গলুইতে জাহাজীরা ভীড় করে আছে। যেখানে দ্বীপের পাথর সমুদ্রে বাতিঘরের মত, যেখানে ফার্ন জাতীয় গাছ সমুদ্রের হাওয়ায় নড়ছে, সেখানে দ্বীপের সব শিশুরা অথবা লাকাল, নাচল, গাইল। কখনও সমুদ্রের জলে নেমে স্নান করল অথবা সঁতার কাটল। এইসব দৃশ্যের ভিতর জাহাজটা ছাড়বে। গলুইতে জাহাজীরা ভীড় করে থাকল। মাটে চকিশ বস্তার ভিতর জাহাজ ছাড়ছে এমতভাবে কালো বর্ডার দেয়া নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রীজে ক্যাপ্তান, বড় মালোম। গ্যাঙওয়াতে কোয়ার্টার-মাস্টার এখনও পাহারা দিচ্ছে। সিঁড়ি এখনও জেটি থেকে তোলা হয়নি, জ্বলন্ত সকল কাজ শেষ। ডেক, বক্স সব জল ঘেরে সাক করা হয়েছে। হ্যাট, ড্রিপল এবং কার্টের সাহায্যে ডেক দেওয়া হয়েছে। তবু মজা মালোম সাপ্তাহকে ডেকে গলুইতে চলে আসেন না, কিংবা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরিয়ে বললেন না—হাসিল হাসিজ। বললেন

না, তোমরা জাহাজীরা এস, আমরা বন্দরের নোঙর তুলে সমুদ্রে পাল তুলি।

সমুদ্রের শাস্ত্র নিবিড়তার ভিতর বীপের পাহাড়, ঘর-বাড়ি, কারখানা এবং এইসব বীপের পুরুষ-রমণীরা সকলে যেন রাজকন্টার মত জেগে সারা রাত ধরে, মাস ধরে এমন কি বৎসর, যুগ যুগ ধরে কোন এক রাজপুত্রের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। সুপারী গাছ, নারকেল গাছ এবং উষ্ণদেশীয় সকল শ্রেণীর গাছ বীপে দৃশ্যমান। সুমিত্র, জাহাজী সুমিত্র, সেজন্য বিকেলে প্রতি পথে ঘুরতে ঘুরতে কখনও এ অরণ্য-অঞ্চলে ঢুকে কাগজী লেবু সংগ্রহ কবত। দু পা এগিয়ে গেলে ওপাশে সমুদ্র, ধাবে ধারে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। সুমিত্র প্রায়ই বালিয়াড়িতে চূপ হয়ে, বালুচরের সঙ্গে ঘন হয়ে এই বীপের নিবিড়তায় মগ্ন থাকত। যেন সে দীর্ঘদিন পব নিজের দেশের মত দৃশ্যমান বস্তুসকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

প্রশ্নে দৈর্ঘ্যে তিন গুণিত চার মাইল পরিমিত স্থানটুকু জুড়ে এই বীপ। কিছু সমতল ভূমি, কিছু পাহাড়শ্রেণী। বীপেব দক্ষিণ অঞ্চলে সাহেবদের বাংলোসকল, পার্ক, বিতালয় এবং ক্লাব-ঘর। পশ্চিমটুকু জুড়ে শ্রমিকদের নিবাস। পাহাড়েব উপর যেখানে কৃত্রিম উইলোগাছের সংবক্ষিত অঞ্চল আছে, যেখানে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এবং বীপসকলের প্রধান কর্তার অবস্থিতি—তার ঠিক নীচে সুপের জলের হ্রদ। পাথুরে সিঁড়ি নীচে বালিয়াড়িতে গিয়ে নেমেছে। ছোট নীল হ্রদ অতিক্রম করার স্পৃহাতে সুমিত্র কোনদিন সিঁড়ির নীচে বসে থাকত। এই উচ্চতায় সমুদ্রের বৃকে মার্বেল পাথরের স্থাপত্যশিল্প সুমিত্রকে রূপকথার গল্প শ্রবণ করিয়ে দিত। সেখানে একদা সুমিত্র এক যুবতীকে আবিষ্কার করল। যুবতী উইলোগাছের ছায়ায় হ্রদের তীরে বসে ভায়োলিন বাজাত।

সুমিত্র জাহাজ-রেলিঙে ভর করে গতকালের কিছু কিছু ঘটনার কথা শ্রবণ কবতে পারছে। সে দীর্ঘ সময় সিঁড়িতে বসেছিল এই ভেবে—যুবতী হয়তো এই পথ ধরে অপরাহ্ন বেলায় অন্য অনেকের মত সমুদ্রে নেমে আসবে। যুবতীর প্রিয়মুখ দর্শনে সে প্রীত হবে। কিন্তু দীর্ঘ উঁচু পাহাড়শ্রেণীর কাঁক দিয়ে যুবতীর মুখ স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং অন্য অনেকদিনের মত ভায়োলিনের সুরে মুগ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না। প্রতিদিনের প্রতীক্ষা তার কখনও সফল হল না। এবং সেই সর্বস্বমিষিক্ত এলাকায় যেতে পারত না বলে সমুদ্রে যুবতীর প্রতিবিম্ব দেখে গল্পের ডালিমকুমার হয়ে বাঁচবার স্পৃহা জন্মাত। আহা, আমি ওর চোখে স্পষ্ট হলুম না গো! যখন জাহাজীরা শ্রমিকদের বস্তিতে পুরানো কাপড়ের বিনিন্ময়ে যৌন-সংযোগটুকু 'রক্ষা' করত, তখন সুমিত্র পাথরের আড়ালে বসে উদাস

হাবাৰ ভঙ্গীতে আকাশ দেখত।

স্বপ্ন এখন সমুদ্ৰে ডুবছে। নীল সমুদ্ৰেৰ লাল বঙ এখন পাহাড় এবং পাহাড়শ্ৰেণীৰ উপত্যকা সকলকে স্নিগ্ধ কৰছে। ছোট ছোট স্কীপগুলো ধৰে কিয়ছে। ক্লাব-ঘৰে ব্যাঙ বাজছে। জেটিতে অনেক মানুহেৰ ভীড। স্নন্দবী বমণীয়া, আব পাহাডেৰ সব বাসিন্দাৰা যুবতীকে জাহাজে তুলে দিল। সকল জাহাজীবা গলুইতে ভীড কৰে থাকল। সেই যুবতী, চঞ্চল দুটো চোখে, গ্যাঙয়ে ধৰে উঠে আসছে। সন্ধ্যাব গাট লাল বঙ যুবতীকে স্নমিত্ৰেৰ চোখে রহস্যময়ী কৰে তুলছে।

এবাব সব ডেক-জাহাজীবা দুভাগ হয়ে আগিল পিছিল চলে গেল। উইনুচ হাডিয়া হাপিজ কবল হাসিল। ড্যাবিক নামানো হল। যুবতীৰ বাপকে দেখা গেল কাপ্তানের ঘৰে। কিছু কিছু জেটিব লোক ডেকে উঠে এসেছিল। ওবা সিঁড়ি তোলাব আগে নেমে গেল। যুবতীৰ বাবা নেমে গেলেন। তাবপব জাহাজ ধীবে ধীৰে তীব থেকে সবতে থাকল। ক্লমাল উডল অনেক জেটিতে, যুবতী কেবিনে কিবে যাওঘাব আগে সন্ধ্যাব গাট বঙেব গভীৰতায ওই দ্বীপেব ছবি দেখতে দেখতে কেমন ভয় হয় গেল। এই তাব দেশ, এত স্নন্দব এবং বমণীয়।

কেবিনে ঢুকে যুবতী টুপাতি চেবী দেখল কাপ্তান-বয় সব কিছু সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। চেবী আয়নাৰ মুখ দেখল, তাবপব লকাব খুলে হাতেব পোশাক পবে বোট-ডেকে উঠে যাবাৰ জন্য দৰজা অতিক্রম কৰতেই মনে হল জাহাজটা তুলছে এবং মাথাটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। চেবী আব উপবে উঠল না। সে দৰজা ঠেলে ভিতৰে ঢুকে গেল। নবম সাদা বিছানায় শৰীৰটা এলিয়ে দিগ্নে পোর্টহোলেব কাঁচ খুলে দিল। চেরী এখন সমুদ্ৰ এবং আকাশ দেখছে।

দরজায় খুব ধীবে ধীবে কড়া-নাডাৰ শব্দে চেবী প্রসন্ন কবল, কে ?

—আমি কাপ্তান-বয়।

—এস।

—আপনাৰ খাবাৰ—বলে সযত্নে টেবিল সাজাল।

চেবী বলল, এক পেয়লা দুধ, দুটো আপেল।

—আব কিছু ?

—না।

—আপনাৰ কষ্ট হচ্ছে খাদ্য ?

—না।

—উপরে উঠবেন না? বেশ জ্যোৎস্না রাত। বোট-ডেকে আপনার জন্য আসন, ঠিক করা আছে।

—না, উপরে উঠব না। বয় চলে যাচ্ছিল, চেরী ডেকে বলল, শোন!

কাপ্তান বয় কাছে এলো। বলল, তুমি কাপ্তানকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

—জী, আচ্ছা। কাপ্তান-বয় দরজা টেনে চলে গেল।

তখন ফোকসালে ফোকসালে সকল জাহাজীরা চেরীকে কেন্দ্র করে মশগুল হচ্ছিল। সকলে ওর চোখমুখ দর্শনে সজীব। এবং চেরী যেন এই নিষ্ঠুর জাহাজে সকল জাহাজীদের নিঃসঙ্গ মনে সমুদ্রযাত্রাকে সুখী ঘরগীর ঘরকন্নার মতো করে রাখছে। আর এমন সময় ডেক-সারেঙ এলেন, এন্‌জিন-সারেঙ এলেন। তাঁরা দরজায় দরজায় উঁকি দিয়ে বললেন, তোমরা উপরে যাও, বোট-ডেকে মাস্তার দাঁও।

জাহাজীরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল সকলে। ওরা বোট-ডেকে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। ডেক-সারেঙ ওদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা, বাপুঁরা, ওঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাবে না। কাপ্তানের বারণ আছে। জেনানা! মাহুদ, কাঁচা বয়েস—তার উপর আবার শুনছি রাজার মেয়ে এবং তিনি নাকি আমাদের কোম্পানীর একজন কর্তাব্যক্তি।

সুমিত্র হাসল। কী যে বলেন চাচা! উনি তো কাকাতিয়া দ্বীপের প্রেসিডেন্টের মেয়ে।

সারেঙ বললেন, ওই হল। যে রাজা, সে-ই প্রেসিডেন্ট।

এখন রাতের প্রথম প্রহর। অল্প জ্যোৎস্না সমুদ্রে এবং জাহাজ-ডেকে। জাহাজীরা গরম বলে সকলে ফোকসালে গিয়ে বসল না। ওরা কন্ডার ওপর বসে ভিন্ন রকমের সব কথাবার্তা বলল। দু-একজন জাহাজী অভদ্র রকমের ইঙ্গিত করতেও ছাড়ছে না। এ ধরণের কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত বলে সুমিত্র রাগ করল না। বরং হাসল। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা সুমিত্রকে বিরক্ত করছে।

সুমিত্র ভাবল—সেই মেয়ে—হুদের তীরে বসে বেহালা বাজাত, পাথরের আড়ালে বসে হুদে প্রতিবিম্ব দেখে যার রহস্য আবিষ্কারে সে অন্ত থাকত, যার প্রতিবিম্ব সমুদ্রের কোন রাজপুত্রের ইচ্ছাকে সক্রমণ করে রাখত, অথবা সেই প্রাসাদের ছায়া, ঘন বন, সমুদ্রের পাঁচিল এবং উঁচু পাথরের সব দৃশ্য সুমিত্রকে ঠাকুমার গল্প মনে পড়িয়ে দিত...বেন রাজপুত্র বোড়ায় চড়ে যাচ্ছে...যাচ্ছে...তু

পাতালপুরীতে ভোজ্যদ্রব্য, যেন প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কোন জন-মনিষির গন্ধ নেই, ফুলেরা, গাছেরা, পাখীরা এবং পতঙ্গসকল পাথর হয়ে আছে। হ্রদের তীরে খুব নীচু উপত্যকা থেকে স্মিত্র যতদিন চেরীকে দেখেছে, ততদিন পাতালপুরীর দৃশ্যসকল কাকাতিয়া দ্বীপের সকল দৃশ্যমান বস্তুসকলের উপর এক ক্লান্ত ইচ্ছার ঘর তৈরি করে চলে গেছে।

এখন জাহাজীরা সকলে বাংকে শুয়ে পড়েছে। স্মিত্রও দরজা বন্ধ করে কঞ্চল টেনে শুয়ে পড়ল। স্মিত্র এই বাংকে শুয়ে পর্যন্ত চেরীর কথা ভাবছে—চেরী হয়ত শুয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ধরে গ্যাঙওয়ায়েত যখন উঠে আসছিল চেরী, স্মিত্র তাকে স্পষ্টভাবে দেখেছিল। বড় বড় চোখ মেয়েটির—বাদামী রঙ শরীরে, চোখের রঙ ঘন গভীর এবং সমস্ত শরীরে প্রজাপতির মতন হাল্কা গডন যেন ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার ঘর সবটুকু খড় দিয়ে তৈরি কবেছেন।

জাহাজ এখন সমুদ্রে। তীব্র দেখা যাচ্ছে না, কোন দ্বীপ অথবা প্রবালবলয়। ভোরের সূর্য উঠেছে সমুদ্রে। সমুদ্রটাকে দু-ফাঁক করে সহসা যেন সূর্যটা আকাশে উঠে গেল। ডেক-জাহাজীরা এ সময় জাহাজে জল মারছে। এবং অন্য অনেক জাহাজী ইতস্তত রঙের টব নিয়ে মাস্টে, ড্যারিকে রঙ দেবার জন্য ফড়ায় ফড়ায় হাঁটছে। স্মিত্র ভোরে উঠে ওয়াচে যাবাব আগে গ্যাঙওয়ায়েত চোখ তুলে দিল। চেরী সেখানে নেই। বোট-ডেক খালি। ব্রীজে ছোট মালোম দূরবীন চোখে লাগিয়ে দূরের আকাশ দেখেছে।

স্মিত্র এন্জিন-রুমে নেমে যাবার আগে দুখানা ভাঙা চাঁদের মতো কুটি খেল, জল খেল। চাঁ খেল। অন্যান্য অনেক জাহাজীর মতো প্রশ্ন করে জানতে চাইল, গত রাতে চেরী কেবিনে শুয়ে সারারাত ঘুমিয়েছিল, না, গরমে কেবিনের দরজা খুলে গভীর রাতে ডেকে বসে সমুদ্র এবং আকাশের নিরাময় ভাবটুকু লক্ষ্য করে শরীর নিরাময় করছিল।

স্মিত্র এন্জিন-রুমে নেমে যাওয়ার সময় দেখল ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস চুরি করে টুপাতি চেবীর পোর্টহোলে উঁকি দিচ্ছে। স্মিত্রেরও এমন একটা ইচ্ছা যে না হচ্ছে, তা নয়। তারও না-দেখি না-দেখি করে পোর্টহোলের কাঁচ অভিক্রম কবে চেরীর অবয়ব দর্শনে খুশী হবার ইচ্ছা। কিন্তু পোর্টহোলের মুখোমুখি হতে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল। সে চোখ তুলে ভাবতে পারছে না। সে ভাড়াভাড়ি সিঁড়ি ধরে এন্জিন-রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে ডেল মেপে এন্জিনের পিস্টনগুলোতে এবং অন্যান্য অনেক যন্ত্রস্থানে ডেল ঢালতে থাকল।

ওয়াচ শেষে যখন উপরে উঠবে তখন নিশ্চয়ই চেরী কেবিনে পড়ে থাকবে না, সমুদ্র এবং আকাশ দেখার জন্য নিশ্চয়ই বোট-ডেকে উঠে পায়চারী করবে—সে এমন চিন্তাও করল।

ওয়াচ শেষে অন্য পরীদারদের ডেকে দিল স্মিত্র। এন্‌জিন-রুম থেকে সোজা না উঠে, স্টোকহোলড দিয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল, প্রত্যাশা—চেরী এখন ব্রীজের ছায়ায় বোট-ডেকে হয়তো বসে আছে। সে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে এই ইচ্ছায় যথার্থই বোট-ডেকে উঠে গেল। যখন দেখল ব্রীজের ছায়ায় চেরী অথবা ওর প্রতিবিম্ব কেউ বসে নেই, তখন স্মিত্র কেমন বিচিত্র এক অপমানবোধে পীড়িত হতে থাকল।

স্মিত্র স্নান করার সময় ভাগুরীকে বলল, মাছুষের কত রকমের যে শখ আগে চাচা!

—বাতিজার হ্যান মনের দশা ক্যান?

—এই কিছু না। স্মিত্র মনে করতে পারল, এন্‌জিন-রুমে সে যতক্ষণ ছিল, সব সময়টা উপরে ওঠার জন্য মনটা ছটফট করেছে। যেন চেরীর সঙ্গে কি এক আত্মীয় সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। সে মনে মনে এই বোধের জন্য না হেসে পারল না।

এ-ছাড়া স্মিত্র পর পর দুদিনের জন্ত একবারও চেরীকে বোট-ডেকে অথবা গ্যাঙওয়েতে এমন কি ডাইনিং-হলেও দেখল না। যুবতী এই জাহাজে উঠেই নিজে লুকিয়ে ফেলল। দশদিনের সমুদ্র-যাত্রা। দুদিনের নিঃসঙ্গতাকে এই অদৃশ্য যুবতী তীব্র তীক্ষ্ণ করে তুলছে—সকল জাহাজীরাই মনে মনে এমন ভাবছে। এ-দুদিন চেরী জাহাজ-ডেকে একবারও বের হল না। স্মিত্রাং স্মিত্র যতবার এন্‌জিন-রুমে নেমেছে, ততবার চেরীর কেবিনের পাশে এসে একবার থেমেছে। সে পোর্টহোলে কাঁচ অতিক্রম করে চেরীর কেবিন প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করত। কিন্তু পোর্টহোলের ঘন কাঁচের ভিতর দিয়ে চেরীর কেবিন সব সময় অম্পট থাকছে। কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মেস-রুম-মেট অথবা মেস-রুম-বয় এদিকে আসছে না। বুড়ো কাপ্তান-বয় চেরীকে দেখাশোনা করেছে। অক্সিসাররা পর্বস্ত জাহাজে চুপ ঘেরে গেছেন। যত জাহাজটা চলছে তত যেন নাবিকরা সব বিমিমে পড়ছে। চেরী দরজা খুলল না, ডেকে বের হল না, পায়চারি করল না। অক্সিসারসকল প্রতিদিন ডেক-চেয়ারে সাজগোজ করে বসে থাকলেন, অবসর সময় একটু আলাপ অথবা উদ্বিগ্ন হবার ভঙ্গীতে কৃত্রিম ইচ্ছা প্রকাশের জন্ত। কখনও কখনও ছোট মালোম দরজা পর্বস্ত হেঁটে আসতেন। তারপর সমুদ্রের



নির্জনতা ভোগ করে একসময় কেবিনে ঢুকে সস্তা সব ক্যালেন্ডারের ছবি দেখে  
ভয়ানক অগ্নীল আবেগে ভুগতেন।

সমুদ্রে নীল নোনা জল, আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। খুব গরম পড়েছে  
—উষ্ণমণ্ডলের এই আবহাওয়া জাহাজীদের কোকসালে বসতে দিচ্ছে না, ওরা  
শুতে পারছে না গরমে। ওরা উপরে উঠে কক্ষাতে মাদুর বিছিয়ে সেজন্ত অধিক  
বাত পৰ্যন্ত তাস খেলছে। কেউ জাল বুনছে মাস্টের আলোতে। জাহাজটা  
চলছে, জ্যোৎস্না রাত। সমুদ্রে অকিঞ্চিংকর তরঙ্গ এবং সহসা সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা  
শাওয়া উঠে এসে জাহাজীদের স্মৃতি দিচ্ছে। এবং সহসা প্রপেলারটা অনবরত  
ঝিঁঝিঁ পোকাকর কল্পণ আর্তনাদের মত যেন কাঁদছে। একটা বিশেষ নিশ্চয়  
গতিতে জাহাজটা চলছে, দৃশ্যমান বস্তু বলতে এই নক্ষত্রের আকাশ এবং সমুদ্র।  
গরমে কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করছেন। দুটো একটা আলো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রে।  
দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এখন হয়তো গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছে।

স্মৃতি জাহাজীদের বলল, আচ্ছ। ব্যাপার তো! দুদিনের ভেতর একবার  
মুভতীকে ডেকে দেখা গেল না! এ যে দেখছি চাচার তোমাদের বিবিদের হার  
মানাচ্ছে!

ডেকের বড় ট্যাণ্ডল বলল, তোমাদের ভয়েই বার হচ্ছে না।

—আমরা খেয়ে ফেলব নাকি!

—বড় বাকি রাখবে না।

স্মৃতি দেখল তখন বুড়ো কাপ্তান-বয় এদিকেই আসছে। সে এসে ওদের  
পাশেই তাস খেলা দেখতে বসে গেল।

স্মৃতি বলল, রাজকন্টার খবর কি চাচা?

—আর বলবেন না দাদা। রাজকন্টারকে দেওয়ানীতে ধরছে। রাত থেকে  
মাথা তুলতেই পারছে না। শুধু বিছানায় পড়ে থাকছে।

—রাজকন্যা কিছু বলছে না তোমাকে?

—আমি বুড়োমানুষ, আমাকে কি বলবে দাদা!

অন্য জাহাজী প্রশ্ন করল—মাথা একেবারেই তুলতে পারছে না?

কাপ্তান-বয় বলল, পারছে। বিকেলে দেখেছি কেবিনেই পায়চারি করছে।  
মনে হয়, কালতক ডেকে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

জাহাজটা তখন তেমন চলছে না। ওরা কক্ষার উপর বসে গল্প করছে।  
জ্যোৎস্নার আলোতে ওদের মুখ বিষন্ন দেখাচ্ছে। গ্যালাতীতে মাংস সিদ্ধ করছে

ভাঙারী। উইগ্‌স্‌হোল ধরে নীচ থেকে জাহাজীদের কথা ভেসে আসছে। এবং সেখানেও চেরী-সংক্রান্ত কথাবার্তাতে ওরা নিজেদের কঠিন মেহনতের দুঃখকে ভুলতে চাইছে।

সুমিত্র সকল জাহাজীদের খবরটা দিল—কাল টুপাতি চেরী ডেকে বের হবে। পরদিন আটটা-বারোটার ওয়াচে সুমিত্র এন্‌জিন-রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে নিল। ক্যানে ভর্তি তেল সে এন্‌জিনের সবত্র ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে। একটু ভুয়ে মেসিনের ভিতর খুঁকে পড়ল। তারপর ক্যানের তেল উঠাল, নামাল এবং সে ঘুরে ঘুরে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে...সে ক্যান উঠাল, নামাল। অন্য কোন দিকে তাকাতে পারছে না। সে যেন বুঝতে পারছে উপর থেকে সিঁড়ি ধরে কারা নামছে। সে চিফ-এন্‌জিনিয়ার এবং কাপ্তানের গলা শুনতে পাচ্ছে। সুতরাং এসময়ে কোন অন্যমনস্কতা রাখতে নেই। এ-সময়ে সে শ্বেলয়ালা সুমিত্র। তাকে ক্রমশ উপরে উঠতে হবে। তাকে ছোট ট্যাঙল থেকে বড় ট্যাঙল হতে হবে। বড় মিস্ত্রীর চোখে যেন কোন অন্যমনস্কতা ধরা না পড়ে এবং সে যেন জীবনের ঋণ অনাদায়ে পরিশ্রমী তেলয়ালা সুমিত্র। সুতরাং সে ভীষণভাবে রড ধরে মেশিনের ভিতর খুঁকে কাজ করতে থাকল। ধামের মতো সব মোটা পিস্টন রডগুলো উঠছে নামছে, ক্রাঙ্কওয়েভগুলো ঘুরছে অনবরত এবং এইসব ভয়ানক শব্দে উপরের কঠসকল ঢেকে যাচ্ছে। তবু সে এ-সময় কোন রমণীর কঠ শুনতে পেল এবং চোখ না তুলেই বুঝল বড় মিস্ত্রী আর কাপ্তান চেরীকে নিয়ে এন্‌জিন-রুমে নেমে আসছে। সিলিগুরের পাশে দাঁড়িয়ে রেসিথ্রেকেটিং এন্‌জিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বড় মিস্ত্রী বিস্তারিত বলছেন।

সুমিত্র যেখানে কাজ করছে, সেটা এন্‌জিনের তৃতীয় স্তর। দ্বিতীয় স্তরে চেরী এবং কাপ্তান। চেরী এন্‌জিনটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। সুতরাং অনিচ্ছাসম্বন্ধে সুমিত্র একবার চেরীকে গোপনীয় ভাবে দেখে ফেলল। চেরী সিলিগুর পরিদর্শন করে সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নামছে। ওরা সুমিত্রের পাশ দিয়ে যথাক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছে। সুমিত্র নিজের পোশাকের দিকে তাকাল—নীল কোর্টা ওকে মোল্লা মোলভী বানিয়ে রেখেছে। চেরী নীচে নেমে যাচ্ছে। মেশিনের হাওয়ায় ওর চুলগুলো উড়ছে। গায়ে সাদা সিল্কের ব্রককোট। পরনে নেভি ব্লু স্কাট। সুমিত্র নিজেকে আড়াল দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড় মিস্ত্রী এবং কাপ্তান চেরীকে এন্‌জিনের মতো দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে সুমিত্রের দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে—এরা ইণ্ডিয়ান। কোম্পানী ওদের কলকাতা অথবা বোম্বাই বন্দর থেকে তুলে

নেয়। খুব কম পরসায় ওরা বেশি কাজ দেয়।

বড় মিস্ত্রী অনেকটা পাত্রীসুলভ ভঙ্গীতে বললেন, বেচার! !

সুমিত্র লজ্জায় মেশিনের ভিত্তব আরও ঝুঁকে পড়ল। চেরী ওর মুখ না দেখে  
এমত ইচ্ছা এখন সুমিত্রের।

সুমিত্রের এখন যেন কত কাজ। সে ঘুরে ঘুরে এন্জিনের সকল স্থানে তেল  
দিল। চেরী হেঁটে যাচ্ছে, চেবী ফিরেও তাকাচ্ছে না, চেরী পোর্ট-সাইডের  
বয়লার ককেব সামনে দাঁড়াল। বড় মিস্ত্রী বলল, এটা কনডেনসার। সাকু'লোটিং  
পাম্পের সাহায্যে ফেব বয়লাবে চলে যায়। ফের চেরী এবং বড় মিস্ত্রী ওর পাশ  
দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা গল্প করছে। সে তাকাল না। লজ্জায় সংকোচে সে  
টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু চেরীব চোপতুটো বড় গভীর এবং ঘন।  
সুমিত্র টানেলের মুখে এসে প্রপেলাব শ্রাফ্টের একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক  
দিয়ে চেরীকে আডাল থেকে দেখতে থাকল। চেরী ওকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর  
শরীরের বাদামী রঙ, হাক্ক পোশাক—প্রজাপতিব মতো যেন এন্জিনে ও'উডে  
বেডাচ্ছে।

চেরী ইভাপারেটোরের পাশ দিয়ে যেতেই সেই গোপনীয় চোখ দুটোকে  
আবিষ্কার করে ফেলল। চেরী দেখল দুটো ভাগর চোখ ( ঠিক যেন ঠাকুমার গল্পের  
রাজপুত্রের মতো ) রাফসের দেশে চেরীকে দেখে দুঃখিত হচ্ছে। এই সব ভেবে  
একটু অগ্রমনস্কতায় ভুগে যখন আবাব চোখ তুলল চেরী, তখন দেখতে পেল  
চোখ দুটো সেখানে নেই, অন্যত্র কোথাও সবে গেছে।

ভয়ে সুমিত্র এক পাশে সরে দাঁড়াল। সে তেল দিল ইতস্তত এবং কাপ্তানকে  
টুপাতি নালিশ দিলেও যেন বলতে পারে, না মাস্টার, আমি শুধু এন্জিনেই তেল  
দিচ্ছি। টুপাতি এসময় সামনে এসে দাঁড়াল। লজ্জায়, সংকোচে সুমিত্র চোখ  
তুলতে পারছে না। সে পেটের সঙ্গে অথবা এই সব যন্ত্রের সঙ্গে যেন মিশে  
যাচ্ছে। চেরী এখন সুমিত্রের ফোকডানো চুল, শরীরের বাদামী রঙটা দেখছে ;  
ঘাড়ের নরম মাংসগুলো দেখল। তারপর সিঁড়ি ধরে স্টিয়ারিং-এন্জিনে তেল  
দিতে যাবার সময় সুমিত্র গুনল টুপাতি যেন ওর সন্ধ্যা কি বলছে।

সুমিত্র ফোকসালে এসে কাপড় ছাড়ল—কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলল না।  
উপরে উঠে স্নান করল, কোন কথা বলল না। খেতে বসে চুপচাপ খেয়ে উঠল।  
অন্য তেলয়লা বলল, কি হয়েছে রে ? মুখটা খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

সুমিত্র উত্তর করল না।

অনেকে এমত প্রাপ্ত করলেও সুমিত্র জবাব দিচ্ছে না। সে বাংকে বসে অযথা সিগারেট খেল, অযথা কতকগুলি ইংরাজী পত্রিকার সম্ভা অঙ্গীল ছবি দেখল এবং কোন দুঃসহ ভয়ে সে ধীরে ধীরে নিশ্বেজ হয়ে পড়ল। এন্জিনের ভিতর থেকে সেই চোখ ছুটী যেন এখনও ওকে তাড়া করছে। বার বার মনে হচ্ছে চেরীর প্রতি চোপের এই স্পর্শকাতরতা সুখকর নয়। পোর্টহোলে সুমিত্রকে উকি দিতে দেখেছে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে চেরী। কাপ্তানকে নালিশ দিয়েছে হয়ত।

আর বিকাল বেলাতেই বৃড়ো কাপ্তান-বয় এল পিছিলে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। সুমিত্র বাংকে শুয়ে ছিল, ঘুম আসছে না। সেই চোখ কেবল ওকে অনুসরণ করছে। কাপ্তান-বয় সারেঙের ঘরে উকি দিয়ে বলল, সারেঙসাব, বাড়িয়ালার ঘরে সুমিত্রের ডাক পড়েছে।

সুমিত্র শুনল, কাপ্তান-বয় এইসব কথা বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে শুনল, সারেঙ সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছে এবং ওর ঘরের ভিতরও সেই শব্দ। সুমিত্র ভয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল।

সারেঙ ডাকল, এই সুমিত্র ওঠ। বাড়িয়াল। তাকে ডাকছে।

সুমিত্র উঠে বসল, আমাকে যেতে হবে সারেঙসাব ?

—কি করি বল ? বাড়িয়াল। যে যেতেই বলল।

—আমি কিছুই করিনি সারেঙসাব। সুমিত্র অপরাধবোধে পীড়িত হতে থাকল। বার বার নামতে উঠতে পোর্টহোলে সহসা কখন ও চোখ রেখেছে এবং এক তীব্র কৌতুহল ওকে বার বার এই বৃত্তিতে প্রলুব্ধ করেছে।

সুমিত্র লকার খুলে সাদা জিনের প্যান্ট পরল, জ্যাকেট গায়ে দিল, তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে সারেঙসাবকে বলল, চলুন ! সে সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় দৃঢ় হবার চেষ্টা করল। কেউ প্রাপ্ত করলে না। কারণ, বাড়িয়াল। একমাত্র জাহাজীদের অপরাধের জন্য তাঁর ঘরে অথবা ডাইনিং-হলে ডেকে থাকেন। সুতরাং সকল জাহাজীরা সুমিত্রকে দেখল সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে। সুমিত্র যেন ওর অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন, সে সেজন্য চোখ তুলল না। সে এখন অন্য কোন জাহাজীকেই দেখছে না। জাহাজটা যে চলছে এ-বোধও এখন সুমিত্রের নেই। উষ্ণমণ্ডলের গরম কমে যাচ্ছে, বিকেল হতেই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ডেকে, সুমিত্র ডেক ধরে ষাবার সময় তাও অনুভব করতে পারল না। সে সারেঙের সঙ্গে বোট-ডেক পার হয়ে ব্রীজে উঠে ষাবার সিঁড়ি ধরে কাপ্তানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ওরা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। বুড়ো কাপ্তানের সংক্ষিপ্ত ছোট ছোট শব্দ। সারেঙ ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছে এবং কোন রকমে গলা সাক করতেই কাপ্তান দরজা খুলে বের হলেন। তিনি ওদের দেখে বললেন, সারেঙ তুমি কেন? তোমাকে তো ডাকিনি!

—হজুর, কাপ্তান-বয় যে বলল—

—আরে না না, স্মিত্র হলোই চলবে। আমাদের সম্মানীয় যে যাত্রীটি যাচ্ছেন, তিনি একবার ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এতক্ষণ স্মিত্র শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বাড়িয়ারার এইসব কথায় সে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, মাস্টার, আমি যাব?

—তুমি একবার পাঁচ নম্বর কেবিনে যাবে। যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন যেতেই হবে।

স্মিত্র ইচ্ছা করলে বোট-ডেক অতিক্রম করে টুইন-ডেকে নেমে অফিসার গ্যালী ডাইনে ফেলে পাঁচ নম্বর কেবিনের দরজায় হাজির হতে পারে, অথবা একোমোডেসান ল্যাডারেরই একটা অংশ ডাইনিং হলে নেমে গেছে—সেই সিঁড়ি ধরে নামলেও চেরীর দরজা। একটু ঘোরা পথ অথবা খুব কাছের পথ—কোনটা ধরে যাবে ভাবছিল, ভাবছিল চেরীর সহসা এই ইচ্ছা কেন? পাথরের আড়াল থেকে চেরী ওকে নিশ্চয়ই দেখেনি, কারণ সেখানে স্মিত্রের অবয়ব স্পষ্ট ছিল না। সে অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিল। সে সিঁড়ি ধরে টুইন-ডেকে নেমে দেখল কমলা রঙের রোদ ডেকে, কিছু নীল তরঙ্গ জাহাজের চার পাশটায়। পিছিলে জাহাজীরা অনেকে নামাজ পড়ছে। সে নেমে আসার সময় তাদেরও দেখল।

ডেক-কসপ বলল, কি রে স্মিত্র এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? কাপ্তান তোকে কিছু বলেছে?

স্মিত্র কোন উত্তর না করে অ্যালওয়ারেতে ঢুকে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়তে থাকল।

ভিতর থেকে কাপ্তান-বয় বলল, কে?

—আমি চাচা, স্মিত্র।

—ভিতরে এস। ভিতরে এস।

সে পা টিপে টিপে কেবিনে ঢুকল। সে দেখল, কাপ্তান-বয় লকার টিপয় এবং অন্য সব বাংকের বিহান্না বেড়ে দিচ্ছে। চেরীর বাদামী রঙের ষাড় আঙুরবনের

মতো রঙ ধরছে। চেরী ঘাড় গোঁজ করে বাস্তবের ভিতর কি যেন খুঁজছে।

কাশ্তান-বয় বলল, স্মিত্র এসেছে মাদাম।

স্মিত্র দেখল সেই আঙুরকলের মতো ঘাড় খুব সন্তর্পণে যেন নড়ছে। যেন বেশি চঞ্চল হতে নেই, উচ্ছল হতে নেই। সে দেখল স্মিত্রকে ঘাড় ঘুরিয়ে এবং ষত ধীরে ঘাড় ঘুরিয়েছিল তার চেয়েও ধীরে ঘাড় ফেরাল।—ওকে বসতে বলো।

স্মিত্র পাশের ছোট ডেক-চেয়ারে বসল।

চেরী তখনও বাস্তবের ভিতর কি যেন খুঁজছে। সে বলল, বয়, তুমি যেতে পার।

স্মিত্র বাংলায় বলল, চাচা, আপনি চলে যাচ্ছেন।

—মেয়েমানুষকে এত ভয় দাদা, কোকসালে তো খুব হৈ-ঠে করতে।

স্মিত্র জবাব দিতে পারল না। সে চুপ করে বসে থাকল। কাশ্তান-বয় দরজা বন্ধ করে চলে গেছে। স্মিত্র এসময় উঠল এবং দরজা কিঞ্চিৎ খুলে দিল।<sup>১</sup> সে নীচে এন্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অথবা স্মিত্রের মুখে উচ্ছ্বলনের শেষ উদ্ভাপ-চিহ্ন...সে চুপ কবে বসে পড়ল ফের। পোর্টহোলের কাঁচ খোলা, উপরে পাখা ঘুরছে এবং দরজা দিয়েও কিছু হাওয়া প্রবেশ করতে পারছে, তবু স্মিত্র ঘেমে নেয়ে উঠল। যত সে দৃঢ় হবার চেষ্টা করছে, তত যেন ওর মুখে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার ছোপ লাগছে। তত সে অসহায় বোধ করল নিজেকে।

এতক্ষণ পরে চেরী মুখ ফেরাল। শরীরে হান্কা-গাউন, ব্রেসীয়ার স্পষ্ট। চেরী দুইটু ভাঁজ করে বাঁকে বসল। স্মিত্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, পোর্টহোলে রোজ উঁকি মারতে কেন?

—আর উঁকি মারব না মাদাম।

—কেন উঁকি দিতে তাই বল।

—দীর্ঘদিন সফর করছি। দেশে জাহাজ কিরছে না, কেবল জল আর জল।

—একটু বৈচিত্র্য চাইছ?

—আজ্ঞে...। স্মিত্র আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। ভয়ে এবং বিষণ্ণতার আড়ষ্ট বোধ করতে থাকল। ওর পায়ে স্মারক জুতা, নেলপালিশ নখে, স্মগোল হাঁটু পর্যন্ত পা...সে নীচু করে রেখেছে মুখ, তবু ওর সব যেন দেখতে পাচ্ছে। গাউনের শেষ স্ত্রীক্বে লতার শুচ্ছ, পায়ের কোমল ত্বকে কেবিনের আলো...সে আর পারছে না, সে বলল, মাদাম, আর হবে না। আমাকে ক্ষমা করুন।

—তুমি তো ভারতবর্ষের লোক সুমিত্র ?

সুমিত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, এবং টোঁথ তুলে এই প্রথম চেরীর চোখ দুটো খুব কাছাকাছি থেকে দেখল—এত উজ্জ্বল, এত প্রাণবন্ত চোখ সে যেন এই প্রথম দেখল। শালীনতার তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব চেরীকে, চেরীর চোখ দুটোকে কঠিন করে তুলেছে। সুমিত্র চেরীকে সহ্য করতে পারছে না। সে বলল, আমি ভবে উঠি।

চেরী এবার অদ্ভুত রকমে হেসে উঠল—তুমি ভয়ানক ভীতু সুমিত্র। গুনেছি সম্রাট অশোক দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে এই সব দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই ভারতবর্ষের ছেলে তুমি !

সুমিত্র এবার একটু হাসা বোধ করল এবং ভাল করে কেবিনের চারপাশটা দেখে ফেলল। এতক্ষণ পরে সে ধরতে পারছে এই কেবিনে ফুলেল তেলের গন্ধ, বিদেশী দামী সেটে অথবা কোথাও ধূপ দীপ অনবরত জলে জলে চেরীকে, ওর পোশাককে রূপময় করেছে। বাংকের উপর ভায়োলিন। দেয়ালে স্তম্ভের ক্যালোগার। সমুদ্রে ঢেউ। বাইরে ঢেউ ভাঙার শব্দ। নীচে এন্জিন-ঘরের আওয়াজ এবং চেরীর চোখ দুটোতে দ্বীপপুঞ্জের কমলালেবুর গন্ধ। চোখ দুটো কমলালেবুর মতোই সজল।

চেরী কাপ্তান-বয়কে দিয়ে দু' কাপ কফি আনাল। চেরী ইচ্ছা করেই দূরত্ব ভেঙে দেবার চেষ্টাতে এক কাপ কফি খেতে অস্বরোধ করল। সুমিত্র এরপর ভারতবর্ষের কোন রাজপুত্রের মতোই দৃঢ় হল এবং বলল, আপনি আমায় কেন ডেকেছেন মাদাম ?

সুমিত্রের দৃঢ়তাটুকু কেন জানি চেরীর ভাল লাগল না। যে মাহুযটা কিছুক্ষণ আগেও এন্জিনে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল, যার গোপনীয় চোখ দুটো ভয়ে বিত্রত ছিল—সে সহসা এমত দৃঢ় ইচ্ছায় প্রকট হবে, অথচ চোখে কোন কল্পনার চিহ্ন থাকবে না, অবাধ্য যুবকের মুখভঙ্গীতে বসে থাকবে। চেরী এমত ভাব সহ্য করতে পারছে না। সে ফের প্রাণ করল, পোর্ট হোলে উঁকি দিয়ে কি দেখার চেষ্টা করতে বল।

—মাদাম, আমার সম্বন্ধে আপনি খুব বেশি ভাবছেন !

—একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার পোর্ট হোলে উঁকি দিয়েছ তুমি ! ভেবেছ, পোর্ট হোলের কাঁচ মোটা বলে আমি কিছু দেখতে পাইনি ? সি-সিকনেসে

ভুগছিলাম, নতুবা কাপ্তানকে দিয়ে জুই ডেকে পাঠাতাম।

সুমিত্র মাথা নীচু করে আগের মতো বসে থাকল।

—পরে জেনেছি তুমি ইন্ডিয়ান সুমিত্র। টুপাতি একটা বালিশ টেনে কোলের উপর চেপে বলল, কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে, খেয়ে নাও।

সুমিত্র ভয়ে ভয়ে কফিতে চুমুক দিল। খুব আদর-যত্নে এই মেয়েটি প্রতিপালিত—সে তাও ধরতে পারছে। সে একবার ভাবল, কাপ্তানকে বলে দেয়নি তো, সুমিত্র কেমন শুকনো মুখে কফি গিলতে থাকল। বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পথ ধবেই আঁব এন্‌জিন-রুমে আসব না। আপনি দয়া করে কাপ্তানকে শুধু কিছু বলবেন না। আমি সব করব। আপনি যা বলবেন সব করব। সে কেমন ছাডষ্ট গলায় এই সব বলে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। কারো দিকে তাকাল না। সোজা কোকসালে গিয়ে বাংকে শুয়ে ভয়ঙ্কর অপমানবোধে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকল।

চেরী বাংলাকেই চুপ করে বসে থাকল। সুমিত্রের পায়ের শব্দও একসময় মিলিয়ে গেছে। পোর্টহোলের কাঁচে এখন আঁব কোন প্রতিবিম্ব ভাসছে না। এতক্ষণ এই কেবিনে সুমিত্রের চোখ মৃত এবং সাদা ছিল, এতক্ষণ চোখ দুটোতে যেন নিঃসঙ্গ ভূতের আতঙ্ক—এইসব ভেবে চেরী নিজের উপরই বিরূপ হতে থাকল। সে সুমিত্রকে কোন কোঁশলেই যেন আয়ত্ত করতে পাবছে না। অথচ দুদিনের দেওয়ানী চেরীকে যখন এই কেবিনে মৃত্যুর মত শব্দ করে রেখেছিল, তখন পোর্টহোলের কাঁচে কোন এক যুবকের চঞ্চল চোখ—জীবনের প্রতীক যেন...যেন দর্পণ—তাকে নিয়ত রাজপুত্রের মত করে রেখেছে। ঠাকুমার গল্পের স্বাভাবিক এই কেবিনে কোন এক যুবকের শরীরে রূপ পাচ্ছিল—রাজপুত্র, কোটালপুত্র বোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, এক রাজ্য আক্রমণ করে অন্য রাজ্যে, কত গাছ, কত পাখ-পাখালী, কত বন-বাদাড় অতিক্রম করে যাচ্ছে—আহা, ভারতবর্ষের রাজপুত্রেরা বোড়ায় চড়ে একদা রাজকন্যা খুঁজতে বের হত, গল্পে রাজপুত্রের চোখ যেমত এই বয়স পর্যন্ত অল্পসরণ করেছে চেরীকে—এই কেবিনে সেই চোখ, সেই মন এতক্ষণ ক্লান্ত বোড়ার মত পাঠকে ঠুকে নিঃশেষ হয়ে গেল। চেরী উচ্চারণ করল—বেচারী!

বসন্ত টুপাতি চেরী শৈশবের রূপকথার রাজপুত্রের চোখকেই যেন পোর্টহোলে প্রত্যক্ষ করেছিল। দেওয়ানীতে মাথা তুলতে পারছে না, শরীরে ভয়ানক যন্ত্রণা এবং সারাদিন বাংকে পড়ে থাকা, সারাদিনের ভিতর পোর্টহোলের ঘন কাঁচে সুমিত্রের চোখ দুটোই এক অসামান্য রূপকথার রাজপুত্র, সুখ এবং আনন্দ এই



দেয়ালে পৌছে দিয়ে গেছে। ঠাকুমার কোষে শুয়ে যে রাজপুত্রের গল্প শুনতে শুনতে চেরী ঘুমিয়ে পড়ত, যে রাজপুত্রের চোখ দুটো জীবনের এতদিন পর্যন্ত অক্লুসরণ করে আসছে, পোর্টহোলে সহসা সেই চোখ দুটোকে যেন আবিষ্কার করেছে চেরী এবং প্রত্যক্ষ করেছে।

রাত্রিবেলায় সুমিত্র ওয়াচে নামার সময় অন্যপথ ধরে গেল।

ওয়াচ থেকে উঠে আসবার সময় কসপ বলল, কাল রাজকন্যা তোমাকে কি বলল সুমিত্র ?

সুমিত্র জবাব দিল, আমার দেশ কোথায়, কি নাম—এইসব নানারকমের কথা। সব মনে নেই।

—সাহেবদের ফেলে তোমার দিকে এমন নজর !

—কি করি ! রাজকন্যার মজি বোঝা দায়।

বিকেল বেলায় সুমিত্র দেখল চেরী ছোট ডেকে বসে আছে। কাঁটা দিয়ে উল বুনছে। পাশে ছোট মালোম বসে—নিশ্চয়ই গল্প করছেন। ডেক-অ্যাপ্রেক্সিসরাও সেখানে আছে। বেশ গুলজার বলতে হবে। সে পিছিলের ছাদের নীচ থেকে সব দেখল। রঙিন কাগজের মত মথমলের পোশাক চেরীর সমস্ত শরীরে জড়ানো। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত গাউনের শেষ প্রান্ত ঝুলছে। চুলের গুচ্ছ বুকা কায়দায় জড়ানো। ষাড়ের মস্তণ ত্বক, কমলা রঙের রোদ, চুলের সোনালীগুচ্ছ এই সমুদ্রের নীল নির্জনতাকে ভেঙে দিচ্ছে। সুমিত্র গ্যালীতে ঢুকে, গ্যালীর জানালা দিয়ে প্রায় গোপনীয় ভাবেই চেরীকে দেখতে থাকল। অন্যান্য জাহাজীরাও সেখানে এসে ভীড় করছে। ওর এই ভীড় ভাল লাগছে না। ওর মনে হল কেন জাহাজী নিঃসঙ্গতা ওকে জড়িয়ে ধরছে। এই মনোরম বিকেল, কমলা-রঙের রোদ এবং ছোট মালোমের উপস্থিতি কেন জানি তাকে কেবল পীড়া দিচ্ছে। সে গ্যালী থেকে বের হয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে-কোকসালে ঢুকে বাংকে শুয়ে পড়ল। এক অহেতুক ঈর্ষার জন্ম হচ্ছে মনে। সে বাংকে শুয়ে চেরীর অসামান্য রূপে দম্ব হতে থাকল।

কাপ্তান-বয় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সুমিত্র, আবার যে ডাক পড়েছে পাঁচ নম্বর কেবিনে।

সুমিত্র বলল, কেন, চেরী তো বোট-ডেকে বসে আছে দেখে এলাম।

—এখন আর নেই। কেবিনে ঢুকেই বলছে, সুমিত্রকে আসতে বল।

—কি ক্যাসাদে পড়া গেল চাচা !

—কোন ক্যাসাদ নেই। আল্লাতায়লা ঠিক রক্ষা করবে। খুশী হয়ে চলে যাও।

কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে সুমিত্র প্রথম অনুমতি নিল, পরে ঘরে ঢুকে ডান-দিকের বাংকে বসল। চেরী সুমিত্রের জন্য প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাব চোখে-মুখে। সে-ও সুমিত্রের পাশে বসে পড়ল এবং বলল, জাহাজে কতদিন ধরে কাজ করছ ?

—এই নিয়ে দু সফর।

—যাত্রী-জাহাজে কোনদিন চড়নি ?

—না মাদাম।

—তাই তুমি জানতে না অন্যের কেবিনে কখনও উঁকি দিতে নেই।

—পোর্ট হোল দিয়ে কেবিন অস্পষ্ট বলে আমিও আপনার কাছে অস্পষ্ট—এই ভেবেছি। আপনি ঘরের অন্ধকারে পড়ে থাকতেন, আমি বাইরের আলোতে থাকতাম। সে কথাটা তখন আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি।

—তবে বল আমাকে দেখার জন্য চুরি করে উঁকি দিতে ?

সুমিত্র মাথা নীচু করে রাখল আগের মত।

—হঁ এ-তো ভাল কথা নয়, সুমিত্র।

সুমিত্র মাথা তুলছে না। সুমিত্রের চোখে-মুখে ফের অপরাধবোধ জেগে উঠছে।

—এইসব জাহাজে তোমার কাজ করতে ভাল লাগে ?

—না মাদাম। কাজ করতে ভাল লাগে না।

—তোমার দেশ ভারতবর্ষ, কত বিরাট আর কত অসামান্য দেশ !

—আজ্ঞে, মাদাম ?

—ঠাকুরার কাছে তোমার দেশের রাজপুত্রদের গল্প শুনেছি। সমুদ্রের ধারে ঠাকুরা আমাদের তোমার দেশের রূপকণার গল্প শুনিye ঘুম পাড়াতেন। এইসব কথা বলে চেরী উত্তেজিত হল অথবা কেমন উত্তেজিত দেখাল চেরীকে। চেরী বলল, চিফ-এনজিনিয়ারের কথায় তোমার কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

—কোন কথায় মাদাম ?

—তোমাদের সন্তায় নেয়া হয়। যেন অনেকটা গরু-ভেড়ার মত ভাব।

—ওঁরা তো ঠিকই বলেছেন মাদাম। আমরা তাঁদের কাছে—

—এইসব লোকদের আমি ঘৃণা করি।

সুমিত্র এবার কথা বলল না। সব কিছুই রহস্যময় মনে হচ্ছে। চেরীর সকল কথাই কেমন অসংলগ্ন। সুমিত্র বুঝল না চেরী যথার্থ কাকে ঘৃণা করছে। সুতরাং সে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকল এবং চেরীর অসামান্য রূপে বিহ্বল হতে থাকল।

—আমি কাপ্তানকে ধমক দিতে পাবতাম। কিন্তু দিইনি। এতে তোমাদের আরও বেশী অপমান করা হবে। একটু থেমে চেবী ফেব বলতে থাকল, কাপ্তান এবং চিক-এন্জিনিয়ার আমাকে এন্জিন কমেব সব কিছু দেখালেন। তোমাদের দেখালেন, যেন তোমাদের বাদ দিনে এন্জিন কমেব একটা এন্জিনকেই বাদ দেওয়া হল।

—মাদাম, আমবা নাবিক। এব চেয়ে বড় অস্তিত্বের কথা ভেবে আপনি অযথা কষ্ট পাবেন না।

—তাঁর চেয়ে বড় কথা তুমি ভাবতবর্ষে ছেলে। বন্ধদেব, গান্ধী, ববীন্দ্রনাথ তোমার দেশে জন্মগ্রহণ কবেছেন।

—আপনি দেখছি ভাবতবর্ষের প্রতি খুব অন্তবন্ত।

—আমি একটি মহান জাতির প্রতি অন্তবন্ত। এখন চেবীকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই মুহূর্তে জাহাজে বিপ্লব শুরু কবে দিতে পারে।

—আমি উঠি মাদাম। ওষাচের সময় হতে বেশী দেবি নেই।

যেন চেবী শুনতে পেল না, যেন খুব অন্যমনস্ক। চেবী আবেগের সঙ্গে বলতে থাকল, স্মিত্র, আমিও ভাবতবাসী। আমার পূর্বপুরুষ ভাবতবর্ষ থেকে বাণিজ্য করতেন এসে এই সকল দ্বীপে থেকে গেল। আর ফিবল না। তোমাকে দেখে আমি তবে খুশী হব না, তোমার অপমানে আমি আমার অপমান ভাবব না?

স্মিত্র কেবল স্বরণ করিয়ে দিল তাঁর ওষাচের সময় হয়ে গেছে। অথচ চেবী এতটুকু কর্পাত কবছে না কথায়। এবং সেজন্য স্মিত্র চেবীর সকল কথার ভিতর নষ্ট চবিত্রের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছে। এই বিষন্ন আলাপ স্মিত্রকে চেবী সম্বন্ধে আদৌ কোন কোঁতুলনী কবছে না। স্মিত্র মৃত চোখ নিয়ে বসে থেকে সকল কিছুকে বিবক্তিকর ভেবে পোর্টহোলের কাঁচে ঠাণ্ডা হাওয়ার গন্ধ নিতে সহসা উঠে দাঁড়াল।

স্মিত্র চলে যাচ্ছে। দবজায় এক পা বেখে দেখল চেবী কথাবার্তায় এখন নবম এবং সহজ হয়ে উঠছে। চেবীর মুখ প্রসন্নতায় ভরা। যেন প্রগাঢ় স্নেহ এই জাহাজী মানুষটির জন্য সে লালন কবছে। স্মিত্র নির্ভয়ে দরজা টেনে দিতে শুনল, চেবী ভিতর থেকে বলছে, ঠাকুমা আমাদের সকলকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ভাবতবর্ষের রাজপুত্রদের গল্প কবতেন। ভয় অথবা বিষণ্ণতা একদিন ধবে স্মিত্রকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, চেবীর শেষ আলাপ, প্রগাঢ় মেহবোধ স্মিত্রকে নতুন জীবন দান করছে। সে ডেকের উপর দিয়ে প্রায় ছুটে এল।

হাঙ্কা শিস্ দিল কোকসালে নামার সময় ।

চেরী বাংকে বসে থাকল । ভয়ানক নিঃসঙ্গ এই সমুদ্রযাত্রা—চেরী ঠাকুমার স্মৃতি মনে করল । সেই সব রাজপুত্রের ঘোড়াসকলকে মনে করল । অথবা রাক্ষসের প্রাণ রূপের কোঁটায় সোনার ভ্রমরে...যেন পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে—রাক্ষসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে...চেরী এই কেবিনে উঠে দাঁড়াল । অথবা নির্জন দ্বীপে রাজকন্যা নিদ্রিত, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, ছুটছে...চেরী ঠাকুমাকে স্মরণ করতে পেরে এইসব ভাবল । সেইসব মনোরম বিকেলের কথা তার মনে হল । যেন স্মৃতিকে দেখেই সে তার কৈশোর-জীবনের কথা মনে করতে পারছে । বিকালের সমুদ্র পাহাড়ের ধারে, ছোট ছোট মাছেরা খেলছে । সমুদ্রের ধারে ওরা ছুটোছুটি করছে । নারকেল গাছের ছায়ায় ঠাকুমা ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে বসে আছেন, যেন যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে, তাঁর পিতৃপুরুষের দেশকে, দেখছেন । তখন অ্যাণ্টনী নারকেল গাছ থেকে ভাব কেটে দিচ্ছে সকলকে । ওরা বালিয়াড়িতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত । ওরা ডাবের জল খেতে খেতে ঠাকুমার পাশে বালুর উপর শুয়ে পড়ল । তখন সমুদ্রে স্থব্ধ ডুবছে । নির্জন পাহাড়ী দ্বীপে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেল এবং ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমার-মত-রূপকথার গল্প আরম্ভ করে চেরীর মুখ টিপে বলতেন, তোর জন্য ভারতবর্ষ থেকে এক টুকটুকে রাজপুত্র ধরে আনব । চেরীর সেই কৈশোর মন ঠাকুমার কথা যথার্থই বিশ্বাস করে এক রঙীন স্বপ্নে ঠাকুমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত ।

চেরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল । পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল । পর্দা তুলে দিল, অথচ সেই চোখ দুটোকে আর খুঁজে পেল না । যতক্ষণ স্মৃতি এই বাংকে বসেছিল, যতক্ষণ গল্প হল পোর্টহোলের চঞ্চল চোখ দুটোর গোপনীয় ভাব স্মৃতির চোখে-মুখে ফিরে এল না । কেমন নিশ্চিন্ত, কেমন পাথরের মত চোখ নিয়ে এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে থাকল স্মৃতি । স্মৃতির সকল দুঃখকে তুলে থাকবার জন্য পোর্টহোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভায়োলিনটা বাজাতে থাকল চেরী । উপরে নীচে, সামনে পিছনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, শুধু নীল সমুদ্র এবং মনে হল সমুদ্রে রূপকথার রাজপুত্রেরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে । এবং সেইসব দ্বীপপুঞ্জের অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের চেরী পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে দেখল ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রে স্মৃতির সমানে সমানে ছুটেতে পারছেন না । জীবনের প্রথম লগ্নে ভারতবর্ষের এক স্পৃহা যুবাকে, যুবীর কোমল চোখ দুটোকে পরম অপার্থিব বস্তু ভেবে চেরী কখন প্রীত হতে থাকল । চেরী, সেই দীর্ঘির (ঠাকুমার বর্ণিত রূপকথা) সিঁড়িতে

সুমিত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যেন রাজপুত্র কোটালপুত্র নামছে, নামছে। মানিকের আলোয় দীঘির সিঁড়ি ধরে রাজকন্যার দেশে নামছে। নিরুপ পুরী, কোন শব্দ নেই। লোক নেই, প্রাণী নেই, পাখি নেই, নিঃশব্দ ভাব। সোনার গাছ। গাছে হীরা-পান্নার ফল। সোনার ঝরণা, সোনার পাখি। একই গাছের ডালে নাচ এবং গান। রাজপুত্র গান শুনতে শুনতে নাচ দেখতে দেখতে সদর দেউড়ি পার হয়ে সাত দরজা ডাইনে ফেলে অন্তরের চাবিকাঠিতে হাত বুলাল। এখানে ছোট নদী বইছে—সুবর্ণরেখা নদী। নদী ধরে পদ্ম ভাসছে—কখনও হীরা, কখনও মানিক্যের। এবং রাজপুত্র চন্দনকাঠের পালকে রাজকন্যাকে দেখল। এই সব গল্প শুনে টুপাতি চেরী বলত, আমরা কোনদিন ইন্ডিয়ায় যাব না ঠাকুমা?

ঠাকুমা বলতেন, বড় হলে যাবে। দেখবে তখন কত রাজপুত্র তোমাদের খুজতে বের হয়েছে।

চেরী যেন এই বয়স পর্যন্ত কোন রাজপুত্রকে অনুসন্ধান করে সহসা পোর্ট-হালের কাঁচে তাকে আবিষ্কার করেছে।

ছোট বড় ঢেউ উঠছে সমুদ্রে। দূরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডলফিনরা, ফ্লাইং-ফিশের ঝাঁক বর্ষার মত ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। দুটো-একটা দ্বীপ, দুটো একটা আগ্নেয়গিরি আকাশ লাল করছে। দ্বীপে ছোট ছোট পাখীরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। জলে, লাল নীল হলুদ রঙের মাছ। তখন সূর্য উঠছে।

আবার বিকাল। সূর্য পাটে বসেছে। পোর্টহালের ঘন কাঁচে কোন চোখ ধরা দিচ্ছে না। টুপাতি দেখল, সুমিত্র আর অ্যালওয়ে ধরে এন্জিনে নামছেন। অথবা এন্জিন-রুম থেকে উঠে আসছে না। অভিমানে টুপাতির চোখে জল আসতে চাইল।

সেই বিকালে ছোট মালোম এসে বললেন, আসুন, আমরা একসঙ্গে চা খাই।

চেরী বলল, ক্ষমা করবেন মিষ্টার। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

পরদিন ডিনার-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন করলেন কাপ্তান। বললেন, আজ আপনি আমাদের গেস্ট্। আমরা সকলে একসঙ্গে ডাইনিং-হলে খাব।

চেরী বলল, বেশ হবে।

বুড়ো কাপ্তান উঠলেন। চেরী ফের প্রাণ করল, আর ক'দিন বাদে বল্লর ধরবে ক্যাপ্টেন?

তিনি কি হিসাব করে একটি তারিখের উল্লেখ করলেন এবং কাপ্তান কি ভেবে ফের বললেন, সন্ধ্যায় ডাইনিং-হলে একটু নাচ-গান হোক—এই আমার ইচ্ছা।

—বেশ হবে ।

—আপনি অংশগ্রহণ করলে বাধিত থাকব ।

—অংশগ্রহণ করব ।

—ভারতীয় জাহাজীটি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করছে ?  
কাপ্তান কথাপ্রসঙ্গে যেন এই কথাগুলো বললেন ।

—কোথায় করছে ! চেরী এই বলে বড় বড় হাই তুলল ।

—ছোড়া ভারী বেয়াদপ দেখছি !

—ভয়ানক । আবার হাই তুলল চেরী ।

—দাঁডান, ঠিক ব্যবস্থা করছি ।

—তা করুন । সে কেবল হাই তুলতে থাকল ।

—এবার আমি আসি ।

—আচ্ছা ।

তখন ঘড়িতে সাতটা বাজল । আটটা-বারোটা ওয়াচের জাহাজীরা বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে । ওরা ফানেলের পাশ দিয়ে স্টোকহোলডে নেমে যাবে এমন সময়ে কাপ্তান-বয় ছুটে ছুটে এল । বলল, স্মিত্রকে বাড়িয়ালার তাঁর কেবিনে ডাকছে ।

স্মিত্র এই ডাকে ভীত অথবা সন্ত্রস্ত নয় । চেরীর চোখে যে স্নেহ দেখেছিল, নিশ্চয়ই তা বেইমানী করতে পারে না । অন্য কোন কারণ অথবা সারেঙের কান-ভারী কথা—এমন সব ভেবে সে অ্যাকোমোডেশান ল্যাভার ধরে ব্রীজ অতিক্রম করে কাপ্তানের ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল । দরজা খোলা ছিল বলে কাপ্তান তাকে দেখতে পাচ্ছে । কাপ্তান যেন চার্ট-রুমে কোন মানচিত্র দেখছে এমন চোখে স্মিত্রকে দেখে দেখে এক সময় বলল, তুমি এই জাহাজে কোল-বয়ের চাকরী করতে ?

—ইয়েস মাস্টার ।

—আমি তোমাকে ফায়ারম্যান করেছি ?

—ইয়েস স্যার ।

—তারপর ইকাতুলা কার্ডিকে নেমে গেল বলে তুমি গ্রীজার হলে ?

—ইয়েস স্যার ।

—ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার ! বেয়াদপ পাজি, ন্যাস্টি হেল্ ! কাপ্তান চিৎকার করতে থাকলেন ।

সুমিত্র নীচের দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সুমিত্র বুঝতে পারছে না।  
ওর বেয়াদপি কোথায় এবং কখন ঘটেছে। তবু স্বীকার করাই ভাল। নতুবা  
কাপ্তান এখনই লগ-বুক এনে খচ খচ করে হয়তো লিখবেন—সুমিত্র, অ্যান  
ইণ্ডিয়ান সেলর ডাজ নট ক্যারী আউট হিজ জব। সে বলল, ইয়েস মাস্টার,  
আর কোনদিন বেয়াদপি হবে না।

—তাহলে কোনদিন বেয়াদপি করবে না বলছ?

—না মাস্টার কোনদিন করব না।

—ফের কোল-বয় হবার যদি ইচ্ছা না থাকে, চেরীকে যথাযথ সম্মান দেখাবে।

সুমিত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর কাপ্তানের কথামত যখন ব্রীজ  
পার হয়ে সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে নেমে এল, যখন দেখল সকল জাহাজীরা নেমে  
যাচ্ছে স্টোকহোলমে, তখন উত্তেজনায় অধীর হতে হতে সে বাংলায় অগ্নীল সব  
কথাবার্তা বলল চেরীকে উদ্দেশ্য করে এবং এ-সময় একটু মদ খাবার শখ জাগল।

বিকেল বেলা, চেরীর ঘরে ডাক পড়তেই সুমিত্র তাড়াতাড়ি ছুটে গেল।  
এক মুহূর্ত দেরী করল না, অথবা সাজ-গোজের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াল না।  
সে অল্পমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখল—চেরী ভয়ানক ভাবে সাজগোজ করে বসে  
আছে। কোলের উপর ভারোলিন। প্রসাধনের তীব্র তীক্ষ্ণভাব সুমিত্রকে  
সুচতুর মৌনবিলাসী হতে যেন বলছে। চেরীকে সে দেখল। মথমলের পোশাক  
দেখল এবং নগ্ন ভঙ্গীতে বসে ঠোটে বিদ্যুৎ খেলতে দেখল। চিবুকে ভাঁজ পড়েছে  
—পায়ের ভাঁজে ভাঁজে কেমন আড়ষ্ট ভঙ্গী।

সুমিত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, কোন কথা বলল না।

—এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

সুমিত্র কোথায় বসবে ঠিক করতে পারল না।

—ডেক-চেয়ারটাতে বোস সুমিত্র।

সুমিত্র খুব আড়ষ্টভঙ্গীতে বসল।

—অমন পুতুল-পুতুল ভাব কেন? কোন সজীবতা নেই চলাফেরাতে।  
কেবিনে ঢোকবার আগে পোর্টহোলের চোখদুটো কোথায় রেখে আস?

—আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম। সেই চোখদুটো কিছুতেই আর সংগ্রহ  
করতে পারছি না।

—কেন, কেন পারছ না?

—আজ্ঞে, কাপ্তান অযথা ধমকালেন।

চেরী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অম্বা হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা কাপ্তানের পাল্লায় পড়েছ !

—ইয়েস মাদাম। আপনি কিন্তু ও-কথা আবার কাপ্তানকে বলবেন না।

—কাপ্তানকে তুমিও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে না ?

সুমিত্র জিব কাটল।—তা হয় না মাদাম। আমাদের কাপ্তান খুব ভাল লোক। অন্য জাহাজের কাপ্তান ভারতীয় জাহাজীদের সঙ্গে সাধারণতঃ কোন কথাই বলেন না। সব সারেঙের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অথচ আমাদের প্রিয় কাপ্তান সকল জাহাজীদের নাম জানেন। তাছাড়া নাম ধরে ডেকে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করেন। আমি কিছু ইংরেজী জানি বলে তিনি খুব খুশী আমার উপর। এই জাহাজে কোল-বয় হয়ে উঠেছি, তাঁর দয়ায় এখন আমি গ্রাজার। জাহাজীদের এর চেয়ে বড় উন্নতি এত অল্প সময়ে নেই।

—তবে বলতে হয় কাপ্তান তোমাকে খুব ভালবাসেন ?

—হ্যাঁ মাদাম।

—আমি ভায়োলিন বাজাই, কই কোনদিন তো বললে না আপনার বাজনা শুনতে ইচ্ছা হয়, ভাল লাগে।

কথার আকস্মিক পরিবর্তনে সুমিত্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সাহসে কুলায় না, মাদাম।

—সাহসে কুলায় না, না, ইচ্ছা হয় না ?

সুমিত্র এবারও জিব কাটল। চোখে পোর্টহালের প্রতিবিম্ব ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেই ফের মিলিয়ে গেল। যদি অভয় দেন তো বলি।

সুমিত্র আবার ভাবল কোন বেয়াদপি করে ফেলছে না তো ! সে বলল, না থাক মাদাম।

—কেন থাকবে ? তুমি বল। অভয় দিচ্ছি।

—সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় আপনার বাজনা শুনেছি, দীর্ঘির পারে উইলোগাছের ছায়ায় বসে রোজ বিকালে ভায়োলিন বাজাতেন।

—তুমি লুকিয়ে এত সব করতে ?

—কিছু মনে করবেন না মাদাম। আমরা সেলার। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দরে এলেই একটু বৈচিত্র্য খুঁজি। কেউ মদ খায়...কেউ... চূপ করে গেল সহসা। না থাক।

চেরী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, ডাইনিং-হলে নাচ-গান হবে। তুমি এস।



সুমিত্র জবাব দিল, সে হয় না মাদাম। জাহাজীদের অত দূর যাবার সাধ্য নেই।

চেরী বলল, আমি কাপ্তানকে যদি অনুরোধ করি।

—মাদাম, আপনি জাহাজে আর চার-পাঁচ দিন আছেন। আপনি নেমে গেলে সকল জাহাজীরা, সকল অফিসাররা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।

চেরী চুপ করে থাকল। অগম্যনকভাবেই ছড় চালাল ভায়োলিনের তারে। এই সুর সুমিত্রের সেই পরম অপার্থিব চোখদুটিকে যেন খুঁজছে।

ছোট মালোম এলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে অমুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই শব্দে সুমিত্র উঠে দাঁড়াল। —আমি তবে আসি মাদাম।

—বোস। ছোট মালোমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যাচ্ছি। একটু দেরি হবে। চেরী এবার সুমিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি রোজ এই পথ ধরে নামবে সুমিত্র, কথা দাও।

—আপনি দুঃখ পাবেন মাদাম। আমার চোখদুটো কের বেইমানী করতে পারে।

—না, কথা দাও।

—এই পথ ধরেই নামব। কথা দিলাম।

চেরী বসেছিল চুপচাপ। সুমিত্র চলে গেছে। ছোট মালোমও চলে গেছেন। সে ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজার দেরি নেই। সে বাংক থেকে নেমে জামা-কাপড় বদলালো। সে তার দামী ইভনিং-পোশাক পরে আয়নায় প্রতিবিম্ব ফেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এ-সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। চেরী প্রশ্ন করল, কে?

—আমি, ক্যাপ্টেন স্মিথ।

—হয়ে গেছে আমার। আমি যাচ্ছি। বলে চেরী ভায়োলিন হাতে বেগ হল। কাপ্তেনের সঙ্গে চলতে থাকল। ওরা ডাইনিং-হলের দিকে যাচ্ছে। যে সকল অফিসারদের, এন্জিনিয়ারদের ওয়াচ নেই, তারা পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে বসে আছে। চেরী চুকলে সকলে উঠে সম্মান দেখাল চেরীকে। মালবাহী জাহাজের ছোট ডাইনিং-হল, অল্প পরিসরে কয়েকজন মাত্র পুরুষ। ঘরে নীল আলো। বার্টলার, কাপ্তানের আদেশমত এই ছোট ঘরটিকে বিচিত্র সব রঙীন কাগজে এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেয়ার-টেবিলের জেল্লায় জলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছে। চেরী কেমন খুঁতখুঁত করতে থাকল।

কাপ্তান একটু ইতস্তত করে বলল, সমুদ্রের দিনগুলোতে কোন আনন্দ নেই  
মাদাম। সুতরাং স্বল্প আয়োজন থেকেই যতটা আনন্দ নিতে পারি।

—আমি কিন্তু অল্প কথা ভাবছি কাপ্তান। সেটা আপনাকেও ভেবে দেখতে  
বলি।

—বলুন।

—এই ছোট্ট ঘরে না হয়ে খোলা ডেকে হলে ভালো হয় না?

কাপ্তান এবারও একটু ইতস্তত করল। আপনি সকল জাহাজীদের এ-  
আনন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন?

—মন্দ কি! আমার কিন্তু মনে হয় সেই ভালো হবে। ডেকে সুন্দর জ্যোৎস্না  
উঠেছে। সমুদ্রে ঢেউ নেই। এমন সুন্দর দিনে....

—তাই হবে।

সুতরাং চার নম্বর এন্জিনিয়ার দৌড়ে গেল ডেকে। ডেকের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়,  
ডারিকে, মাফ্টে সবুজ লাল-নীল আলো জ্বলে দিল। সতরঞ্চ পেতে সকল  
জাহাজীদের বসতে বলা হল। তারপর কাপ্তান নিজেই বলতে থাকলেন,  
আমাদের মাননীয়া অতিথি মিস টুপাতি চেরীর সম্মানার্থে এই আনন্দের আয়োজন।  
আমাদের সমুদ্রের দিনগুলো ভয়ানক নিঃসঙ্গ। সুতরাং সকলেই আজ খোলা মনে  
আনন্দ করব। এবং এই সম্মানীয়া অতিথির প্রতি নিশ্চয়ই অশালীন হব না।

অফিসারদের জুতা কিছু চেয়ার, কাপ্তান একপাশে এবং তার ডাইনে রেলিঙের  
ধারে চেরী বসল। সমুদ্রে ঢেউ নেই বলে জাহাজ বিশেষ ঢুলছে না। একটু একটু  
শীত লাগছে। সকল জাহাজীরা চারপাশে বসে আছে। চেরী সহজ হয়ে দাঁড়াল,  
প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলল, আমরা আজ সকলে পরস্পরের বন্ধু। আসুন, আমরা  
আজ সকলে একসঙ্গে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। এই কথায় সকলে উঠে দাঁড়াল।  
ওরা প্রার্থনার ভঙ্গীতে আকাশ দেখতে থাকল।

তারপর ছোট মালোম চেরীর অম্মতি নিয়ে গান গাইলেন, লেটস লভ মাই  
গার্লফ্রেন্ড অ্যাণ্ড কিং হার....

মেজ মিস্ত্রি তাঁর ছোট্ট ক্যানারী পাখিটা খাঁচা-সহ টেবিলের উপর রাখলেন।  
শিশু দিয়ে পাখিটাকে নানারকমের অঙ্গভঙ্গীতে নাচলেন। সকলে হেসে গড়াগড়ি  
দিল।

কাপ্তান কীটসের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন সকলকে।

একটু বাদে এলেন জাহাজের মার্কিন সাব। মুখোশ পরে চারিধারে বিজ্ঞ

ব্যক্তির মত ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে বোরাচ্ছেন, তিনি যেন কি খুঁজছেন, অথবা কি যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। শেষে কাপ্তানের কাছে এসে বললেন, দিস্ ম্যান, মাই ফ্রেণ্ড, দিস ম্যান ইজ দি রুট অফ অল ইভল্‌স্। স্মৃতরাং আসুন ওকে খতম করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই। বলে তিনি তাঁর লাঠিটা কাপ্তানের মাথায় তুলে ফের নামিয়ে আনলেন, না, মারব না। নোবেল কমিটির শাস্তি পুরস্কারটা আমার ভাগ্যে কসকে যাক— সে আমি চাই না। এবং দুঃখে দুটো বড় হ্যাঁচ দেওয়া যাক। তিনি বড় রকমের দুটো হ্যাঁচ দিলেন। লাঠিটা আপনারা নিয়ে নিন, বলে ক্লাউনের কায়দায় লাঠিটা ছুঁড়ে মেরে ফের ধরে ফেললেন। এবারও সকলে না হেসে পারল না।

এন্জিন-রুমে যাদের ওয়াচ ছিল, তারা উপরে উঠে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যাচ্ছে। স্মিত্র সকলের পিছনে বসে আছে। ব্রীজে ঘণ্টা বাজল। এখন সাতটা বাজে। স্মৃতরাং আর আধঘণ্টা এখানে বসে থাকা যাবে। স্মিত্র উঠি-উঠি করছিল, এ সময় চেরী বলল, এবার স্মিত্র আমাদের একটু আনন্দ দিক।

কাপ্তান বললেন, স্মিত্র গান গাইবে।

—স্যার, আমাদের গান আপনার ভাল লাগবে না।

—না স্মিত্র, ঠিক কথা বলছ না। আমরা এখানে কেউ সঙ্গীতজ্ঞ নই। শুধু একটু আনন্দ—সে যেমন করে হোক। একটু আনন্দ, আনন্দ করো।

স্মিত্র একটি সাধারণ রকমের বাংলা গান গেয়ে সকলকে শোনাল।

এ-সময় ডেক-অ্যাগ্রেস্টিস এল পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা শুয়ে বসে নাচল। এবং সবশেষে চেরী ওর দীর্ঘ দিনের অভ্যাসকে ভাওয়ালিনের তারে মূর্ত করে তুলে সকলকে আনন্দ দিল।

তারপর রাত নামছে, ডাইনিং-হলে কাঁটা-চামচের শব্দ। সেখানে বাটলার এবং অগ্নাত্ত বয় সকল ছোটোছুটি করে পরিবেশন করল। সকলে মদ খেল অল্প-বিস্তর। চেরী মদ খেয়ে মাতাল হল আজ।

রাত দশটা বেজে গেছে। চেরী নেশাগ্রস্ত শরীরে কেবিনের ভিতর ডেক-চেয়ারে বসে আছে। স্মিত্র সকলের পিছনে চুপচাপ বসেছিল। উইংস থেকে একটি আলোর তির্যক এসে ওর চোখে পড়েছে। চেরী ক্ষণে ক্ষণে স্মিত্রকে দেখছিল। দুটি পরস্পর গোপনীয় দৃষ্টি ঘনিষ্ঠ হতে হতে এক সময় লজ্জায় আনত হল। চেয়ারে বসে চেরী সেই চোখদুটোর কথা ভেবে পোর্টহালের কাঁচ খুলে দিল। পর্দা সরিয়ে দিল। ঘুম আসছে না। এ সময় স্মিত্রকে ডেকে পাঠালে হত।

—বয়, বয়! দরজায় পায়ের শব্দে চেঁচী উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল। শরীর টলছে।—বয়, আজ সুন্দর রাত। বয়, তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—মাদাম, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ুন। মাসে জল রেখে গেছি।

—বয়, তুমি জান আমি ভারতীয়?

—জী, না।

—জেনে রাখ আমি ভারতীয়। বড হুংখ বয়, আমার আর সে-দেশে যেতে পারব না। বয়, একটা কথা বলব তোমাকে। কিন্তু সাবধান, কাউকে বলবে না।

—মাদাম, আপনার শরীর ভাল নেই। শুয়ে পড়ুন।

—বয়, সুমিত্র কিন্তু রাজপুত্র হতে পারত। ওর চোখ, মুখ, শরীর সব সুন্দর।

—মাদাম, সুমিত্র যে রাজার ঘরেরই ছেলে। ভাগ্যদোষে—

চেঁচী এবার কিছু বলল না। সে ধীরে ধীরে উঠে পোর্টহোলে মুখ রাখল।—  
তুমি যাও, বয়।

—মাদাম, দরজাটা বন্ধ করে দিন। কাপ্তান-বয় বের হয়ে যাবার সময় একথাগুলো বলল।

চেঁচী পোর্টহোল থেকে যখন দেখল কাপ্তান-বয় ঘরে নেই—ওর পায়ের শব্দ অ্যালওয়েতে মিশে গেছে এবং যখন মনের উপর শুধু সুমিত্রই একমাত্র দৃশ্যমান বস্তু, তখন দরজা বন্ধ না করে নীচে এন্জিন-রুমে নেমে সুমিত্রের পাশে এসে দাঁড়ানোই ভালো। চেঁচী দরজা খুলে বাইরে বের হল। এন্জিন-রুমে নামার মুখেই দেখল সুমিত্র তেলের ক্যান নিয়ে উপরে উঠে আসছে।

—এই যে, মাদাম!

—সুমিত্র, তোমার ওয়াচ শেষ?

—না মাদাম, পিছিলে যাচ্ছি, স্টিয়ারিং-এন্জিনে তেল দিতে।

—রাত এখন কত?

—এগারোটা বেজে গেছে, মাদাম।

—জাহাজে আর কারা এখন জেগে থাকে সুমিত্র?

—অনেকে মাদাম। অনেকে। ব্রীজে ছোট মালোম, এন্জিন-রুমে তিন নম্বর মিশ্রি, স্টোকহোল্ডে চারজন কায়ারম্যান, তিনজন কোল-বয়, কম্পাস ঘরে কোয়ার্টার-মাস্টার, ক্রোয়ার্ড পিকে কোন ডেক-জাহাজী।

—তুমি এত কষ্ট করতে পার সুমিত্র!

—এখন তো কোন কষ্টই নেই মাদাম। যখন কোল-বয় অথবা কারারম্যান ছিলাম সে কি কষ্ট!

—তুমি আমার ঘরে আসবে সুমিত্র?

—আপনার শরীর ভাল নেই মাদাম। আমি আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছি। কারণ চেরীর এই উচ্ছ্বল ভাবটুকু ভাল লাগছে না সুমিত্রের। সে চেরীর অণু কোন অল্পরোধ রাখল না। সে চেরীকে ধরে বলল, আসুন।

—কোথায় সুমিত্র?

—কেবিনে।

—আমার ভাল লাগছে না।

—ভাল না লাগলে তো চলবে না মাদাম।

—তুমি কেবিনে বসবে, বল?

—বসব।

—তোমার কের ওয়াচ কটায়?

—ভোর আটটায়।

চেরী কেবিনের দিকে না গিয়ে ডেকের দিকে পা বাড়ালে সুমিত্র বলল, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। রাত দুপুরে জাহাজীরা দেখলে বলবে কি?

—কি বলবে সুমিত্র?

—কি আবার বলবে! আসুন। ধমকের সুরে কথাগুলি বলল সুমিত্র। তারপর জোর করে চেরীকে কেবিনে ঠেলে দিতেই সুমিত্র শুনতে পেল—চেরী বলছে ভাল হচ্ছেনা সুমিত্র। আমি মাতাল বলে কিছুই বুঝতে পারছি না ভাবছ। কাল ঠিক কাপ্তানকে নালিশ দেব দেখো। আমার উপর জোর খাটালে ঈশ্বর সহ্য করবেন না।

কের সুমিত্র নিজের অবস্থা বুঝে খানিক বিব্রত বোধ করছে। এমত ঘটনার কথা কাপ্তানকে বললে—তিনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন না। অথবা মনে হল বৃদ্ধ কাপ্তানকে খবর দেওয়া যাক—চেরী ডেকের অলিগলিতে ঘুরতে চাইছে। চেরী মদ খেয়ে মাতাল এবং চেরীর এইসময় যৌনেচ্ছার বড় ভয়ানক সখ। কিন্তু দেখল যে রাত গভীর। ফরোয়ার্ড পিক থেকে ওয়াচ করে ডেকজাহাজী হামিদুল কিরছে। ওয়াচের ঘণ্টা বাজছে ব্রীজে। সুতরাং বৃদ্ধ কাপ্তানকে এ-সময় ডেকে তোলা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হবেনা। বরং কাপ্তান বয়ের খোঁজে গেলে হয়, যথার্থ উপকার এসময় হবে হতে পারে। সে আরও কিছু ভাবছিল তখন চেরী ওর হাতটা পিছন থেকে ধপ

করে ধরে ফেলল। বলল, দোহাই স্মিত্র আমকে একা ফেলে যেও না। ভয়ানক ভয় করছে।

স্মিত্র ছোটমালোমের কথা মনে করতে পারল। প্রতিদিন ওয়াচের শেষে অথবা রাতের নিঃসঙ্গতায় ভুগে ভুগে এই দরজার ফাঁকে চোখ রাখার জন্য উপস্থিত। ছোট মালোম এই দরজায় হাত রেখে বলত, বোট ডেকে বড় স্তম্ভর রাত।

চেরী বলত, আমার শরীরটা যে ভাল যাচ্ছেনা ধাঁড়।

—আমরা এখন একটা নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, মাদাম।

—সেটা আমার দ্বীপের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী স্তম্ভর হবে না ধাঁড়।

চেরী কতদিন এমন সব কথা বলে প্রাণথুলে হাসত।—তোমাদের ধাঁড় আচ্ছা বেহায়া, স্মিত্র। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় কেবিনে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দি। বেচারী! চেরী ভয়ানক টলছিল। সে এখন এক হাত বাঁকে রেখে অন্য হাতে স্মিত্রের কলার চেপে বলছে, মাই প্রিন্স।

—মাদাম আপনি কি সব বলছেন!

—আমি ঠিক বলছি স্মিত্র। আমি ঠিক বলছি। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও স্মিত্র, নতুবা আমি জোরে জোরে চীৎকার করব। বলব, প্রিন্স প্রিন্স। একশবার বলব। সকলকে শুনিয়ে বলব। তুমি কি করবে? কি করতে পারছ?

ভয়ে স্মিত্র কাঁঠ হয়ে থাকল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বলল, চুপ করুন মাদাম, চুপ করুন। আপনার ঈশ্বরের দোহাই।

স্মিত্র দেখল কেবিনের পোর্টহোল খোলা। ফরোয়ার্ড পিকে কোন জাহাজী যদি এখন এইসময় ওয়াচে যায়, চোখ তুলে দেখলে ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে তাড়াতাড়ি পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করতে গিয়ে দেখল—ক্যালেক্টরটা উড়ছে। সে সন্তর্পণে পোর্টহোল দিয়ে মুখ কিঞ্চিৎ বার করে যখন দেখল কেউ এ-পথে আসছে না, বারোটা চারটার পরীদাররা সব এনজিন-রুমে নেমে গেছে এবং শেষ ওয়াচের পরীদারদের চীৎকার ল্টোকহোল্ড থেকে উঠে আসছে তখন দ্রুত পোর্টহোলের কাঁচ এবং লোহার প্লেট উভয়ই বন্ধ করে দিয়ে চেরীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল এবং বাৎলায় বলল, বেজা। তারপরের থিত্তী উচ্চারণ না করে মনে মনে হজম করে ফেলল। শেষে অভ্যস্ত ইংরাজীতে উচ্চারণ, মাদাম আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

—বোস স্মিত্র।

স্মিত্র পূর্বে এ-কেবিনে যে সংকোচ নিয়ে যে ভয় এবং মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বসত আজও তেমন দুহাতের তালুতে মাথাটা রেখে কেমন অসহায় ভঙ্গীতে বসে থাকল। সে এ-মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছে না। চারঘণ্টা ওয়াচের পর ক্লান্ত শরীরটাকে যখন ফোকসালে নিয়ে যাবে ভাবছিল, যখন স্নান সেয়ে শরীরের সকল ক্লান্তি, উত্তাপ দূর করবে ভাবছিল তখন চেরীর এই মাতাল ইচ্ছা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মত ক্রমশ ওকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

চেরী বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্নান সেয়ে নিতে পার স্মিত্র।

স্মিত্র যেহেতু একদা এইসব কেবিনের দেয়াল সাবানজল দিয়ে পরিষ্কার করেছে যেহেতু ওর সব জানা.....স্মিত্র স্মরণ উত্তর করছে না।

চেরী বাংক থেকে উঠে ওর পাশে বসল। বলল, মাই প্রিন্স। বলে স্মিত্রের কপালে চুমু দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লো। স্মিত্র উঠে দাঁড়াল এবং বলল, মাদাম আপনি পাগল।

চেরীর পা দুটো টলছে এবং চোখ দুটো তেমনি মায়াময়।

স্মিত্রের এই অপমানসূচক কথায় চোখ দুটো কেমন সজল হয়ে উঠল। নীচে এন্জিনের শব্দ। আরও নীচে সমুদ্র অতল থেকে যেন ফুঁসছে। চেরী বলল, আমি ভারতবর্ষে যাব স্মিত্র। তুমি নিয়ে চল। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিছনে নিয়ে কেবল ছুটবে, ছুটবে—কোথাও পালিয়ে যাবে।

চেরীর সেই রাজপুত্রের কথা মনে হল। সেই রাজকন্যার কথা মনে হল। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভা অতিক্রম করে দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। ঝাড় লঠন পরিত্যাগ করে আঁধারের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। মৃত্যুর বালর—, দ্বারীরা হাঁকছে অথচ নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে প্রতিবিম্ব রাজপুত্রের। সকলের অলক্ষ্যে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য প্রতীক্ষা করছে। চেরীর এইসব কথা মনে হলে বলল, তুমি পার না স্মিত্র, তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পার না!

স্মিত্রকে উদাস দেখে ফের বলল, পার না তুমি? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতবর্ষে?

মাতাল রমণীকে খুশী করার জন্য সে বলল, নিয়ে যাব।

—তোমার দেশের গ্রাম মাঠ দেখব স্মিত্র।

স্মিত্র সহজভাবে কথা বলতে চাইল।—ফুল দেখবে না? পাখী দেখবে না?

—ফুল দেখব, পাখী দেখব।

—আমার দেশের আকাশ দেখবে না? আকাশ?

—আকাশ দেখব, নক্ষত্র দেখব ।

—সাপ বাঘ দেখবে না ? সাপ বাঘ ? বিধবা বোঁ, যুবতী নারী ? এইসব বলতে বলতে স্মিত্র কেমন উত্তেজিত বোধ করছিল । সে মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমি সব দেখাতে পারি । কিন্তু দেখাব না । তুমি নেশায় টলছ । নিজের সম্বন্ধে সচেতন নও, স্মতরাং সব দেখালে অনায়াস হবে ।

প্রথমটায় চেরী ধরতে না পেরে বলল, কি বললে ? চেরীর চোখ দুটো তার-পর সকল ঘটনার কথা বুঝতে পেরে ছোট হয়ে এল ।—কাপুরুষ ! চেরী স্মিত্রের মুখের কাছে এসে কেমন একটা ধ্ব শব্দ করে দরজার পাট সহসা খুলে দিলে । গেট আউট, ইউ গেট আউট ! এমন চীংকার শুরু করল যে স্মিত্র পালাতে পারলে বাঁচে । স্মতরাং স্মিত্র ছুটতে থাকল । সে ডেক ধরে ছুটে এসে পিছিলে উঠে দেখল পরীদারেরা সকলে যে-যার মত ঘুমিয়ে পড়েছে । সে এইসব কথা গোপনে লালন করে দীর্ঘসময় ধরে মেয়েটির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুঃখবোধ করল ।

তখন চেরী পোর্টহোলের প্লেট খুলে দিল । কাঁচ খুলে দিল । সে শরীরটাকে বাংকে এলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এমন সময় দরজায় শব্দ, কড়া নাড়ছে কে যেন । ধীরে ধীরে এবং সন্তর্পণে । অথবা চোরের মত । সে বুঝতে পারছে—কারণ চট করে শরীরের মাতাল ভাবটা কেটে গেছে পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এবং নিজের বেলাল্লাপনার রেশটুকু ধরতে পেরে লজ্জিত, কুণ্ঠিত । সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজায় সামনে । বলল, কে ?

—আমি মাদাম ।

—আপনি কে ?

—আমি থার্ড ।

—আজ তো আকাশে নক্ষত্র নেই । আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি । এইসব কথার ভিতর চেরীর মাতাল মন ধীরে ধীরে যেন স্নান হচ্ছে । এতক্ষণ প্রায় সে সকল বস্তুকে দুটো অস্তিত্বে দেখছিল—দুটো ক্যালেন্ডার, দুটো লকার, চারটা বাংক এবং এমনকি স্মিত্র পর্যন্ত দুটো অস্তিত্বে ওর পাশে বসেছিল । পোর্টহোলের ঠাণ্ডা হাওয়ার সব কিছুই মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে । যেন সবই এখন এক অখণ্ড বস্তু । তবু থার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, চলুন কাপ্তানের ঘরে । রাত দুপুরে কেমন জ্বালাভন করছেন টেরটি পাবেন ।

—এতক্ষণ মাদাম, দয়া করে আপনার কেবিনে কে ছিলেন ?



চেরী বিক্রপ করে বলল, কেন আপনি নিজে। তারপর দরজাটা মুখের উপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু স্মিত্র নিজের বাঁকে বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। স্মিত্রের মনে পড়ল মাতাল রমণী যদি দরজা খুলে শুয়ে থাকে, যদি থার্ড সেই ফাঁকে বেড়ালের মত সস্তর্পণে ঢুকে পড়ে এবং চুরি করে চেটে চেটে মাংসের স্বাদ নিতে নিতে যদি... ভাল নয়, ভাল নয় সব—এমত ভেবে সে ডেকের উপর উঠে এল। কাপ্তান-বয়ের দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, চাচা, অ চাচা একটু উঠুন।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয়ের সারাদিন পরিশ্রমের পর এই বিশ্রামটুকু একান্ত নিজস্ব। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্মিত্রাং দু এক ডাকে সাড়া পেল না স্মিত্র। স্মিত্র বার বার ধীরে ধীরে ডাকল, চাচা, অ চাচা। সে জোরে ডাকতে পারছে না কারণ পিছনে মেশরুম মেট্র এবং মেশরুম বয় থাকে। তারপর এন্জিনের স্কাইলাইট পার হলে ফানেল। ফানেল অতিক্রম করে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার, যা ঘরে কাপ্তানের ঘরে উঠে যাওয়া যায়। জোরে ডাকাডাকি করলে বৃদ্ধ কাপ্তানের ঘুম পর্যন্ত ভেঙ্গে যেতে পারে। স্মিত্রাং ধীরে ধীরে সে কড়া নার্ভে থাকল।

বৃদ্ধ কাপ্তান-বয় এক সময় দরজা খুলে বলল, চেরীর দরজা বন্ধ করে আসুন চাচা। মদ খেয়ে ভয়ানক মাতলামি করছে।

তাড়াতাড়ি কাপ্তান-বয় গায়ে উর্দি চাপিয়ে নীচে ছুটল। গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। কাজেই সে ধীরে ধীরে ঠেলে দেখল—দরজা খোলা এবং খুলে যাচ্ছে। চেরী বাঁকের উপর বসে ক্যালিগারটা দেখছে নিবিষ্ট মনে। কাপ্তান-বয়ের কোন আওয়াজই চেরী যখন শুনতে পাচ্ছে না তখন দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। কিন্তু কি ভেবে ঘরের ভিতর ঢুকল কাপ্তান-বয়। টিপয়ে থাবার জল রাখল, তারপর পিতৃহ্বের ভঙ্গীতে বলে উঠল, মাদাম, শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে। এখন প্রায় একটা বাজে।

চেরী বড় বড় হাই তুলছে। সে কষলটা নীচে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কাপ্তান-বয় দাঁড়িয়েছিল—চেরী কাত হয়ে শুয়ে ক্যালিগারটা দেখছে। ওর পোষাকের গাঢ় রঙের ভাঁজ এখন আর নেই। চোখে অবসাদের চিহ্ন। কেমন এক অজ্ঞানতাবাব ওর সমস্ত অবয়বে। কাপ্তান বয় কষলটা ওর শরীরের উপর বিছিয়ে দিয়ে বাইরে এল। দরজা টেনে সস্তর্পণে তালা মেয়ে দিল। ডেকে বের হয়ে দেখল ঠাণ্ডা স্মিত্র তখনও পায়চারী করছে।

কাপ্তানবর কাছে এসে বলল, দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলাম।

—ধাক বাঁচা গেল। এইটুকু বলে স্মিত্রি পিছিলের দিকে উঠে যেতে থাকল।

ভোরবেলায় জাহাজীরা সাবানজল নিয়ে কেবিনের দেয়াল ধুতে অথবা কলকল বেষ্টে নীচে নেমে অদৃশ্য হতে চাইছে। তখন চেরী বিছানায় উঠে বসল। দরজা বন্ধ দেখল। সে গতবাতের কিছু কিছু ঘটনাব কথা স্মরণ করতে পাবে। স্মিত্রি জাহাজী স্মিত্রির প্রতি চেবী বসতে ইচ্ছা হল, গতবাতের ঘটনার জন্ত আমাকে ক্ষমা কর স্মিত্রি। এই জাহাজ, সমুদ্রের ভয়ানক নিঃসঙ্গতা এবং তোমার পাথরের মত শরীরের স্থিতি অথবা অচঞ্চল উপস্থিতি আমাকে নিয়ত তীব্র তীক্ষ্ণ কবছে। আমাকে অস্থির, চঞ্চল করছে। অথচ তুমি কখনও পুতুলের মত শরীর নিয়ে, কখনও একান্ত বশব্দেব চিহ্ন শরীরে একে আমার কেবিনে সময়, কাল অতিক্রম করার হেতু আমি ক্রমশ এক অস্থি নিয়তির ইচ্ছায় কালক্ষয়ের বাসনায় মগ্ন। কৈশোরের স্বপ্ন তোমার অবয়বে কেবল রূপ পাচ্ছে। আমার প্রিয়তম ধীপে এমত ঘটনা ঘটলে কি হ'ত জানি না, 'আমার বাবা বর্তমান—তিনি আমাকে কি বলতেন জানি না এবং তোমার উপস্থিতি সহসা আমাকে অন্ধকারে নিদারুণ চঞ্চলতার জয়দানে আমার সম্মানিত জীবনকে বিব্রত করে কেন জানি না, তবু তুমি কখনও এই কেবিনে এসে দাঁড়ালে আমি অধোবদনে লজ্জিত থাকব। তারপর আয়নায় চেবী মুখ দেখে উচ্চারণ কবল—গতবাতের ঘটনার জন্ত তুমি আমার ক্ষমা করো স্মিত্রি।

রাতের বিড়ম্বনার জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণে, স্মিত্রি ভোর রাতের দিকে শরীরে ভীষণ ব্যথা অনুভব করতে থাকল। পাশের বাঁকে অনাদি নাক-ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওব যেহেতু চারটা আটটা পরী, যেহেতু একুণি তেলমালা হাকিজদি ওকে এসে ডেকে তুলবে সুতবাং জল ডেপ্টাতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে ওকে ডাকা ভাল।

স্মিত্রি ডাকল, অনাদি, ও অনাদি। একটু উঠে জল দে ভাই।

এই রাতে জল চাওয়ার অনাদি আশ্চর্য হল। সে বলল, উঠে খেতে পারিসনা!

—দরজা ভয়ানক কষ্ট।

—কেন কি হল!

—মনে হয় জর এসেছে।

অনাদি তাড়াতাড়ি উঠে কপালে হাত রেখে দেখল জরে স্মিত্রির শরীর পুড়ে

যাচ্ছে। সে জল দিল স্তমিত্রকে এবং শরীরটা টিপে দেবার সময় বলল, রাত  
একটা পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলিরে ?

স্তমিত্র উপরের দিকে হাত তুলে দেখাল।

—কি কবছিলি ?

—চেরীকে পাহারা দিচ্ছিলাম।

—চেরী তোকে কিছু বলেছে !

—না।

—জাহাজের একঘেষেমী তোর কাটছে ভাল।

স্তমিত্র জবাব দিলনা। চূপ করে অনাদিকে দেখতে দেখতে স্তমিত্র কেমন  
অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ভোরের দিকে সারেঙ ঘরে ঢুকে বলল, কিরে বা অস্থ বাধাইছ !

—না, তেমন কিছু নয় চাচা। মনে হয় হু গোছের কিছু। মেজ মালোমের  
কাছ থেকে একটু ওষুধ এনে দেন চাচা।

সারেঙকে চিন্তিত দেখাল। ওর পরী কে দেবে এখন এমনতই কোন চিন্তা যেন  
সারেঙের মনে। স্মৃতরাং সে একজন ফালতু আগওয়ালাকে ডেকে স্তমিত্রের পরী  
দিতে বলে গেল এবং যাবার সময় বলে গেল—পরীতে স্তমিত্রের আজ যেতে হবেনা  
এবং এখন কোন কয়লায়ালাকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। এমন  
কথাও জানাতে পেরে সারেঙ যেন খুশী। তবে স্তমিত্র যেন ডেকে উঠে কের ঠাণ্ডা  
না লাগায়, বেশী হাঁটাইটি না হয় সেজন্য সারেঙ শাসনের ভক্তিতেও কিছু কথা বলে  
গেল। বিশেষত, ভাতের জন্য ভাগুরীকে পীড়াপীড়ি করলে নির্ঘাত পরী দিতে  
হবে এইসব কথার দ্বারা সারেঙ সকলের উপরে, সেই জাহাজের সব খালাসীদের  
দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এমন এক ধারণার ভিত্তিতে সারেঙ মেজ মিত্রির মত ডেকের  
উপর দিয়ে হেঁটে গেল—যেন এনজিনিয়ার হাঁটছে ডেকে।

স্তমিত্র শুয়ে ছিল, সে পরীদারদের ওঠানামার সঙ্গে ধরতে পারছে, এখন কটা  
বাজে। পোর্টহোল খোলা ছিল, কিন্তু সে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে না। উপরের ঘরে  
ট্যাঙেলের তামাক কাটার শব্দ ভেসে আসছে। পাশের কোকসালে কোন জাহাজী  
এখন নামাজ পড়ছে। তা ছাড়া সমুদ্রে ঢেউ একটু বেশী আজ। জাহাজটা  
কিঞ্চিৎ বেশী দুলছে যেন।

মুখটা ওর বিশ্বাস লাগল। সে এক মগ চায়ের জন্ত প্রতীক্ষা করছে এখন।  
ভাগুরী এক মগ চা এনে দিলে ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে কঞ্চল সমস্ত শরীরে

ঢেকে পড়ে থাকবে—তারপর যদি ভীষণভাবে ঘাম হয় শরীরে তবে নিশ্চয়ই শরীরটা ঠাণ্ডা হবে এবং অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ থেকে সে মুক্তি পাবে।

চেরী কেবিনে বসে চা-এর সঙ্গে স্ট্রাওউইচ, কিছু ফল এবং মাখনের স্বাদ এতবার চেখেও যখন তৃপ্তি পেল না, যখন আটটা বারোটার পরীদাররা সকলে নেমে গেছে ধীরে ধীরে অথচ স্তমিত নামছে না—দূরে সমুদ্রের বুকে সূর্যের স্নান আলো তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে এবং তরঙ্গ সকলকে আলোকিত করছে; কিছু উডোকা মাছ তেমনি ঝাঁক বেঁধে সাঁতাব কাটছে, ছোট মালোম দূরবীণে আকাশ এবং সূর্যের অবস্থান প্রত্যক্ষ করছেন তখন চেরীর মনে হল ডেক ছাদের ছায়া ধরে একটু হেঁটে এই জাহাজের রেলিঙে ভব করে স্নান এবং শান্তিকে খুঁজলে হয়। সমুদ্রের উপর জাহাজের প্রাপেলার জল কেটে যাচ্ছে, জলে ফসফরাস জ্বলছিল—সূর্যের স্নান আলোর অন্ত সে কিছুই দেখতে পারছে না। অন্ধকার থাকলে এখন যেন ভাল হত। ফসফরাস জ্বলছে, এইসব দেখে গতরাতে মত ঘোর উত্তেজনায় ভুগতে পারত। রাতের নিঃসঙ্গতায় এখানে চেরী কতবার এসে ভর করে দাঁড়িয়েছে। রেলিঙে খুঁকে ফসফরাস জ্বলতে দেখেছে। কখনও স্তমিত থাকত, কখনও থাকত না। একদিন সে স্তমিতকে খুঁজি করার জন্য বলেছিল নেমে সোজা আমাদের প্রাসাদে গেলেনা কেন? স্তমিত তুমি...তুমি...। স্তমিত এই সময় কোথায়! ডেক সারেঙ এক নম্বর কক্ষার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। জাহাজীবা সাবানজল নিয়ে মাস্টের উপর উঠে হাসি ঠাট্টায় মসগুলা। চেরী তখন ডাকল, সারেঙ, সারেঙ।

ডেক সারেঙ দৌড়ে এলে চেরী বলল, স্তমিত কোথায়? সে তো এখনও নীচে নামেনি। ওর তো আটটা-বারোটা ওয়াচ।

সারেঙ জবাব দিল, মাদাম ওর অনুস্থ হয়েছে।

চেরী অবিবাসের ভঙ্গীতে বলল, যাঃ!

—জী মাদাম। অপনাকে আমি মিথ্যা বলতে পারি?

—ওকে কে দেখানুনা করছে?

—কে করবে মাদাম? সময় তো কারো হাতে নেই। সকলেই কাজ করছে।

ও জ্বর কাতরাচ্ছে।

—তোমরা ওকে দেখতে পার না! জ্বর হয়েছে...একলা ফেলে ::

—তা দেখি, মাদাম। সারেঙ নিজের দোষ কাটাবার জন্য বলে গেল, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মাদাম। এন্জিন-সারেঙ মেজ মালোমের কাছ থেকে ওষুধ এনেছে।

তারপর চেবীর মনে পড়ল এই মালবাহী জাহাজে সেবা গুস্তার কোন ব্যবস্থা নেই। জাহাজীদের অল্প ভাল ওষুধ নেই। কোন ডাক্তার নেই। সাধারণ রকমের অসুখে মেজ্র মালোমই ওষুধ দেন। সাধারণ রকমের অসুখে প্রয়োগ করার মতো কিছু ওষুধপত্র এই জাহাজের কোন এক প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত আছে। কাপ্তানের উপর, কোম্পানীর উপর চেবীর রাগ ক্রমশ বাড়তে থাকল। অথচ চেবী কোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। গতরাতের ঘটনাসকল চেবীকে সঙ্কচিত করছে। যেন এই মুখ স্মিত্রকে দেখানো চলে না। যেন স্মিত্রের কোকসালে ঢুকলে—সে হুঃখবোধ করতে পারে। গতরাতের হুঃসহ অপমানের কথা নিশ্চয়ই সে ভুলে যায় নি। স্মিত্রাং, স্মিত্রাং কি ভেবে চেবী নিজের কেবিনে ঢুকে কিছু কল তুলে নিল হাতে এবং কাপ্তান-বয়কে ডেকে বলল, যাও, স্মিত্রের কেবিনে এই কলগুলি রেখে এস। কিছু বললে বলবে, বাটলাব দিয়েছে। অল্প কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় দরজার চৌকাঠ পার হলে চেবী বলল, জব কত এবং কেমন আছে দেখে আসবে।

কাপ্তান-বয় অ্যালওয়েতে হাঁটছিল এবং স্তনতে পাচ্ছে, ওকে বেশী নড়াচড়া করতে বারণ করবে। মনে থাকে যেন, অন্য কোন কথা বলবে না।

কাপ্তান-বয় খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে। কারণ তখনও চেবী নানারকমের নির্দেশ দিচ্ছে।—কখন গায়ে না থাকলে দিয়ে দেবে। কাপ্তান-বয় সব স্তনে হাসল। বস্তত চেবী আভিজাত্যবোধে কোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। কাপ্তান-বয় বুঝল, চেবীর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ডেকহাদের নীচে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল—দূরে কেবিনের দরজাতে ভর করে চেবী অপলক চোখে কাপ্তান-বয়ের মুখে কোন খবরের প্রতীক্কাতে মগ্ন। কাপ্তান-বয় এবার সঙ্কর ছুটে গেল। কারণ ওরও চেবীর হুঃখবোধে মনের কোণে এক স্নেহস্বলভ ইচ্ছার রঙ করুণ হয়ে উঠছে।

সিঁড়ি ধরে নামছিল কাপ্তান-বয়। নীচের কোকসালগুলি সবই প্রায় খালি। কিছু কিছু জাহাজী ডেকে হল্পা করছে। ওরা বেশের গল্পে, বিবিদের গল্পে মসগুল। প্রতিদিনের মত কলক্কা বেঁধে কেউ কেউ জাহাজে রঙ করছে। কাপ্তানবয় প্রতিদিনের এইসব এক্ষেয়েমি দৃশ্য দেখতে দেখতে নীচে নেমে গেল। স্মিত্রের শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রাখল। ডাকল, স্মিত্র, স্মিত্র ওঠ বাবা।

এইসময় ঠাণ্ডা হাত উত্তপ্ত কপালে—স্মিত্রের মনে হল বড় প্রীতিময় এই

আহাজীনের সংসার। দীর্ঘদিনের সফবে কাপ্তানবয়কে আপনজনের মত করে দেখতে গিয়ে চোখে জল এল।

সে ডাকল, চাচা!

—কেমন আছ?

—শরীরটা বড় ব্যথা করছে।

—একটু হুনজল এনে দেব? গরম জল?

—গরম জল ভাগুরী দিয়েছে।

—কি খেলে?

—কিছু না। ভাবছি ভাত খাবনা। শবীরটা খুব ঘামছে। মনে হয় ভাল করে ঘাম হলে শরীরটা খুব ঝরঝরে হবে।

যখন কাপ্তান-বয় দেখল শরীরে কোন উত্তাপ নেই এবং যখন বুঝল হু গোছের কিছু হয়েছে তখন আর বেশী দেরী করল না। পকেট থেকে আপেলগুলি বের করে দিয়ে বলল, নাও রাখ। খাবে। কি খেতে ভাল লাগে বলবে। বিকেলে এনে দেব। সুমিত্রকে একটু বিস্মিত হতে দেখে বলল, বাটলার দিয়েছে। বড় বড় চোখে তাকাবার মত কিছু হয়নি।

সুমিত্রের শরীরে কঞ্চল টেনে দিয়ে কাপ্তান-বয় বাইরে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি ধরে উঠছে। সুমিত্র শুয়ে শুয়ে উপরে কাপ্তান-বয়ের জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে শুনতে পেল। ওর পোর্টহোলটা খোলা নেই। খোলা থাকলেও সে আকাশ দেখতে পেতনা। মাল বোঝাই আহাজ। সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে পোর্টহোলটাকে ঢেকে ফেলছে। সমুদ্রের এই জল দেখে গতরাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে সুমিত্র। চেরীর যৌন ইচ্ছা এবং প্রগলভতা ওর মনে এখনও কামনার জন্ম দিচ্ছে। অথচ সে পারছে না। বার বার এই আত্মঘাতী ইচ্ছা ওকে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে, রাতে চেরীর কেবিন থেকে কিরে এসে এই কোকসালে দীর্ঘসময় পায়চারী করেছে এবং সকল দগ্ধ যৌন ইচ্ছার প্রতি উদ্বা প্রকাশের জন্য বার বার আহাজীসুলভ খিতি করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছে।

কিন্তু বিকালে সুমিত্রের জরটা থাকল না। বাথকে বসে সে—শরীর এখন নিরাময় নিরন্তর এই বোধে খুশী। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে একটি বেঞ্চিতে বসল। সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শরীর প্রাণ বেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে এবার ধীরে ধীরে চারনব্বর কক্ষা অতিক্রম করে ডেকহাউসের নীচ দিয়ে এলঙয়ে পথটাকে দেখল—সেখানে কোন পরিচিত মুখ ভেসে উঠেছেনা। সেই মুখ, নরম ষাড় আর তার

কোমল মন স্নুমিত্রের নিঃসঙ্গ এবং পীড়িত শরীরের জন্য বড় প্রয়োজন। এবং গভীরাতের বেশ্যা এই শব্দটি শ্রানিকর স্নুতরাং উচ্চারণে কিঞ্চিৎ সংযত হওয়া প্রয়োজন। তারপর এই মুহূর্তে নিজেকে ছোটলোক ভেবে কোড থেকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়া গেলে মন্দ কি? চেবী ব মাতাল মৌনেচ্ছাতে সমুদ্রের নেশা ছিল। ওর ঘরে পিতৃ অবয়ব অনেক দূরের যাত্রির মত এবং এই জন্যই বুঝি সমুদ্রের টেউ অথবা আকাশ দেখতে দেখতে একটু প্রেম কবা চলে—ভালবাসলে ক্ষতি নেই তারপর রাত যদি ঘন ঘন শরীরেব রমণীয়তায় তন্ময় কবে বাধে, যুক্ত করে রাখে তবে বিষকাবী জানোয়ারেব মত ইতর হবার প্রয়োজন কোথায়! সে ভাবল, স্নুতরাং আজ বাতে চেরীর দরজাব পাশ দিয়ে একবার হেঁটে যাবে। এবং গৃহ-প্রবেশের দিনে গিন্নিমার মত একবার ঘোনসংযোগ ঘটাবে—এই নিরন্তর ইচ্ছার জন্য সে এবার ডাকল—ভাণ্ডাবী-চাচা আমাকে একমগ চা দিন।

ভাণ্ডারী উঁকি দিল গ্যালী থেকে। জাহাজীরা ঘরে ফেরাব মত একে একে সকলে পিছিলে জমছে। ওদের হাতে রঙেব টব ছিল। ওরা হাতের রঙ কেরোসিন তেলে মুছে দিচ্ছে। ওরা এবার স্নান করবে। নামাজ পড়বে এবং আহ্বার করবে বা সমুদ্র কাজ সেবে ওরা গিয়ে বেষ্টিতে বসে ন্যাকারজনক কথাবার্তায় ভুবে ভুবে জল খাবে। স্নুমিত্র ওদেব সকলকে দেখল। ওরা সকলে ওকে এক প্রশ্ন করল, তোমার শরীরটা ক্যামন আছেবে ব। এইসব বলে ওবা কোকসালে নেমে গেলে ভাণ্ডাবী বলল, চা কড়া করে দেব?

—ভাই দাও।

স্নুমিত্রের এখন আর কিছু করণীয় নেই। স্নুতরাং পা ঝুলিয়ে বসে থাকল। শরীরে সমস্ত দিনের সঞ্চিত শ্রানি এই সমুদ্র এবং এক কাপ চা দূর করে দিল। সে এবার জাহাজের অলিগলি না খুঁজে সোজা দিগন্তে নিজের দৃষ্টিকে নিযুক্ত করে তার দেশ বাড়ীর চিন্তা—সেখানে কি মাস, কি ফুল ফুটেছে অথবা কোন ঋতু হতে পারে দুর্গাপূজাব সময় হতে কত দেবী, শেকালী ফুল ছড়ানো উঠোন অথবা বৃষ্টি বৃষ্টি... এবং জাহাজে থেকে থেকে বাংলা দেশের মাস কালের হিসাব ভুলে গেল স্নুমিত্র। অথবা এইসব চিন্তার দ্বারা দেশের আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য আঁকু-পাঁকু করতে থাকল স্নুমিত্র।

ডেক সারেঙ বলল, ভবিষ্যত কেমন?

—ভাল, চাচা। জরটা মনে হয় সেরে গেছে।

—কি খেয়েছিলে?

—চপাটি খেলাম চাচা।

—ভাল করেছ।

—রাত্রে দেখি বাটলারকে বলে একটা পাউরুটি সংগ্রহ করতে পারি কি না।

অনাদি উঠে এল পিছিলে। সে বলল, এখানে বসে শরীরে ঠাণ্ডা লাগানো হচ্ছে ?

—একুনি নেমে পড়ব। বলে, সুমিত্র অনাদিকে অনুসরণ করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। সারেঙের ঘবটা অতিক্রম করে ষ্টোর রুমের পাশের নির্জন জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে সুমিত্র ডাকল, অনাদি !

—কিছু বলবি ?

—তুইতো সারাদিন পাঁচ নম্বরের সঙ্গে ডেকে কাজ কবছিলি ?

—হ্যাঁ তা করছিলাম।

—চেরীকে ডেকে বের হতে দেখলি না ?

—না। তবে এলওয়ে ধরে আসবাব সময় দেখলাম চেরী বিছানায় শুয়ে আছে।

—কিছু কবছে না ?

—ঘবটা অন্ধকাব। দরজা জানালা সব বন্ধ কবে রেখেছে।

—সুতরাং ভাল যত দেখিসনি !

—না।

সুমিত্রকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আশাহত। অনাদি নিজের কোকসালে চলে গেল এবং পিছনে এসে এ-সময় কাপ্তান বয় ডাকল, সুমিত্র এই নাও তোমার বিকাল এবং রাতের খাবার। বাটলার দিয়েছে।

—চাচা, বাটলার এত সদয় কেন আমার প্রতি ?

—তা আমাকে বললে কি হবে ! বরং বাটলারকে জিজ্ঞেস কর। একটু খেমে বলল, তোমার শরীর এখন কেমন ?

—ভাল চাচা।

—বেশী নড়বে না। এ-জর কিন্তু খুব ধারাপ। আবার কিরলে অনেক ভোগান্তি হবে। বলে চলে যাবার জন্য উজোগ করলে সুমিত্র কেমন সঙ্কোচের সঙ্গে ডাকল, চাচা।

কাপ্তান-বয় মুখ কিরিয়ে বলল, কি !

—চেরী আমার যে শরীরটা ধারাপ করেছিল, জানে ?

—তা আমি কি করে জানব বাপু।



—তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি !

—না। আমি কতক্ষণ থাকি ওর কাছে ? কাপ্তান-বয়্র আব দাঁড়াল না। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র কোকসালে ঢুকে ফের বাংকে গুয়ে পড়ল। শরীরটা বেশ দুর্বল মনে হচ্ছে। গতরাতের ঘটনাগুলো ওকে এখনও যেন যন্ত্রণা দিচ্ছে। অথচ একবার চেরীর কেবিনে যেতে পারলে সব দুর্ঘটনার যেন অবসান হত। তবু সে নিজের শরীরে কখন টেনে পাশ কবে গুয়ে থাকল। নির্জর্নতায় ভুগে কেমন বিশ্বাস বিশ্বাস সব। অনাদি পাশের বাংকে গুয়ে বকবক করছে ছোট টাগুলের সঙ্গে। এইসব কথা এবং যৌন আলাপ শুনে ভাল লাগছে না। কোকসালের সর্বত্র একই জৈব-ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মুসলমান বৃদ্ধ পুরুষসকল অযথা বদনা নিয়ে বারবার এই ঠাণ্ডা দিনেও গোসলখানায় ঢুকে স্নান করছে এবং আল্লা আল্লা করছে।

কোকসালে কোকসালে এখন অন্ধকার। এবং সন্ধ্যা অতিক্রম করছে বলে সকলে আলো জ্বলে দিল। কিন্তু সুমিত্রের এই আলো ভাল লাগছেন। আলোটা ওর চোখে লাগছে। সে অনাদিকে আলোটা নিভিয়ে দিতে বলল। এবং এই অন্ধকার এখন ওকে গ্রাস করছে। রাত বাড়ছে। কোকসালে কোকসালে জাহাজীরা ভীড় করে আছে। ওরা এবার উপরে উঠবে। ওরা রাতের আহাৰ শেষ কবে আবার নীচে নেমে আসছে। তারপর গুয়ে অযথা একটার পর একটা বিড়ি টেনে কখনও সুখটান, কখনও বাড়ীতে বিবির মুখ শবীর এখন এই রাতে কোন ভকীতে অবস্থান করছে এবং ঘরে ফিরে বিবির শরীরটা কত প্রকার যৌনস্বপ্নের আধার হতে পারে সেটা যেন পরখ করে দেখাব বাসনা।

সুতরাং সুমিত্র দীর্ঘসময় এই বাংকে বিশ্বাসের গন্ধ নিয়ে পড়ে থাকতে পারছেন। রাত যত বাড়ছিল, ঘন হচ্ছিল তত শরীরের দুর্বলতা যৌনস্বপ্নকে আবেগমণ্ডিত করছে। এবং যখন দেখল কোকসালে কোকসালে ডেক জাহাজীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এন্জিন অথবা ডেক সারেঙের ঘরে আলো জ্বলছেনা তখন ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি ধরে চোবের মত পা টিপে টিপে উপরে উঠতে থাকল।

ডেকে উঠতেই শীত শীত অনুভব করল সুমিত্র। অষ্ট্রেলীয় উপকূলের যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত শীতটা যেন বাড়ছে। তত সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে আসছে। আজও সে ডেকে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। মাস্টার আলোগুলি ভুতের মত রাতের আঁধারে ছলে ছলে পায়চারী করছে। ব্রীজে ছোটমালোম পায়চারী করছেন ; ওঁর এখন ওয়াচ নিশ্চয়ই। সুমিত্র আড়াল থেকে দেখল সব এবং খুশী হল।

ছোটমালোম পাশের কেবিনে থাকেন। স্তূতরাং চেরীর কেবিনে কোন শব্দ হলে পোর্টহোল দিয়ে উকি মারতে পারেন। সে উত্তেজনায় দাঁড়াতে পারছিল না, চুলোয় থাক ছোটমালোম—সে ছুটে এলওয়ে পথে ঢুকে গেল। এবং চেরীর দরজার উপর ভর করে ছোট ছোট আওয়াজে ডাকতে থাকল, মাদাম, মাদাম ! আমি এসেছি। দরজা খুলুন ! যেন বলার ইচ্ছা, আমি যথার্থই কাপুরুষ নই। আপনাকে বেশা ব'লে নিরস্তর আমি দম্ব। আমরা সকলেই উন্মূনেব তাপ চুরি করে শবীর গরম করছি। আপনি দরজা খুলুন মাদাম।

চোরের মত স্তুমিত্র কড়া নাড়তে থাকল। রাত বলে এন্জিনের আওয়াজ প্রকট। স্তূতরাং এখন কেউ স্তুমিত্রের কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাবে না। কেউ এদিকে এলে সে এন্জিন রুমে নেমে যাবার মত ভান করে দাঁড়িয়ে থাকবে। বড মালোমের ঘর পর্যন্ত খোলা নেই। সে আবার কড়া নাড়তে থাকল এবং এ-সময়েই দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। চেরীব পায়ের শব্দ ভিতরে। চেরী দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, কে ?

—আমি স্তুমিত্র, মাদাম। সে আর কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। সে উত্তেজনায় অধীর। শরীরের প্রতি লোমকূপে সমস্ত দিন ধরে উত্তাপ সঞ্চিত এবং যেন ভোরের ক্লাস্তি সকল উত্তাপকে এখন ফের অবসর কবতে চাইছে। সে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত গা গুড়ে যাচ্ছে। গলা ভয়ে শুকনো, কাঠ। সে কোনো রকমে গলা ঝেড়ে আবার ডেকে উঠল, মাদাম, আমি স্তুমিত্র।

দরজা খুললে চেরী দেখতে পেল স্তুমিত্র দরজায় দাঁড়িয়ে ঘামছে। এই শীত-শীত রাতেও এমত ঘাম স্তুমিত্রের মুখে শরীরে সর্বত্র। কেবিনের আলোয় মুখের বিন্দুসকল ঝলমল করছে। স্তুমিত্রের চোখের নীচে কালি পড়েছে; বিশেষ করে গত রাতের সেই যুবকটিকে খেন আর চেনাই যাচ্ছেনা। চেরী এবার স্তুমিত্রের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল। পাখা খুলে দিয়ে বলল, বোস। ইজিচেয়ার ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল চেরী। তারপর ধীরে স্তুমিত্র বাংকে বসে বলল, এত রাতে !

স্তুমিত্র চেরীর কণ্ঠে গতরাতের কোন ইসারাকেই খুঁজে পেল না। এতরাতে ! এই শব্দ দ্বারা চেরীর আভিজাত্য বোধ অথবা প্রথম বারের অভিযোগের মত... তুমি কেন এই কেবিনে, কি ইচ্ছা শরীরে মনে কাজ করছে, তুমি আমার মাতাল রমণী ভেবে থাকলে... অসহ্য। এবং আতঙ্ক স্তুমিত্র চোখ তুলে তাকাতেই দেখল—হুই ঠোটে চেরীর ফুল ঝরছে। এইসব দেখে স্তুমিত্রের বলতে ইচ্ছা হল, মাদাম আপনি প্রসন্ন হোন। আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করবেন না। ঘুম গভীর হওয়ার জন্য

চোখ আপনার ভারি ভারি। মুখটা বেশ ভরে উঠেছে। আজ গতরাত্তরের মত চেপে যাওয়া নয়। চেরী বিছানা থেকে উঠে প্রসাধন করেনি বলে মুখে কোন কৃত্রিমতার চিহ্ন নেই। বিশেষ করে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিলে চেরীর চুল উড়তে থাকল। মুখ সমুদ্রের হাওয়াতে তাজা আপেলের মত গন্ধ ছড়াতে থাকল। আর তখনই চেরী স্নুমিত্রের একটা হাত নিজের হাতে স্থাপন করে...কি হচ্ছে মাদাম, আমি যে আর পারছি না। আপনি স্পষ্ট হোন গত রাতের মত, আমি কাঁপছি, জ্বরে নয় আবেগে। চেরী ওর হাতের নাড়ী দেখল এবং হাতটা পূর্বের মত যথাস্থানে স্থাপন করে বলল, জ্বর নেই। স্নুমিত্রের মুখ চোখ নৈরাশ্যবোধে পীড়িত হতে থাকল। যেন বলার ইচ্ছা ছিল, এই দেহ নিয়ে আজ আপনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন অথবা শরীরে সংস্থাপন করে কোলাহল পূর্ণ জীবনের কোন কালকে অমৃতময় করে রাখতে পারেন—আমার কোন আদর্শ নেই, আমি জাহাজী.. তখন চেরী সহসা ওর পায়ের কাছে নেমে হাঁটুগেড়ে বসল। বলল, গতকালের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত স্নুমিত্র। মদ খেয়ে আমি বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। তারপর চেরী কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে থাকল। অঞ্চ তখন সমুদ্রে কোন তরঙ্গ উঠছে না। স্থির। কোন আবেগ চেরীকে মথিত করছে না। চেরী পাশের বাংকে উঠে যাচ্ছে এবং সমাজবদ্ধ জীবের মত ব্যবহারে কিশিৎ সমীহ। সে বলল, রাত জেগে থাকলে শরীর বেশী খারাপ করবে। বরং শুয়ে ঘুমাও।

—আমার শুতে ইচ্ছা হচ্ছেনা মাদাম। ঘুম আসছেনা।

—শরীরে কোন ঘঙ্গণা হচ্ছে না তো ?

—মাদাম!

—কিছু বলবে ?

চেরী দেখল স্নুমিত্রের চোখ দুটো জ্বলছে। সমস্ত শরীর থেকে কামনার আবেগ গলে গলে পড়ছে। স্থিরভাবে তাকাতে পারছে না—যেন অবসর সৈনিক কুয়াশার অন্ধকার থেকে পথ খুঁজে খুঁজে অবিরাম হেঁটে হেঁটে কোন আশ্রমে উপস্থিত। পানীয় জলের মত যুবতীর চোখ এবং উদগ্র বাসনা নিরন্তর ভোগাচ্ছে। সে ফের ডাকল, মাদাম আপনার শরীর ভাল তো ? স্নুমিত্র নিজের উপরে এবার যত রাগ—সে যথাযথভাবে বলতে পারছেন, রাতে এ-ঘরে শয়ন করার বাসনা মাদাম, কাপুরুষোচিত সমস্ত চিহ্ন মুছে কেলতে চাই। কিন্তু সে শুধু বলল, আপনি কুল ভালবাসেন মাদাম ?

—ভালবাসি স্মিত্র ।

—পাখী ?

—পাখী ভালবাসি ।

—আমার ফুল, পাখী কিছুই ভাল লাগছেনা মাদাম ।

—কেন, কেন !

—কি জানি । এই জাহাজ কেবল উচ্ছৃঙ্খল হতে বলছে ।

—স্মিত্র ! খুব দূর থেকে যেন চেবীব গলা ভেসে আসছে । গলা আবেগে কাঁপতে থাকল ।

—আমাকে কিছু বলবেন মাদাম ?

—তুমি উচ্ছৃঙ্খল হলে আমার যে কিছু থাকল না । নিজের সত্যি প্রমাণে চেরী যেন মরীয়া হয়ে উঠল ।

—না না । আপনি ভুল বুঝবেন না মাদাম । আমি যত্নের সঙ্গে সব পরিহার করে চলছি মাদাম । অথবা বলতে পারেন, চলার চেষ্টা করছি ।

—স্মিত্র, কখনও যদি সময় অথবা সুযোগ পাই আমি ভারতবর্ষে যাবই ।

—ভয়ানক গরীবের দেশ । রাজপুত্রেরা এখন ফুটপাথে হেঁটে বেড়াচ্ছে মাদাম ।

চেরী নিজেও তার ইচ্ছার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারছে না । এক কৃত্রিম আদর্শ উভয়কে সঙ্কুচিত করে রাখছে । অথবা এও বলা যেতে পারে, চেরী ব্যবহারে কেবলই মাতৃসুলভ হয়ে উঠছে । সে স্মিত্রের কপালে হাত রেখে বলল, সারাটা দিন আমার কি যে গেছে !

স্মিত্র আর পারছে না । স্মৃতরাং মাথাটা ইজিচেয়ারের উপর আরাম করার জন্য স্থাপন করল । যেন ঘুমোচ্ছে স্মিত্র এবং দেখলে মনে হবে মৃত । শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় । সে যেন আর দাঁড়াতে পারছে না । সে হেঁটে যেতে পারছে না কোকসালে—দেখলে এমতই মনে হবে স্মিত্রকে । দীর্ঘসময় ধরে চেরীও চুপ করে শুয়ে থাকল বাংকে । এখন ওরা উভয়ে পরস্পর আদর্শকে স্পর্শ করার জন্য প্রথম শহীদ কে হবে, কে প্রথম যৌন বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে এমতই কোন এক প্রতিযোগিতায় মত্ত । চেরী শুয়ে শুয়ে স্মিত্রের অবয়বে সেই রাজপুত্রের প্রতিবিম্ব দর্শনে আর স্থির থাকতে পারল না । সে খুঁটের নাম স্মরণ করে ডাকল, এস স্মিত্র ।

চেরী আবার ডাকল, স্মিত্র এস । নীল আলো জ্বলছে, দেখ ।

স্মিত্র জবাব দিচ্ছেনা । এমন কি ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ল না । যেমন শিথিল

শরীর নিয়ে পড়েছিল তেমনি পড়ে থাকল।

—সুমিত্র, সুমিত্র। চেরী বাংক থেকে নেমে সুমিত্রের ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে দেখল, সুমিত্র যথার্থই ঘুমিয়ে পড়েছে। যে আবেগ এবং ইচ্ছা এতক্ষণ ধরে বাজীকরের মত অভিভূত করে রেখেছিল, সুমিত্রের অসহায় মুখ দেখে সেই বড় জলের মত নির্মল হল। চেবী সন্তর্পণে কাছে গিয়ে কখনটাতে পা শবীর ঢেকে দিয়ে কেবিনের নীল আলোর ছায়ায় ভারতবর্ষের বাজপুত্রের মুখ দেখতে দেখতে রাত ভোব কবে দিল। বাইবে আলো ফুটে উঠছে। পোর্টহোলেব কাচ খুলে দিতেই বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া এই কেবিনেব সকল ঘটনাকে প্রীতিময় করে তুলছে। চেরী বাংক থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে পোষাক পাটাল। শেষে কাপ্তান-বয়ের খোঁজে ডেকে বেব হয়ে গেল। ডেক-ছাদেব নীচে এসে দাঁড়াতেই দেখল দুটো নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। সবুজ এক প্রান্তব, এই ভোরের মিষ্টি আলো, এবং দিগন্তের ফাঁকে সূর্য উঠছে, শুধু বস্ত্রিম আকাশ—কোবনে সুমিত্র ঘুমোচ্ছে, চেরীর বুক ঠেলে কেমন এক কান্নার চিহ্ন ঠোটে মুখে ফুটে উঠল। দূরের দ্বীপ থেকে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে, সবুজের গন্ধ এই জাহাজের ফাঁক কোকরে যত অন্ধকার আছে সব নির্মল করে দিচ্ছে। দ্বীপের পাখীসকল জাহাজটাকে দেখে চক্রাকাবে উড়তে থাকল। নীলরঙের পাখীবা ডাকল আর আকাশেব চাঁদোবে সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এবং তাব ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপের সকল পাখীরা কোন এক নিরুদ্ধশে পাড়ি জমিয়েছে। চেবী ভাবল, এই দ্বীপের কোন গুহায় তার এবং সুমিত্রের জন্য একটু আশ্রয় মিলতে পাবে না। একটু আশ্রয়েব জন্য মাটিব কাছে তার প্রার্থনা, ঈশ্বর আমাব কি হবে!

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

—কফি। দু কাপ।

ধীরে ধীরে জাহাজটা দ্বীপ দুটোকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। সূর্যের আলো দ্বীপের সব অপরিচিত গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। জনহীন এইসব ছোট ছোট দ্বীপ কতকাল থেকে এমন নিঃসঙ্গ কাটাচ্ছে কে জানে। দ্বীপের ঘোপ জঙ্গলের পাশে সুমিত্র এবং তার জন্য যদি কোন তপোবন থাকত, যদি এককালি রোদ এসে সেই কুটির-সংলগ্ন উঠানে এসে পড়ত এবং সারাদিন পর সমুদ্র থেকে ঘরে ফিরে এসে সুমিত্র ওকে জড়িয়ে জীবনের স্বাদ যদি গ্রহণ করত—কত রঙিন স্বপ্ন দেখল চেরী, কত আকাঙ্ক্ষার কথা, বিচিত্র সব সখ সারাদিন ধরে ডেক পাটাতনে ভেবে কখনও অন্যমনস্ক, কখনও বেদনায় বাংকে শুয়ে শুয়ে

স্বৃতিকে ধরে রাখার স্পৃহাতে এক নির্দিষ্ট যুবকের পায়ের শব্দ শুনতে চায়।

তখন সুমিত্র চোখ খুলে দেখল এই কেবিন। গভীর ঘুমের আচ্ছন্নভাবটুকুর জন্য বুঝতে পারল না কোথায় এবং কি ভাবে, সে দেখল এই কেবিন ওর পরিচিত। তারপর একে একে বিগত রাতের ঘটনার কথা স্মরণ করে সে কের আতঙ্কিত হল। দিনের আলো পোর্টহোল দিয়ে কেবিনে গলে গলে পড়ছে। চেরী ঘরে নেই। সুতরাং মনে ভিন্ন ভিন্ন সব অগোছালো চিন্তা জট পাকাচ্ছে। অথবা রাত হলেই এমন সব অসুখের ঘোরে সে ভুগছে; নিজের এই অপরিমাণদর্শিতার জন্য সে দুঃখিত হল। তারপর চেয়ার থেকে সম্ভরণে উঠে ডেকে এসে দেখল, চেরী দূরের দীপসকলকে দেখছে। চেরী খুব খুঁকে আছে রেলিঙে। সে তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ঢুকে বিছানায় শুয়ে রাতে চেরীকে কোন্ কোন্ সংলাপে জৈব ক্ষুধা মেটাবার স্পৃহা জানিয়েছিল, কোন্ কোন্ শব্দ মনের ইতর চিন্তা প্রকাশে উন্মুখ ছিল এইসব ভাবতে গিয়ে চোখমুখ প্রচ্ছন্ন বিষাদে মগ্ন। এসে কল্প পুরুষের মত কবল টেনে বাঁকে শুয়ে পড়ল।

কাপ্তান-বয় এসে ডাকল, মাদাম।

—এই যে!

—আপনার কফি দেওয়া হয়েছে।

—দু কাপের মত?

—হ্যাঁ মাদাম।

চেরী তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকবে ভাবল এবং সুমিত্রকে হাত মুখ ধুতে বলবে বাথরুমে। তারপর একসঙ্গে কফি খেতে খেতে সুস্থ সব গল্প, ওর দেশ বাড়ী এবং অন্য অনেক সব খবর নিতে হবে—কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখল, কেবিন ফাঁকা। সুমিত্র নেই। তারপর সে দেখল পোর্টহোলের কাঁচ খোলা। সে এবার কফির সবটুকু বেসিনে ঢেলে দিল। একটু এগিয়ে গিয়ে কাঁচ এবং লোহার স্নেট দিয়ে পোর্টহোল বন্ধ করে দিল। যেন সুমিত্রের কোন প্রতিবিম্ব ভাসবে না এবং লজ্জায় আর অধোবদনও হতে হবে না। নিজের এই দুর্বলতাকে পরিহার করার জন্য সে আজ ভালভাবে স্নান করল। সুমিত্রকে এড়িয়ে চলার জন্য নানারকমের পত্র পত্রিকা খুলে বসল বাথকে। মনের বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাগুলোকে সংযত করতে গিয়ে বার বার সে হৌচট খাচ্ছে। কোথায় যেন কি বিশাল পাথরের বোঝা হয়ে ভারতীয় জাহাজটা মনের উপর চেপে বসে আছে। চেরী আর পারছে না। চেরী নিজেকে রক্ষার জন্য দরজা খুলে তাড়াতাড়ি

কাপ্তানেব কেবিনে ছুটে গেল। বলল, আপনার এই বারান্দায় একটু বিশ্রাম নিতে চাইছি।

—যতক্ষণ খুশী।

একটি ইজিচেয়ারে বসে সমুদ্র দেখতে থাকল চেরী। এখানে সূর্যমুখ নেই, শুধু সমুদ্র, শুধু ডেউ। কিছু পারপয়েজ মাছ। কিছু মেষ হয়েছে আকাশে। সমুদ্রের ও পাশ দিয়ে একটা জাহাজের ছোট চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। কাপ্তান নীচে আছেন। তিনি দূরবীণ চোখে রেখে জাহাজকে দেখলেন। চেরী উঠে দাঁড়ালে কাপ্তান ওর হাতে দূরবীণ দিয়ে বললেন, দেখুন দূরে একটা ভিমি মাছ দেখতে পাবেন। চেরী কিন্তু দূরবীণ চোখে রেখে সূর্যমুখের দিকে চেয়ে থাকল। পিছনের রেলিঙে সূর্যমুখ ঝুঁকে আছে—সে বোধ হয় প্রপেলারের শব্দ কান পেতে শুনেছে। চেরী দূরবীণটা কাপ্তানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারটা ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে নিল। সূর্যমুখকে আর দেখা যাচ্ছে না এবং সে খুশী হওয়ার ভান করে কাপ্তানকে পরবর্তী বন্দর সম্বন্ধে প্রশ্ন কবল, আশা করছি দু দিন বাদেই আমরা সিডনি পৌঁছাব।

—আপনার সমুদ্রযাত্রা ভাল লাগছে না বোধহয়?

চেরী কথা বলল না।

—ভাল লাগবে কি করে! যাত্রী জাহাজে যেতে পারলে আপনার এতটা অসুবিধা হত না।

চেরী বলল, কাল বিকেলটা বেশ লাগল।

—তা বটে।

—আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে ক্যাপ্টেন।

—আপনার কথাও আমাদের মনে থাকবে। কাল আপনাব ভায়োলিনের সুর অপূর্ব লাগছিল।

—ক্যাপ্টেন, এবার কিন্তু কথাটা একটু খোশামোদের মত মনে হল।

—না মাদাম, আপনি বিশ্বাস করুন। সকলেই আপনার প্রশংসা করছে। সূর্যমুখ ভারতীয়, সে পর্বন্ত বলল, মাস্টার, এ সন্ধ্যার কথা আমরা সকলেই মনে রাখতে বাধ্য হব। তারপর সে আপনার কথায় এল।

চেরীর বলতে ইচ্ছা হল, আর কিছু বলেছে, আর কিছু? কিন্তু সন্মানিত জীবনের কথা ভেবে সে ওই প্রশ্নটাই ইচ্ছাকে জোর করে থামিয়ে দিল।

কাপ্তান চেরীর নিকট থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে চার্ট-রুমে ঢুকে গেল এবং

নজের কাজ করতে থাকল।

চেরী ব্রীজে পায়চারি করছে। একবার উইংসটার পাশে খুঁকে অথবা কখনও কম্পাসটার সামনে এসে (যেখানে কোয়ার্টার-মাস্টার স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে) নিজেকে বারবার আড়াল দিল। সুমিত্রকে আর দেখাই যাচ্ছে না। সুমিত্র পিছলি কোথাও নেই। সে অ্যাকোমোডেশান ল্যাভার ধরে নেমে বোট-ডেক পার হয়ে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সুমিত্র এখন এন্জিন-রুম—সে হাত বাড়িতে সময় দেখে এমত ধারণা করল। এবং কেন জানি অপার বিষণ্ণতা চেরীকে গ্রাস করছে। এবার দুহাত ছুঁড়ে চেরীব যেন বলবার ইচ্ছা—কে আছ তোমরা এস, সুমিত্র নামে এক ভারতীয় যুবক আমার জীবন নিয়ে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমাকে রক্ষা কর!

সুতরাং বিকেলে জোর করে নিজেকে কেবিনে আবদ্ধ করে রাখল। সুমিত্র যে ক'বার এন্জিন-রুম থেকে উঠেছে নেমেছে, প্রত্যেকবার চেরীর দরজা, পোর্টহোল বন্ধ দেখেছে। বিকেলবেলাতে সুমিত্র কাপ্তান-বয়কে প্রশ্ন করল, চাচা, রাজকন্যার দরজা-জানালা যে সব বন্ধ!

—কি জানি, মেয়েমানুষের মজি বোঝা দায়। আমাকে বলল, ঘুমালে ডেকো না। বারোটার সময় দরজার কড়া নাড়লাম, খাবার দিতে হবে...কোন সাড়া-শব্দ নেই। কাপ্তানকে বললাম—তিনি বললেন, বোধহয় ঘুমোচ্ছে, সুতরাং বাটলারকে বলে দাও যেন খাবারটা গরম রাখার ব্যবস্থা রাখে। ও আল্লা, নীচে নামতেই দেখি হৈ-হল্লা বাঁধিয়ে দিয়েছে।

সুমিত্র বলল, কাপ্তান আচ্ছা রাজকন্যার পাল্লায় পড়েছে!

—তা হবে। কিন্তু কাল রাতে তোমার কথাই বার বার বলছিল।

—কেন? কেন?

—না, থাক। ও সব আমার বলা বারণ আছে, বলে কাপ্তান-বয় টুইন-ডেকে নেমে গেল।

এবং এসময় সুমিত্র দেখছে চেরী সান্ধ্য-পোশাকে টুইন-ডেক অতিক্রম করে এদিকেই আসছে। সুমিত্র অন্যান্য সকল জাহাজীদের সঙ্গে কথা বলছে—চেরীকে দেখছে না এমত ভাব ওর চোখে-মুখে। চেরী অ্যাকট-পোর্টে চলে আসছে। সুমিত্রের গলা শুকনো শুকনো ঠেকছে। চেরী অ্যাকট-পোর্টে উঠে সুমিত্রের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সুমিত্রের দিকে তাকাল না, অথবা কথা বলল না। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে জাহাজ-ডেকে। সুতরাং সকলে সরে দাঁড়াল।



চেরী স্টারবোড-সাইডের ডেক ধরে এক নম্বর, দু নম্বর কক্ষা পার হয়ে কের অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র পাশের জাহাজীকে বলল, চেরীকে খুব শুকনো শুকনো লাগছে না চাচা ?

—জাহাজে চডলে প্রথম সকলেরই একটু শরীর খারাপ হয়। সুখী ঘরের মেয়ে। তা, একটু শুকনো লাগবে।

সুমিত্র এইসব কথা শুনল না। সে পিছলি থেকে নড়ছে না। সে চেরীকে ক্যোরার্ড-ডেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল। চেরীর মুখ শুকনো, সেইহেতু একটা কষ্ট-কষ্ট ভাব সুমিত্রের মনে। চেরী চুপচাপ চলে যাচ্ছে—গেল। সুমিত্র স্থানুবৎ। এই প্রথম একজন পরিচিত যুবতীর জন্য মনে মনে দুঃখ বোধ করছে এবং যতবার অস্বীকারের ইচ্ছায় দৃঢ় হয়েছে তত এক দুর্নিবার মোহ সুমিত্রকে উত্তেজিত করে করে এক সময় নিদারুণ প্রেমে ঘনিষ্ঠ কবতে চেয়েছে।

সুমিত্র অনেকক্ষণ স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে সহসা দেখল ডেক এবং অন্যত্র সকল স্থান আলো আলোময় করে জাহাজ গতিশীল। সে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে ডেক ধরে নেমে গেল। সে হাঁটতে থাকল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। অথচ এক সময় সে নিজেকে দেখল চেরীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেরীর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতবে কোন আলো জ্বলছে না। চেরী অন্ধকারে শুয়ে আছে চুপচাপ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়ল।

ক্লান্ত গলায় ভিতর থেকে প্রশ্ন করল চেরী, কে ?

—আমি, সুমিত্র।

সুমিত্র ভিতরের শব্দে বুঝল চেরী খুব দ্রুত কাজসকল সম্পন্ন করেছে। আলো জ্বালছে, প্রসাধন করেছে। সব কিছুতেই দ্রুতভাব। সুমিত্র এ-সময় এতটুকু ভীত হল না।

চেরী দরজা খুলল। চোখে ভয়ানক ক্লান্তি, তবু সুমিত্রের হাত ধরে এনে ভিতরে বসাল।

—আপনাকে আজ ভয়ানক অসুস্থ মনে হচ্ছে। কাল রাতে বুঝি এতটুকু ঘুমোন নি ?

—সুমিত্র, আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না। কাল আমি ঘুমোতে পারিনি।

—আমি দেখছি মেজ-মালোমের কাছে ওষুধ পাওয়া যায় কি না।

—না সুমিত্র, তুমি বোস। ঘুমোতে পারছি না বলে আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

—কিন্তু আপনার চোখের কোল যে ভয়ানক ফুলে উঠেছে !

—সব সেরে যাবে। তুমি বোস। একটু কফি খাও। চেরী দরজায় গলা  
বের করে কাপ্তান-বয়কে ডাকল।

কফি খেতে খেতে চেরী প্রসন্ন করল, তোমার কে কে আছে স্মৃতি ?

—কেউ নেই।

—কেউ নেই ?

—না।

—মা ?

—না।

—বাবা ?

—না।

—আত্মীয়-স্বজন ?

স্মৃতি এবারেও ঠোট ঠোটাল।

—কি করে এমন হল ?

—সব দাঙ্গাতে মারা গেছে। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে ছিল।

—ঈশ্ব ! চেরী আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। অনেকক্ষণ নির্জনে  
বসে থাকার মত চুপচাপ বসে থাকল পরম্পর। দীর্ঘসময় ওরা হতবাক হয়ে  
থাকল।

স্মৃতিই কথা বলল, আমি না ডাকতেই এসেছি বলে রাগ করেন নি তো ?

—স্মৃতি, আমি খুব খুশী হয়েছি, খুব।

—আপনার শুকনো মুখ দেখে আমার আজ কেন জানি বারবারই মনে হল,  
এই জাহাজে আপনি আমার মতই একা। আমার মত আপনারও কেউ নেই।  
এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অভূত ধরনের কষ্টে পীড়িত হতে থাকলাম। শেষে বিশ্বাস  
করুন, কে যেন জোর করে আপনার দরজায় আমাকে এনে হাজির করল।

এই সব কথাই চেরী-আবেগে প্রগাঢ় হল। সমস্ত শরীরে এক অদৃষ্ট কম্পন।  
সে তার সকল দৃঢ়তা, সকল প্রত্যয়, সকল সম্মানিত জীবনের আলো গান  
পরিভ্যাগ করে স্মৃতির দু' হাত চেপে ধরল। কিন্তু আবেগের প্রগাঢ়তার  
কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। বলতে পারল না, মাই প্রিন্স ! আমার  
আশৈশবের রাজপুত্র ! সে মাথা নত করে স্মৃতির মুখোমুখি বসে থাকল।  
মনে কোন আলো গান জাগল না। নিমজ্জমান তরীর মত জীবনের এক প্রবল

মাধ্যাকর্ষণে ক্রমশ গভীর সমুদ্রে ওবা মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। এবং একসময় স্মৃতি যখন চোখ তুলল চেবীকে দেখবাব জন্য, তখন চেবী অবাক হতে হতে দেখল, সেই চোখ, সেই বিষণ্ণ চঞ্চল চোখ কাঁচের জানালায় প্রতিবিম্ব হয়ে ভাসছে। কত ইচ্ছাই না চেবীকে এ-নয় বিব্রত কবেছে, কিন্তু কোন ইচ্ছার সফলতাকেই অমৃতময় বলে মনে হল না, স্মৃতিতে চেবী স্মৃতির প্রিয়মুখ দর্শনে শুধু বিহবল হতে থাকল।

বাত্তির বিষণ্ণ আলোতে চেবীকে স্মৃতি কবাব জন্য স্মৃতি বলল, তোমাকে যদি বাজা-বানীব গল্প বলি, তুমি খুশী হবে? চেবী শুধু চেয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল কবে।

পবদিন ভোবে স্মৃতি টুপাতিব কেবিনে ঢুকে বলল, তোমাব সময় হবে?

চেবী বলল, আমার হবে, তোমাব হবে কি না বল?

—আমাব আজ থেকে কোন ওখাচ থাকবে না।

--কেন?

—কাপ্তান সারেঙকে বলে পাঠিয়েছে, আজ এবং কালকেব জন্য অন্য কাউকে দিয়ে ওয়াচ চালিয়ে দিতে। স্মৃতি আজ বেশ আশ্বাস কবে ছুটে পা দ্যাংকেব উপব তুলে দিয়ে বসল, তাবপব ঠাকুবমাব মুখে শোন চম্পা এবং আব ছুই সখীব গল্প করে চেবীকে আনন্দ দিল। গল্পটা বলতে বেশী সময় নিল না স্মৃতি। বারোটাব পব সাহেবদেব লাঞ্চ। চেবী খাবে তখন। স্মৃতি এগাবোটা বাজতেই উঠে গেল।

বিকেলো বোট-ডেকে গল্প কবতে এসে দেখল চেবী বসে বসে সমুদ্র দেখছে। সে ওব পাশে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তাবপব কি ভেবে চলে যাবাব জন্য পা বাড়াতেই ব্রীজে কাপ্তানেব গলা পেল।

—স্মৃতি, গুড আকটারহুন।

—গুড আকটারহুন, মাস্টার!

—কাল আমবা বন্দব পাব।

—কখন স্মার?

—সন্ধ্যায়।

চেবী এখনও চোখ তুলছে না, অথবা ওদেব দেখছে না।

কাপ্তান বলল, বেশ সমুদ্র-যাত্রা আমাদের। কোন ঝড় নেই, সমুদ্র একেবারে শান্ত।

—মাস্টার, আকাশ খুব পরিষ্কার ।

—দশটা রাতেই ডেকে জ্যোৎস্না । মাদাম কি বলেন ? চেবীকে উদ্দেশ্য করে কাপ্তান ব্রীজ থেকে কথা বলতে চাইল ।

চেবী মুখ না তুলে এক ধবনেব সম্মতিসূচক শব্দ কবল ।

সুমিত্র চলে যাচ্ছিল, চেবী ডেকে বলল, সুমিত্র, কাল আমবা বন্দব পাব ।

—আশা কবছি ।

—বন্দবে আমাব এক আত্মীয়া এবং এক বন্ধু আসবেন তুলে নিতে, তুমি তাদের সঙ্গে পরিচয় কববে না ?

—নিশ্চয় কবব । কি বকম আত্মীয়া হন তাঁবা ।

—একজন পিসিমা । অন্যজন পিসেমশায়েব দাদাব ছেলে । একটা মোটব কোম্পানীৰ পৰিচালক ।

—এই সব কথাব ভিতব কেবলই তোমাকে বিষয় দখাচ্ছে । বল তো আব-একটা গল্প শোনাই । খুব আনন্দ পাবে ।

—না, আব কপকথা নয় । এবাব জীবনেব কথা বল । আমি জাহাজ থেকে নেমে গেলে তোমাব কষ্ট হবে না ?

—হবে, খুব কষ্ট হবে ।

—তোমাকে অযথা মন্দ কথা বলেছি ।

—এ-কথা এখন আব ভাল শোনাচ্ছে না ।

—হযতো আব দেখাই হবে না কোন দিন । অথচ .

—দেখা হবে না কেন ? জাহাজে যখন কাজ কবছি, তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে ।

—সুমিত্র, তুমি তো জিজ্ঞাসা কবলে না তোমাব জন্য আমাব কষ্ট হবে কি না ?

—তোমাবও হবে । সুমিত্র পাশেই বসে পড়ল । বলল, বেশ সুন্দব হাওয়া দিচ্ছে ।

এই কথা শুনে চেবী ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ছিল । অথচ সুমিত্রকে দেখে মনে হল না, যে চেবীর বিদায়বেলাতে কোন দুঃখবোধে পীড়িত হবে । চেবী বলল, আমাব কেবিনে এস । বঁলে, সে হাটতে থাকল ।

—একটু বোস না, এই সমুদ্রকে তোমাব ভাল লাগছে না ?

—এখনই সন্ধ্যা হবে । চল, কেবিনে নীল আলো জ্বলে তোমার গল্প শুনব ।

—একটা অমুরোধ করলে বাখবে ?

—বল। যা বলবে আমি সব করব।

—আমাকে ভায়োলীন বাজিয়ে শোনাবে ?

—শোনাব। কেবিনে চল।

—কেবিনে নয় চেরী। এই বোট-ডেকে। খোলা আকাশের নীচে বসে।

—তাই হবে।

এখন রাত নামছে সমুদ্রে। করোয়ার্ডপিকে পাহারা দিতে দুজন জাহাজী চলে গেল। ব্রীজে পায়চারী করছেন মেজ মালোম। ওরা লাইফ-বোটের আড়ালে বসে আকাশ দেখল, নক্ষত্র দেখল। পরস্পর গল্প করতে করতে এক সময় ঘনিষ্ঠ হল এবং পরস্পর হাতে হাত রেখে সমুদ্রের গর্জন শুনল যেন যথার্থই কোন রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে—ছুটছে। চেবী এ সময় গর্ভিণী তিমির মত উদগ্র আবেগে ছটকট করতে থাকল।

চেরী ভায়োলীন বাজাতে বাজাতে বলল, কেমন লাগছে স্মৃতি ?

শীতের নদীতে কাশফুলের রেণু উড়ছে। প্রজাপতি উড়ছে যেন এবং খণ্ডরবাড়ি যাচ্ছে নতুন বোঁ। কলের গান বাজছে নৌকার পাটাতনে। দুটো ফুটফুটে ছেলেমেয়ে সাদা ফ্রঁক গায়ে তখন চরের কাশবনে প্রজাপতি খুঁজে বেড়াচ্ছে—টুপাতি চেরীর বেহালার বাজনা স্মৃতির মনে সে রাতে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করেছিল।

তারপর অধিক রাতে যখন পরস্পর বিদায় জানিয়েছিল কেবিনে—চেরী স্মৃতির চোখ দুটোতে চুমু খেল যে চোখদুটো দীর্ঘকাল ধরে চেবীকে অনুসরণ করে কিরছে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জাহাজীরা জমি দেখার চেষ্টা করল। আকাশের কিনারায় কোন দ্বীপ অথবা মাটির রেখা ভেসে উঠছে কি না দেখল। ওরা খবর পেয়েছে, জাহাজ বিকালে নোঙর ফেলবে। এবং রাতে পাইলট-জাহাজ এসে বন্দরে জাহাজ টেনে নেবে। সুতরাং জাহাজীরা মন দিয়ে কাজ করল, ডেকে কক্ষায়, অথবা ডায়রিকে। কানোলে কেউ রঙ করল। চেরী একবার ডেকে বের হয়ে সকল কিছু দেখে কেবিনে ঢুকে গেছে। এবং স্মৃতি এই ডোরেও বাঁকে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কাপ্তান-বর এল এ-সময়। ফোকসালে ঢুকে ডাকতে থাকল স্মৃতিকে।

স্মৃতি একটা বড় রকমের হাই তুলে বলল, তারপর চাচা, নতুন কিছু খবর আছে ?

—কাপ্তান যে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।

সুমিত্র ব্রীজে গেলে কাপ্তান বলল, বিকালে পাইলট ধরবে জাহাজ। সুতরাং তখন থেকে তুমি আব চেবী কেবিনে যাবে না। পাইলট-জাহাজে ওর আত্মীয়-স্বজন আসার কথা আছে।

—কিন্তু শ্রাব....।

—আমি সব বুঝি সুমিত্র। মনে বেখো, তুমি জাহাজী। কত বন্দবে কত ঘটনা ঘটবে। তোমাকে যে একটু দৃঢ় হতে হবে।

সুমিত্র ব্রীজেব একপাশে দাঁড়িয়েছিল—আকাশ তেমনি পবিষ্কার। জাহাজীরা সকলেই বন্দবেব জন্য উদগ্রীব। যত বন্দবেব দিকে এগোচ্ছে জাহাজ, তত জাহাজীবা উৎফুল্ল হচ্ছে। সুমিত্রের মনে একটা দুঃসহ কালো মেঘের অন্ধকার নেমে আসতে থাকল। সে ধীবে ধীবে ব্রীজ থেকে নেমে এল। চেবীর কেবিন অতিক্রম করার সময় ইচ্ছা করেই আজ আব পোর্টহোলে চোখ তুলল না সে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ক্লান্ত বোধ কবল নিজেকে। কোকসালে ঢুকে নিজের বাংকে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

বুড়ো কাপ্তান বয় এসে সুমিত্রের পাশে বসল।

—কিছু খবর আছে চাচা?

—না। আমি বুঝি কেবল তোমার দুঃসংবাদই বয়ে আনছি?

—তেমন কথা কি আমি বলছি?

—কি জানি বাপু, কেবল খবর আব খবর!

—চেবী কি করছে চাচা?

—ছোট একটা বই সাবাদিন ধবে পড়ছে।

—আমার কথা কিছু বলছিল?

—না।

সুমিত্র পাশ ক্রিয়ে গুল। কোন প্রশ্ন করাব ইচ্ছা নাই। কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোতে ইচ্ছা হচ্ছে। বন্দবে জাহাজ নোঙর কবলে কোনো পাব্-এ ঢুকে মদ খাওয়ার লক্ষ হচ্ছে।

বিকালে সুমিত্র উপরে উঠে গেল। অ্যাক্টর-পিকের রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। দূর সমুদ্রে পাইলট-জাহাজটা যেন উড়ে চলে আসছে। এ-সময় চেবীকে দেখার প্রত্যাশা করল সুমিত্র। চেরী ওর আত্মীয়ের জন্য গ্যাঙওয়ায়েতে অপেক্ষা করবে। অথচ চেরী নেই। চেরী এখনও কেবিনে পড়ে আছে। সুমিত্র দেখল

পাইলট-জাহাজ থেকে ওর আত্মীয়া—পিসি এবং সেই যুবক উঠে আসছে। হাতে বড় বড় দুটো গোলাপের কুঁড়ি। পাইলট সকলের শেষে উঠে এল। কাপ্তান ওদের সকলকে সঙ্গে করে আলিওয়েতে ঢুকে গেলেন। স্মিত্র এই সব দেখে কোন দুঃখবোধের জন্য একটা দীর্ঘশ্বাসকে সঞ্চিত রাখল।

স্মিত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্তান-বয় এবং মেসরুম-মেটের সব কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। পাশাপাশি অন্যান্য জাহাজীরাও এসে ভীড় করেছে। জাহাজীরা স্মিত্রকে কোন প্রশ্ন করছে না। এই সব ঘটনা ওদের সকলকেই অল্পবিস্তর দুঃখ দিচ্ছে। তখন ওরা সকলেই দেখল চেরী এবং ওরা দুজন, কাপ্তান, বড় মিস্ত্রী, পাইলট—ডেক ধবে হাঁটছে। স্মিত্র তাডাতাড়ি জাহাজীদের ভিতর নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলল। সে চেরীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, চেরী সমুদ্র-যাত্রায় যেন ভয়ানক দুর্বল। এখন ওবা পবম্পর বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ওরা নেমে গেল। স্মিত্র চেরীকে দেখতে পাচ্ছে না এখন। সে ফের নীচে নেমে বাঁকে গুয়ে পড়ল।

চেরী চোখ তুলে এই জাহাজের ডেকে কিছু অন্বেষণ করতে গিয়ে গলায় এক দুঃসহ আবেগের কান্না অল্পভব করল—কেখাও কোন অমৃতের চিহ্ন নেই। চোখদুটো সজ্জল হতে হতে এক রুদ্ধ আবেগে চেরী ভেঙে পড়ল। এই ঘটনায় প্রিয়জনেরা উদ্ভিগ্ন, ভাবল, শারীরিক কুশলে নেই চেরী; ভাবল, দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার পর প্রিয়জন দর্শনে কোন পরিচিত আবেগের জন্ম হচ্ছে শরীরে। কাপ্তান নিজেও এই বিচ্ছেদটুকু লালন করতে পারলেন না। তিনি ইচ্ছা করে পাইলটেব সঙ্গে জাহাজ-সংক্রান্ত কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কাপ্তান-বয় যখন বখশিশ নিয়ে উঠে আসছিল, চেরী সম্ভবপূর্ণ তাকে কাছে ডাকল। একটি চিরকুট দিল, গোলাপের কুঁড়ি দুটো দিল, অথচ কোন নির্দেশ দিল না। তারপর চেরী পাইলট-জাহাজের পাটাতনে নেমে ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে মুহ্যমান। কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না যেন, যেন এক বাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটে ছুটে সমুদ্র অতিক্রম করেছে এবং হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে আব পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে চেরীব দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে।

কাপ্তান-বয় কোকসালে ঢুকে বলল, এই নাও তোমার বখশিশ। বলে, গোলাপের কুঁড়ি এবং চিরকুট পাশে রাখল।

স্মিত্র বলল, পাইলট-জাহাজটা কতদূর গেছে?

—অনেক দূৰ ।

স্মিত্ৰ এবাব চিবকুটট পডল ।

—যখন আমি বুডো হব স্মিত্ৰ, যখন নাতি-নাতনিদেব নিয়ে সমুদ্রের ধাবে কপকথাৰ গল্প কবব, তখন বলব ভাবতবৰ্ণেব সেই কপকথার বাজপুত্ৰ সাত সমুদ্র তেবো নদী পাব হৰে কাকাত্ৰিয। দ্বীপেব বাজকন্যাকে খুঁজতে বেব 'হয়েছিল। বলব, ঘোড়ায় চড়ে নয, বখে চড়ে নয, জাহাজে চড়ে। বলব, কাকাত্ৰিয। দ্বীপেব বাজকন্যাকে খুঁজে বেব কৰেছিল, ভালবেসেছিল, সোনাৰ কাঠি কপোব কাঠি নিয়ে হাত বদলেছিল, কিন্তু কপোব কাঠি ইচ্ছা কবেই শিয়বে বাখাব চেষ্টা কবেনি ।

শেষে তাব কোন এক প্ৰিয় কবিব দুটো লাইন লিখেছে,

—Better by far you should forget and smile

Than that you should remember and be sad.

স্মিত্ৰ উপবে উঠে বেলিঙে ভব কবে দাঁডাল। দূবে পাইলট-সিপ অম্পষ্ট। ক্ৰমশ তীব্বেব দিকে চলে যাচ্ছে। মনে মনে সেই লাইন দুটো আবৃত্তি কৰতে গিয়ে বুকল, পৃথিবী অমৃতময। চেবী অমৃতময। দুঃখ এবং বেদনাৰ কিছুই নেই। পিছনে এ সময় কাব হাতেব স্পৰ্শে সে ঘূৰে দেখল কাপ্তান ওব পিঠে হাত বেখেছেন। বলছেন, আমাব কেবিনে এস স্মিত্ৰ। আজ আমি তোমাকে খুঁটেব গল্প শোনাব।



## চা র

অবনীভূষণ বিজন এবং স্নুমিত্রের দীর্ঘদিন জাহাজে কেটে গেছে। অবনীভূষণ এখন প্রৌঢ়। বিজন স্নুমিত্র উত্তরত্বিশের যুবক। ওবা সকবে সকরে ক্রমশঃ এক প্রাচীন নাবিকের গন্ধ মেখে বন্দব থেকে বন্দরে, এক সমুদ্র থেকে অগ্ন সমুদ্রে এবং এক জাহাজ থেকে অগ্ন জাহাজে ঘুরেছে। তারপর একই জাহাজে ওরা তিনজন একদা দূর সমুদ্র যাত্রায় বেব হয়েছিল। সে রাতও তুবার ঝড়ের রাত ছিল। সে ঘটনার সাথী অবনীভূষণ ছিল, বিজন ছিল এবং স্নুমিত্র ছিল। শুধু এ-ঘটনা অথবা কাহিনী একা এক অবনীভূষণের থাকছে না, বিজনেরও থাকছে না, এমন কি স্নুমিত্রেরও নয়। এ-ঘটনা অথবা কাহিনী ওদের সকলেব এবং সকল মানুষেব।

কোকসালে সকলেই প্রায় ঘুমোচ্ছিল। কারণ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর এই বন্দরের আলো-ধর-বাতি সবই কেমন মুছমান এবং তুবার ঝড় হচ্ছে। স্নুতরাং জাহাজীরা বন্দর দেখে খুশী হতে পারল না। ওরা ডেকে পায়চারী করতে করতে বন্দরের গল্প করল না। ওরা শীতে অবসন্ন, ওরা কন্ডল মুড়ি দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকল।

বিজন গ্যাঙওয়ের পথ ধরে কিরছিল। গ্যাঙওয়েতে তুবার ঝড়টা মুখোমুখি লাগছে। স্নুতরাং সে হাঁটতে হাঁটতে চীক্ কুকের গ্যালীতে চলে এল। হাত পা সঁকল এবং চা করে আবার সেই শীতের রাজ্যে ঢুকে জাহাজটাকে পাহারা দেবার সময় দেখল, দূরে কোথাও কোন আলোর রেখা ফুটে উঠছে না। তুবার ঝড়ের অন্ত সব কেমন অন্ধকারময়। বসে বসে সে ঝড়ের শব্দ শুনল, সমুদ্র দূরে গর্জন করছে। জাহাজটা নড়ছিল। যেন জাহাজটা হাসিল ছিঁড়ে এবার ছুটেবে অথবা জাহাজের শরীরে এক রকমের শব্দ, যা বিজনকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে। মার্শের আলোগুলি ছলছিল—সে দেখতে পেল। বন্দরের আলোগুলো অস্পষ্ট, বরকের কুচি ওদের অস্পষ্ট করে রেখেছে। সে হাডের দস্তানাটা এবার আরও টেনে দিল।

নীচেও কোন লোক চলাচল করছে না। ফ্রেনগুলো দৈত্যের মত এই জেটির সকলকে তুষার ঝড়ের ভিতর পাহারা দিচ্ছে। উইংসের আলো জ্বলছে না। শুধু জাহাজটা নডছিল। এতদিনের এই সমুদ্র-যাত্রা এবং প্রপেলারের শব্দ, এনজিন রুমের শব্দ তাবপর সমুদ্রের ঢেউ—সকলই কেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সকলই কেমন রাত দুপুরে মাঠের নির্জনতায় ডুবে যাওয়ার মত। সে এবার ধীরে ধীরে উঠল। বসে থাকলেই শীত বেশী করছে। সে পায়চারী করতে লাগল। এবং ডেক পার হলে গ্যালী, পরে সব জাহাজীদের ফোকসাল। বিজন এতদূর পর্যন্ত হেঁটে গেল না। সে পোর্টহালের কাঁচের ভিতর দিয়ে বড় মিস্ত্রীর কেবিন দেখল। ওর ঘরে নীল লাল মিশ্রিত এক ধরনের আলো। বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণ এত রাতেও একটা বই পড়ছেন। অগ্নীল সব বই এবং নগ্ন সব ছবি দেয়ালে দেয়ালে।<sup>৬</sup> বড় মিস্ত্রী জাহাজ নোঙর করলে ঘন ঘন রেলিঙে ভর কবে দূরে কিছু যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন। প্রত্যাশা যেন কিছুব। অঙ্ককার জেটিতে কিছু আবিষ্কারের জন্ম পাগল। বিজন বলেছিল, শ্রাব, বন্দরে কেউ নেই। খালি।

—কেউ নেই! কথাটা তিনি বিশ্বাস কবতে পাবছিলেন না।

—যথার্থই কেউ নেই শ্রাব।

অবনীভূষণ চোখের চশমা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে কথাটা অবিবাস করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ডেসীব আসার কথা অথচ ডেসী এল না। তিনি বিড় করে তুষার ঝড়কে ধিকাব দিচ্ছিলেন! ডেসী এলে এই জাহাজ মনোরম...বড় কামুক গন্ধ এই জাহাজের অলি গলিতে, নোনা জলের ঘন রঙ অথবা সমস্ত বিশ্বাদ সমুদ্রের—ডেসী একা সামলাত। ডেসী এলে ওর ঘরে রাত যাপনের প্রস্ন উঠত। অন্যান্য সফরেব মত বন্দরের দিনগুলো নির্দিষ্ট ঘরে সুখ পেত। এত দুঃখময় এই জাহাজ, জাহাজী জীবন এমন ন্যাকারজনক এবং বেঞ্জা মেয়েরা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হচ্ছে না, কি অনাবশ্যক দিন—শুধু তুষার ঝড়, বরফের কুচি উড়ছে আর রাত ব'লে, আলো কম ব'লে সমস্ত শহরটা অডুত রহস্যময় ঠেকছে। দূরে ইতস্তত কোন কুকুরের চীৎকার, গীর্জাতে ঘণ্টা বাজছে এবং এম্বুলেন্সের গাড়ী যাচ্ছে, জেটিতে একটা মাতাল পুরুষকে পর্যন্ত দেখা গেল না। কি অবিবাস্য ভাবে নসিব বদলা নিতে শুরু করেছে। ডেসীর জন্য এই প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে বড় মিস্ত্রী রেলিঙে ভর করে প্রতীক্ষা করছিলেন। উত্তেজনায় শরীর অধীর হচ্ছিল। কারণ উত্তর অঞ্চলের অন্য বন্দরে ডেসীর চিঠি ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—চীক্ জাহাজ তোমার ভিড়বে রাতে। যত প্রতিকূল অবস্থাই হোক না,

আমি উপস্থিত থাকব জেটিতে। তোমাকে নিয়ে ঘরে কিরব। চিঠিতে সে  
ওর বেড়ালের জন্য বড় মিস্ত্রীকে কড়্ মাছের চর্বি আনতে লিখেছিল।

বডমিস্ত্রী অঙ্গীল পুস্তকের ভিতর থেকে ডেসীর তলপেটের গন্ধ নিচ্ছিলেন যেন।  
এবং এ সময়ে পোর্টহোলে প্রতিবিম্ব পড়তেই তিনি প্রসন্ন করলেন, কে ?

—আমি স্ত্রার, সুখানী। বিজ্ঞন বলল।

অবনীভূষণ শাস্ত্র গলায় বললেন, সুখানী আমাকে একটু চা খাওয়াবে ভাই।  
রাত অনেক হল। ঘুম আসছে না। আর এই রাতে বরদের জ্বালাতন করতে  
ইচ্ছা হচ্ছে না।

বিজ্ঞন ফের চীক্‌ক্‌কের গ্যালীতে ঢুকে গেল। চা করল। তারপর চীক্‌  
এনজিনিয়ারের দরজাতে দাঁড়িয়ে ডাকল, আপনার চা এনেছি স্ত্রার। দরজা খুলুন।

বড মিস্ত্রী ভিতর থেকে বললেন, দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এস।

বিজ্ঞন দরজার ভিতর ঢুকে দেখল, নীল কাঁচের গ্লাসে এখনও লীকার পড়ে  
আছে। সে টিপয়তে চা রাখল। তারপর বের হতে শুনল, তিনি ডাকলেন,  
সুখানী। সুখানী কাছে গেলে বললেন, কোথাও কেউ নেই ?

—না স্ত্রার।

—কোন ঘরে কেউ আসেনি ?

—না স্ত্রার।

—যথার্থ কথা বলছ ?

—হ্যাঁ স্ত্রার। কোন কেবিনে কেউ আসে নি ?

—ক্যাপ্টানের ঘর ?

—ঘর ফাঁকা স্ত্রার।

—ঠিক আছে, যাও। বড় সাব অবনীভূষণ বসে বসে চা খেলেন। রাত এখন  
কত ? কাঁচের ঘরে ঘড়ির কাঁটা নড়তে দেখলেন। রাত বারটা বেজে গেছে। সমুদ্রে  
এবার এক নাগাড়ে কতদিন ? দশমাসের উপর হবে। হোম থেকে কবে বের  
হয়েছেন—কতকাল আগের যেন সেই সব দিন, সেই সব বন্দর এবং স্ত্রীর কালো  
দুটো চোখ এখন পোর্টহোলের কাঁচে দৃশ্যমান। শরীরে তার যৌবন নিঃশেষ অথচ  
প্রেমটুকু আলোক-উজ্জ্বল দিনের মত। সবই তিনি স্মরণ করতে পারছেন অথচ  
ডেসী এল না—ডেক ছাড়ে কার পারের শব্দ। তিনি এবার কবল টেনে স্তরে  
পড়লেন। কারণ বাইরে তখনও ভূবার ঝড় হচ্ছে।

বিজ্ঞান ভূবার বড়ের জন্য চীক টুয়াডের কেবিন এবং অ্যালওয়ারের ফাঁকটাকে চুকে দাঁড়িয়ে থাকল। এই ফাঁকটুকু থেকে গ্যাঙওয়ে স্পষ্ট। ওর শরীরে এখন ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছেন। জাহাজ কতদিন পর বন্দর পেল অথচ দুর্ভোগের জন্য জাহাজীরা কিনারায় নামতে পারছেন না। কাল সকালে এবং অপরাহ্ন বেলায় যখন জাহাজীরা একে একে জাহাজ খালি করে বন্দরে রমণী সন্দর্শনের জন্য নেমে যাবে, যখন ওরা কিংস পার্কে অথবা সান্তারুজের চুডায় উঠে শহর দেখবে তখন... তখন বিজ্ঞানের বড় ইচ্ছা এই ঠাণ্ডায় কোন যুবতীর উত্তাপ, কাপ্তানের ইচ্ছা কিছু উত্তাপ...তখন বিজ্ঞান পাশেবে কেবিনে বড় পরিচিত শব্দ শুনল। শব্দটা মধুর। শব্দটা ভীষণ উত্তেজনাময়—সে স্থির থাকতে পারছেন না। সে ধীরে ধীরে দরজায় কান পেতে শুনতে চাইল—কিছুই শোন যাচ্ছেনা, অস্পষ্ট। সে এ সময় অধীর যুবকের মত দেয়ালে হাত রাখল।

বিজ্ঞান এই ফাঁকটুকুতে দাঁড়িয়ে শান্তি পাচ্ছেনা। পোর্টহোলের কাঁচে মুখ রাখা যাচ্ছে না। লোহার প্লেটে বন্ধ কাঁচ সর্বত্র এক গোপনীয়তা রক্ষা কবছে। সে এই কেবিনের একটা রক্তপথ খোঁজার জন্য খুব সন্তর্পণে দেয়াল হাতড়ে বেড়াতে লাগল। দরজার পাল্লা ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করতে গিয়ে বুঝল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে এবং বাইরে আলো ব'লে বিজ্ঞান বুঝতে পারছেন না, বিজ্ঞান এবার বাইরের আলো নিভিয়ে এক ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করতেই দেখল পোর্টহোলের উপরে যেখানে স্টীম পাইপ আছে তার পাশে গোলাকার ছিদ্রপথ। সে তাড়াতাড়ি টুলটা গ্যাঙওয়ে থেকে নিয়ে এসে মই বেয়ে ওঠার মত উপরে উঠল। মুখটা কিঞ্চিৎ ভিতরে ঢুকিয়ে দেখল ওরা দুজনই পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওবা উভয়ে রাতের প্রথম প্রহরে বোধহয় যৌন যন্ত্রণায় মুগ্ধ ছিল। এখন শান্ত। এখন ঘর এবং ঘরনীর মত ওদের মুখচ্ছবি। কোন অপরাধবোধের চিহ্ন নেই মুখে। যেন কত দীর্ঘদিনের আলাপ, যেন কত দীর্ঘদিনের প্রেম এবং সহিষ্ণুতা ভয়কে গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজ্ঞান, কবলের নীচে ওদের শরীর নগ্ন এমন এক ছবির কথা চিন্তা করে টুল থেকে নেমে পড়ল। ওর ওয়াচ শেষ হবে এখন। সুতরাং এই নগ্নতা দর্শনে তৃপ্তি নেই, এতে শুধু উত্তেজনা বাড়ে। মেয়েটির কক্ষ চুলে স্নিগ্ধের মোটা শব্দ হাত। অন্য হাতটি কবলের নীচে নড়ছিল...কবলের নীচে মেয়েটির তলপেটের কাছাকাছি কোথাও ইঁহরের মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে অথবা যেন শরীরের সকল কুশল চিন্তার কথা ভুলে সারারাত যৌন সংযোগে মগ্ন থাকলে সকল স্নপের আকর...বিজ্ঞান আর ভাবতে পারল না, সে তাড়াতাড়ি টুলটা

হাতে নিয়ে কেবিনের পাশ থেকে সরে গিয়ে কিঞ্চিৎ ছুট দিল। সে ছুটতে ছুটতে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের পাশে এসে দাঁড়াল এবং বলতে চাইল, স্যার আমি... আমি যথার্থ কথা বলিনি।

এখন বড় মিস্ত্রী দরজা খুললে বলতে হবে ষ্টয়ার্ডের ঘরে চটুল রমণী ষ্টয়ার্ডকে পরিত্রাভা ভাষার মত প্রেম এবং সুখ বিতরণ করছে। সুতরাং কাল ভোরে আপনার দরজার পাশ দিয়ে একজন চটুল রমণী উঁচু হিলের জুতা পরে এবং নিতম্বের সঙ্গ করতে করতে জেটিতে নেমে যাবে তারপর আমি অভিযোগের করুণ বিষোদগারে জর্জরিত হব—সে ঠিক নয় স্যার। সুতবাং সকল ঘটনার কথা খুলে বলাই ভাল।

সে ডাকল, সাব।

—কে বাইরে? কবলের ভিতর থেকেই বড় মিস্ত্রী চোখ পিট পিট করে ডাকাতে থাকলেন।

—আমি স্যার, সুখানী।

—ঘরে এস। শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।

বিজন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এবং বলল, স্যার আমি যথার্থ কথা বলিনি।

—যথার্থ কথা বলিনি! তবে আস্তে বল। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বাইরের তুষার বাড়টা মন্ট্রিলের দিকে যাচ্ছে না ত, অথবা ভ্যানকুবার থেকে জাহাজ আসার কথা ছিল—ওরা কিছু মেয়ে আমদানী করতে পারে হয়ত।

—না স্যার। সে সব কথা আমি বলছি না। আমাদের জাহাজে এই ঝড়ের মধ্যেও একজন মেয়ে উঠে গেছে। মেয়েটা চীফ ষ্টয়ার্ডের কেবিনে আছে।

এমত কথায় বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণের চোখ গোল গোল হয়ে উঠল। গুঁর বাসি দাড়িগুলি লম্বা হয়ে গেল যেন। তিনি বললেন, এই ঝড়ের রাতে!

—আজ্ঞে স্যার।

—ভাল কথা নয়।

—নয় স্যার।

—তুমি দেখলে?

—আজ্ঞে দেখলাম স্যার। টুলের উপর উঠে উকি দিয়ে দেখতে হল ঘুলঝুলিতে।

—ওরা কি করছে? অবনীভূষণ ঢোক গেলার মত মুখ করে থাকলেন।

বিজ্ঞানকে কিঞ্চিৎ লজ্জিত দেখাচ্ছে। সে দবজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই স্যার।

—তুমিতো খুব স্বার্থপর লোক হে। আমি একটু দেখতে যাব ভাবছি আব তুমি কিনা বলছ আমাকে একা ফেলে চলে যাবে।

—আমাব ওয়াচ শেষ হতে দেবী নেই স্যাব।

—আরে চল। বলে তিনি কবল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে বললেন, দেখা যাক না ঘটনাটা কেমন ভাবে ঘটছে। বুঝলে স্থানী, ডেসী নামে একটি মেয়ে আমাব কোবনে আসাব কথা ছিল। সে-জগ্ন আমাব ঘুম আসছে না। আব ডেসী মেয়েব মত মেয়ে বটে। ডেসী বেশী মেয়েদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। সে এ ব্যাপাবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতে পারে। এক এক বাতে পাচটা সাভটা লোককে সে হজম করতে পারে।

—তাই বুঝি স্যাব। স্থানীকে ভয়ানকভাবে এ সময় বোকা বোকা লাগছিল।

—একে দেখে কেমন মনে হল ?

—স্যার ওরা এখন শুয়ে আছে। তবে ঘুমোয় নি। ঘুমোলে, কবলের নীচে স্যার ইঁদুর নাচত না।

বাত গভীর এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। অ্যালওয়েব দবজা বন্ধ। ঝড়টা ভিতবে ঢুকতে পারছে না। অথচ বাইবে ভয়ঙ্কর শব্দে যেন আকাশ ফেটে পড়ছে। যেন জাহাজের মাস্তুল এবাব ভেঙ্গে পড়বে। ওবা দুজনে সন্তর্পণে এন্জিন রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল, উভয়ে হেঁটে যেতে থাকল। পাশেব কেবিনগুলোর দরজা বন্ধ। অবনীভূষণ খুব মদ টেনেছিল বলে গতিতে ল্লথ ভাব। অথবা বয়সের ভায়ে ঠিক মত যেন হেঁটে যেতে পাবছেন না। চীক্ বালকেড্ ধরে ধরে হাঁটছিলেন। শরীরের ওজন ভয়ানক, হাত পা শক্ত এবং নিবিড় এক মদিবত। ঠুঁকে এই গতির ভিত্তব আচ্ছন্ন করে বাধতে চাইছে।

বড় মিল্লী চলতে চলতে খুব আস্তে এবং জড়ানো গলায় বললেন, আমার শরীরটা কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে গেছে। এতবাব এন্জিন রুমে নামা-ওঠা কবি ভবু পেটটা নীচু হচ্ছে না। আপদ।

—হ্যাঁ স্যার, আপদ।

—পেট মোটা থাকলে এইসব ঘটনার আনন্দ পাওয়া যায় না। তৃপ্তি নেই।

বিজ্ঞান ভাবল, লোকটা মদ খেয়েছে বলে এত কথা বলছে। কারণ স্থানী

জানিওঁ কিন্তু বিলাতে বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণ গুমডো মুখো। কোন কথা নেই—  
তিনি চুপচাপ এনজিনে নেমে যান অথবা বাংকে গুয়ে গুয়ে অগ্নীল সব বই পড়েন।  
অথবা ব্রীজের নীচে ছোট একটা ডেক চেয়াবে বসে পাইপ টানতে টানতে দূরের  
বন্দব, পাইন গাছ এবং সমুদ্র দেখেন। কোন কথা বলেন না, কোন হাসি-ঠাট্টা  
কবেন না জাহাজীদের সঙ্গে। তখন তিনি যথার্থই বড় মিস্ত্রী জাহাজের।

বিজন একটু থেমে বলল, স্ত্রাব টুলটা নিয়ে আসি। টুলটা না নিলে ঘুল-  
ঘুলিতে মুখ বাখা যাবে না।

কেবিনেব আলো এবং একটি ক্যালেন্ডারের পাঠ্য স্মন্দর এক হৃদেব দৃশ্য  
অথবা অ্যালওয়ে পাব হয়ে অন্য অফিসাবদেব কেবিন ষ্টোব ক্রম এবং ডাইনিং হল  
অতিক্রম কল্লেঙ্কীক্ টুয়ার্ডের ঘব—বাংকে বেস্তা বমণীব স্মন্দর চোখ, সবই  
কোঁতুলোদীপক। সে আগে আগে চলতে থাকল। কোন কথা বলল না।  
অন্য কেবিনে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল না।

বিজন ফিস ফিস কবে বলল, আমি এগে গেছি।

সে টুলটা বালকেডেব পাশে সন্তর্পণে রাখল। বলল, এবাবে উঠুন স্ত্রাব।  
সে আঙ্গুল দিয়ে ঘুলঘুলি নির্দেশ কবে দিল।

—আমাকে উঠতে সাহায্য কব। বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণের শরীর ভয়ানক  
রকমেব মাতাল। তিনি কুকুবেব মত উত্তেজনাতে হাঁসকাঁস করছেন।

বিজন অ্যালওয়েব আলোটা নিভিয়ে দিল। বাইবে ঝড় এবং ঝড়ের গতি  
ঝড়ছে। স্তবৎ ওদের কথাবার্তার শব্দ ঝড়ো হাওয়াব সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বড়  
মিস্ত্রী ফস করে লাইটার জালিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। ওদের মুখ এখন বীভৎস  
রকম দেখাচ্ছে।

বিজন বলল, স্যার এক কাজ করবেন ?

—এখন কোন কাজের কথা নয়, স্থানী তুমি বড় বেশী কথা বল।

—বিজন কোন জবাব দিল না অথচ মনে মনে গাল দিল।

—দেখো স্থানী আমার ভাড়া করা স্ত্রী যদি কাল জাহাজে আসে, তুমি  
আবার এ সব ঘটনার কথা বলে দিও না। মেয়েটি খুব স্মন্দর। বছর পাঁচেক  
আগে নাইট ক্লাবে ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুঝলে স্থানী, তুমি তো মদ খাওনা  
অথচ মেয়েমানুষের শরীর পেলে পেটুকের মত কথাবার্তা বল।

বিজন বলল, স্যার আপনি আমার ওপরওয়ালার ওপরওয়াল। আপনার  
সঙ্গে গ্রাণ থলে কথাবার্তা বলতে ভয় হয়।

—সুখানী, আবার তোমার সেই বেশী কথা।

সুভবাং ভয়ে ভয়ে বিজ্ঞান টুলটা ধরে বাখল। অ্যালওয়ে অঙ্ককাব বলে ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না।

—আমাকে টুলে উঠতে সাহায্য কব। কের ধমক দিলেন বড় মিস্ত্রী।

চীক্ টুলেব উপর উঠে সেই ঘুলঘুলিতে চোখ বাখতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি এই হাক্সা টুলে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। শরীব টলছিল। তিনি একটি শক্ত টুল অধেষণ কবলেন। তিনি বিবক্ত হয়ে বললেন, শক্ত টুল নেই সুখানী ?

—আছে স্যাব। কসপের ঘরে একটা শক্ত টুল আছে। কসপকে ডেকে তুলব ?

—না দরকার নেই। বেশী হৈ চৈ ক'র না, সকলে কুকুরের ঝুঁড়ি এখানে এসে ভিড় করবে। এবং কাপ্তান জানলে রাগ করবেন।

বড় মিস্ত্রী এবাব টুল থেকে নেমে পড়লেন। ফিস ফিস করে করে বললেন, বরং তুমি দেখো ওবা কি কবছে। যা দেখবে, সব বলবে। কিছু লুকোলে আমি ধরতে পারব।

বিজ্ঞান টুলেব উপর উঠে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। গরম হাওয়া ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। ষ্টুয়ার্ড এবং মেয়েটি সম্ভূর্ণে এখন কি যেন লক্ষ্য করছে। ধরগোসের মত ভীত চোখ নিয়ে কি যেন দেখছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ওদের শরীরে কোন আবরণ নেই। ওবা পবম্পব কি বলছে ধরতে পারছে না বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানকে কিছু বলতে না দেখে বড় মিস্ত্রী ক্ষেপে গেলেন।—সুখানী তুমি নেমকহারাম, পাঞ্জি। তিনি দাতে দাঁত চেপে বলছেন।—তুমি নিজে সব দেখছ অথচ আমাকে কিছু বলছ না।

—স্যার ওরা এখন উঠে বসল।

—তারপর সুখানী।

—ওরা বোধহয় টের পেয়েছে।

—মেয়েটি দেখতে কেমন সুখানী ?

—রোগা স্যার। মেয়েটি এখন আবার কখন টেনে গুয়ে পড়ল।

চীক্ ষ্টুয়ার্ড তখন ভিতরে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য কবে বলছিল, মলিন, কারা যেন বাইরে কথা বলছে ? যদি টের পায় তবে নিশ্চয়ই হামলা করবে।

মর্দিন উঠতে চাইল না। বলল, শরীরে ভয়ানক কষ্ট। বাইরে ষড় নতুবা চলে যেতাম, সুমিত্র।



সুমিত্র খুব দুঃখের সঙ্গে একটি হাত ওর স্তনের নীচে রাখল এবং কাছে টানল। বলল, আলওয়েতে এখনও যেন করা চলাফেরা করছে। কথা বলছে। অনেকক্ষণ থেকে এটা হচ্ছে। দরজা খুলে দেখব ?

—এই সুখানী, হারামজাদা। তুমি আমাকে বাগে পেয়ে খুব কলা দেখাচ্ছ হে।

—স্যার ওরা কিছু করছে না।

—নিশ্চয় কবছে। তুমি আমার মিথ্যা কথা বলছ।

ভেতবে মেয়েটি বলল, না আমার শরীর ভাল নেই সুমিত্র। ঠাণ্ডায় জমে গেছিলাম। ~~কিছু~~ খব আমাকে উত্তাপ দিচ্ছে। আমি আজ আর একটি লোককেও সামলাতে পারব না। সে অল্প পাশ ফিবে ঘুমোবার চেষ্টা করল। চীৎ ঝুয়ার্ড সুমিত্র হাঁটু ভাঁজ করে বাথল মেয়েটার এবং নিতম্বের নীচে হাত রেখে ঘন হয়ে গুতে চাইল। অথচ শাস্তি পাচ্ছিল না যেন। সে ফের উঠে বসল। পোর্টহোল খুলে সমুদ্রের গর্জন শুনতে চাইল। ওর শরীর নম্র। ঠাণ্ডা হাওয়া ওকে কাঁপিয়ে তুলছে। ঝুয়ার্ড তাড়াহাড়ি রাতের পোষাক পরে বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে শুনল, বাইরে টেচামেচি স্মুত্তরাং সে একটা হাই তোলার চেষ্টা করল।

—স্যার আমি মিথ্যা বলছি না।

—তুমি আলবৎ বলছ। খুব আশ্বে অথচ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন বড় মিস্ত্রী। বিজন মরীয়া হয়ে বলল, বলেছি ত বেশ কবেছি।

—বশ কবেছ। তুমি বেশ করেছ, আচ্ছা... এইটুকু বলে বড়মিস্ত্রী কড়া নাড়লেন, ঝুয়ার্ড দরজা খোল। আমি বড় মিস্ত্রী। কিন্তু ভিতর থেকে কোন শব্দ হল না বলে তিনি কেব বললেন—আমি। ঝুয়ার্ড আমি কোন হামলা করব না। তুমি বললে আমি তিন সত্য করতে পারি।

তুষার ঝড় সকলকেই নিঃসঙ্গ করে বেখেছে। দীর্ঘদিনের সমুদ্র-যাত্রা অভিক্রম করার পর এই বন্দর, বন্দবে আলো অথবা কোন রাস্তার নীচে বেজা রমণীর আপ্যায়ন ওদের জন্য প্রতীক্ষা করল না। বড় সাহেবের ডেসী আসে নি, সুখানী বাইরে গিয়ে একটু মদ গিলতে পারে নি অথবা রমণীর মুখ দর্শন যেন কতকাল পর, কত দীর্ঘ সময় ধরে ওদের নোনাঙ্গলের চিহ্ন মুখে—রমণীর নরম নরম স্তন্থ এবং চাপ চাপ আশ্বাদন সবই কোন অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত।

এইদিকের কেবিনগুলি কাঁকা। ঝুয়ার্ডের একমাত্র কেবিন। পরে ডাইনিং হল, সামনে ছোট ঘর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য, ডেকের নীচে মাংসের ঘর ডাবপত্র

গোজা সব কাঁকা কেবিন, কারণ এই শীতের অঙ্কলে কোন বাড়ী আসে নি।  
 বারোটি বাড়ী কেবিনে স্মৃতরাং কোন হাঙ্কবের শঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না। ইয়াড' এ  
 সব জেনেই মেয়েটিকে অঙ্ককার জেটির উপর থেকে তুলে সিঁড়ি ধরে জাহাজে দিয়ে  
 এসেছিল—কাবণ সে জেটি থেকে তখন দেখেছে গ্যাডওয়েতে কোয়ার্টার হাঙ্ক  
 নেই, স্মৃতবাং এটাই উপযুক্ত সময়। সে সময়ের সদ্যব্যহার করেও কোন কল  
 লাভ করতে পারল না, এত সতর্কতা তবু সব কেমন কাঁস হয়ে গেল! চীৎকার  
 এবং হামলা আবও বেশী হতে পাবে ভেবে সে দবজা খুলে দিল। তন্নানক শীত  
 এই অ্যালওযেব অঙ্ককাবে। কেবিনেব আলোতে সে বড মিজীর পাথবের মত চোখ  
 ছুটে দেখল। এইসময় চীফ ইয়াড'কে অঙ্কৃত বকমেব তোতলামিতে ধাক্কা দিয়ে বসল।

বড মিজী কেবিনেব ভিতব ঢুকে গেলেন। বললেন, আমি তিন সত্য করছি  
 ইয়াড', আমি কোন হামলা কবব না। আমাকে একটু স্থগ দাও। আমি তবেই  
 চলে যাব। কেমন বেহায়া এবং নিলজ্জ ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন বড মিজী।  
 তিনি ধমকেব স্মবে বিজনকে ডাকলেন, এস। নচ্ছাব সব জাহাজী। এটা  
 তোমাব বাড়ী নয স্থখানী! এখানে মা বাবা ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে আসবে না,  
 এস।

স্থখানী ভাল্ছেলেব মত বড মিজীকে অনুসরণ কবল। সে কেবিনের ভিতর  
 ঢুকল না। সে দবজাব একটা পাল্লা ধবে উকি দিল মাত্র। ইয়াড' সব কিছু  
 দেখছে। ভয়ে ওব তোতলামি পযস্ত বঙ্ক হয়ে গেছে। বড মিজীর চোখ ছুটা চক  
 চক করছে এবং হননেব ইচ্ছাতে একাগ্র। জানোয়ারের মত উদগ্র লালসা মুখে,  
 অবস্রবে। সে দেখল, বড মিজী চেয়ার টেনে বসেছেন, দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন ছবি  
 এবং এই বাংকেব অন্যপাশে মর্লিন—ওর কোমল স্বকের গঙ্ক অথবা মুরগীর মত  
 নরম কলজের উত্তাপ বড মিজীকে এতটুকু অন্যমনস্ক করেছে না। সে ধরের ভিতর  
 নিমজ্জিত অতিথিব মত বসে থাকল।

মর্লিন কব্বলেব ভিতর থেকে উকি দিল। ওর সোনালী চুল বালিশের উপর,  
 ওর নীল চোখ শাস্ত। বড মিজীর বিদঘুটে শরীর ক্রমশ পাশবিকতায় আচ্ছন্ন  
 হচ্ছে। মর্লিন কব্বলের ভিতরে এ সব দেখে ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে। সে অন্য একটি  
 মুখ দেখল দরজার পাশে। সে মনে মনে বড মিজীকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল,  
 ম্যান আমি জানি তোমাকে নিয়ে কোন কোন ভঙ্গীতে ক্রীড়াচাতুর্ষ প্রদর্শন করলে  
 ছুন্নি ছবার, তিনবার অত্যধিক চারবার..কিন্তু শরীর ভাল নেই, বড কষ্ট এই  
 শরীরে, শীতে শরীর মুখ বিবর্ণ এবং ভিতরে ভয়ানক বরফার ভুগছি। ছুন্নি

দুর্ভাগ্যের মত রেহাই দাও। এই দুর্ভাগ্য বাক, বসন্ত আশুক—তখন তোমার কত টাকা আমার কত সুখ বিত্তমান, দেখাব। অথচ মর্লিন কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে ওর শরীর কেবল গুটিয়ে আসতে থাকল।

সুখানী দেখল, বড় মিস্ত্রী কেমন পাগলের মত করছেন। পোষাক আঁকা করার সময় তিনি দরজা খোলা কি বন্ধ পর্যন্ত দেখছেন না। সুতরাং সুখানী নিজেই দরজাটা টেনে দিল।

বড় মিস্ত্রী দুটো শক্ত হাত ওর সোনালী চুলের ভিতর ঠেসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লেন। তিনি মর্লিনের চুলের ভিতর মুখ গুঁজে দিলেন। মর্লিন মৃতপ্রায় পড়েছিল। বড় মিস্ত্রী কন্ডলটা শরীর থেকে বাঁ হাতে ঠেলে দিলেন। ঠোঁট দুটো নীল, বিবর্ণ। ঠোঁট দুটো কামড়ে দেবার সময় দেখলেন, মর্লিন কেমন সাপের মত পিছলে যাচ্ছে। অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলছে, ম্যান আমাকে মেরে ফেল নঃ। আমি আর পারছি না।

মর্লিনের মুখ থেকে তখন থুথু উঠছিল। বাইরে ঝড়, মাস্টার আলোগুলো দুলছে। মেসরুমে বাতি জ্বলছিল। মনসুর আসবে এ সময়। ওর এখন ওয়ুচ। মনসুরকে ডাকতে হবে। যতক্ষণ না ডাকবে ততক্ষণ মনসুর শুয়ে থাকবে। সুতরাং সুখানী বিরক্ত হচ্ছে। বড় বেশী সময় নিচ্ছে বড় মিস্ত্রী। সুখানী দরজা ঠেলে উকি দিতেই দেখল বড় মিস্ত্রী বড় বেশী বেহাঁস। সে ভিতরে ঢুক পড়ল। মর্লিনের শরীর থেকে সুখানী বড় মিস্ত্রীকে শক্ত হাতে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর টানতে টানতে দরজার বাইরে এসে বলল, আপনি দাঁড়ান। বেশী ইত্তরামি করলে ভাল হবে না। ব'লে, সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বড় মিস্ত্রী অবনীভ্রমণ অসহায় পুরুষের মত ঝুঁকড়ে উদ্বেগ করে বললেন, দেখলে কাণ্ডটা, কাল আমি ওকে দেখব।

ঝুঁকড়ে বলল, বড় দুর্বল স্যার। শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। আমি জাহাজে তুলে এনেছি। টাকা ত মুক্তে দেওয়া যায় না। তাই রয়ে সয়ে একটু সুখ নিচ্ছিলাম।

ওরা দুজনই চুপচাপ বালকেড়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

ঝুঁকড়ে অত্যন্ত বিচলিতভাবে কথা বলতে থাকল, স্যার এটা অত্যাচার হচ্ছে ওর উপর। একটা রুগ্ন মেয়েকে দীর্ঘসময় ধরে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

—তার অন্য আশি কি করতে পারি। ব'লে, তিনি অ্যালগয়েতে পাগল হয়ে পড়তে থাকলেন। অন্ধকার অ্যালগয়েতে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সেই

থেকে থেকে আগের মত সমুদ্রগর্জন ভেসে আসছে। তুবার বড়ের 'সাঁঁড়ি' কমছে কি বাড়ছে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে বড় মিজী টের করতে পারলেন না। তিনি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, সুখানী বড় কেরী করছে। ইয়াডের দিকে এখন নজর বড় মিজীর। ইয়াড এখনও কিছু বলছে না।

—তোমার নিশ্চয়ই যেতে ইচ্ছা করছে ভিতরে ?

—স্যাব আপনার কথার উপর আমার কথা বলা সাজে না।

বড় মিজী ভাবলেন, এবার কড়া নাড়বেন দরজার। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। বিজনকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছে। চোখ মুখ উদ্ভিন্ন। বলল, স্যার যেরে মদ আছে ? মেয়েটা কেমন করছে স্যাব ! বড় নিঃশব্দ, একটু মদ দিলে হত।

সুমিত্র বলল, স্যার আমি আগেই বলেছি এত খবল সে সহ করতে পারবে না।

বড় মিজী চাঁৎকার করে বলতে চাইলেন, তুমি একটা অমাত্য, সুখানী। অধচ বলতে পারলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি একটা পশু, তুমি গুপ্ত সুখানী।

—স্যার বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করি নি।

—কিছু কর নি !

—না স্যার, শুধু আদর করছিলাম। কিন্তু কেবল দেখছি মুখ থেকে ওর থুথু উঠছে সাদা সাদা কেনার মত। আমি বার বার আলোতে মুখ দেখলাম। জল দিলাম খেতে। খেল। কের ওয়কম হতেই দরজা খুলে দিয়েছি। আপনারা আসুন।

ইয়াড' কথা বলতে পারছিল না। বড় মিজী বিমূঢ়। নেশার রঙ মুছে যাচ্ছে এবং তিনি এই সময় সারিবদ্ধ উট দেখলেন, ওরা মরুভূমির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সারিবদ্ধ উটের দলটা একটা নগ্ন মানুষকে উদ্ভগ্ন বালুর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক। মানুষটার হাত পা বাঁধা। তিনি প্রায় চাঁৎকার দেবার ভক্তিতে বললেন, ওদিকের দরজা বন্ধ করে দাও। আলো নেভাও বাইরের। স্টোর থেকে মদ নিয়ে এস।

ওরা ভিতরে ঢুকে বাংকের পাশে দাঁড়াল। সবুজ গাউনটা পাশ থেকে তুলে মসিনের কোমর পর্যন্ত টেনে দেওয়া হল। সুখানী পায়ে দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াডের বড় বড় চোখ দুটো স্থির। বিবর্ণ। হাত দুটো বৃকের উপর। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন গলে গেছে। সাদা এবং অন্ধুত এক অবস্থার মুখ যা উপস্থিত

জন্ম কীর্তি ক্রমশ মানুষকে গ্রাস করে।

বড মিস্ত্রী বললেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে নুখানী।

ইয়ার্ড' বলল, যথার্থই হবে যাচ্ছে মর্লিন ?

বড মিস্ত্রী পুনরাবৃত্তি করলেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে নুখানী।

নুখানী বলল, কোনো ডাক্তার .. ?

—ও বাঁচবেনা। ডাক্তার ডাকলে সকলে ধবা পড়ে যাব।

ইয়ার্ড' অত্যন্ত দুঃখেব সঙ্গে জানাল, স্যাব আমবা ওকে মেরে ফেললাম।

বড মিস্ত্রী ধমক দিলেন, আশ্তে কথা বল। এত বেশী বিহ্বল হবে না।

পোর্টহোল খুলে দেখে ঝড়ের গতি কি বকম ? এবং বড মিস্ত্রী এই নিশ্চিত মৃত্যু জেনে  
বেন বলতে চাইলেন, এতটুকু পাশবিকতা যে সহ্য কবতে পাবেনা তাব মর্যাই উচিত।

নুখানী পোর্টহোলের কাঁচ সত্তর্পণে খুলে মুখ গলাবাব চেষ্টা করল। বাইরে  
ঝড়। এবং জলের উপর অন্ধকার। দূবে সমুদ্রের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা  
জাহাজ দেখল সে বাইবে। জাহাজটা লকগেট দিয়ে বন্দরে ঢুকছে। সে সমুদ্রের  
বুকে পাহাড়টা দেখল, আলো, ঘব বাড়ি দেখল। জাহাজটা এখন এখানেই নোঙর  
ফেলবে। সে জাহাজীদের হাড়িয়া হাপিজের শব্দ এবং যাত্রীদের কোলাহল এই  
পোর্টহোল থেকেই শুনতে পেল। সে বলল, ঝড় কমে যাচ্ছে স্যাব। তারপর  
বলল, পাশে একটা জাহাজ নোঙর ফেলছে।

বড মিস্ত্রী হাঁটু গেড়ে বসলেন মর্লিনের পাশে। ওব কপালে মুখে গাত বুলিয়ে  
দিতে থাকলেন। বড মিস্ত্রী ভিতরে খুব কষ্ট অহুতব করছিলেন। ভয়ানক কষ্টবোধে  
তিনি নুখানীব কোন কথা শুনতে পাচ্ছেননা। ইয়ার্ড' স্টোর রুমে গেছে মদ আনতে ;  
ভিনি ভাল করে মর্লিনের শরীর ঢেকে বসে আছেন। একটু মদ খেলে যদি  
উত্তেজনা আসে। অথবা বাঁচবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর ইচ্ছা হল মেজ-  
মালোমকে ডেকে এই ঘটনার কথা, গুণুধের কথা অথবা কোন বুদ্ধির জন্য...তিনি  
আর ভাবতে পারছিলেন না। ইয়ার্ড' এ সময় মদ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল, মদটুকু  
ঠোটের কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

ইয়ার্ড' বলল, কি হবে স্যার !

বড়সাব বললেন, জানতে পারলে কাঁসি হবে।

এই ধরনের কথার চোখ গোল গোল হয়ে উঠল ইয়ার্ডের। সে ক্রান্ত ব'লে  
চলল, আনুন তবে ওকে পোর্টহোল দিয়ে জলে ফেল দিই স্যার। কেউ  
পারেনা।

—ওকে ভাল করে মরতে দাও। তা ছাড়া বাইরে বাড়ী জাহাজ একে  
থেকেছে।

—এখন অনেক রাত স্যার। আসুন ওকে জেটিতে কেল আসি।

—গ্যাঙওয়েতে স্থানী মনসুর আছে। এই সব ঘটনা কাক-পক্ষীতে টের  
পেলে পর্যন্ত কপালে দুঃখ থাকে।

—কি হবে স্যার? আগে এমন ঘটবে জানলে মর্লিনকে তুলে আনতাম না  
স্যার। কি কক্ষণে এই বন্দরে এসেছি। ঝড়, ঝড় শুধু ঝড়।

ওদের ভিতর নানা ধরনের কথা হচ্ছিল। এবং এই সব বিচিত্র সংলাপ ওদের  
তিনজনকেই সাময়িকভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে নির্বিকার করে রাখছে। এ সময়  
ওরা তিনজনই ওর পাশে বসল। বড় মিস্ত্রী বললেন, এস আমরা তিনজনই ওকে  
কোলে নিয়ে বসে থাকি। ওর মৃত্যু আমাদের জাহাজ উপর সংঘটিত হোক এমনত  
এক আবেগদীপ্ত কথায় অবনীভূষণ চোখ বুজলেন। তাঁর মনেই হলনা শরীর থেকে  
যে সব জাহাজী যন্ত্রণা নেমে এই মেয়েটির দুর্বল শরীরে গরল ঢেলেছে তারা এখনও  
একই শরীরে বিদ্যমান। তিনি ঘেন কোন এক উপাসনা গৃহে বসে আছেন  
এমতই এক গভীর প্রত্যয়ের চোখ। তিনি বললেন, এস ওকে আমরা শান্তিতে  
মরতে দিই। কারণ আমরা জানিনা ওর নিকট-আত্মীয় কেউ আছেন কি না,  
আমরা কোন পুরোহিতকেও ডাকতে পারছিনা, স্মরণে ঈশ্বরের নাম আমরাই  
স্মরণ করব। আর এই গৃহই আমাদের উপাসনাগৃহ।

কেবিনের নীল দেয়ালে একটা মাকড়সা অনবরত নীচ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে।  
ওদের তিনজনের কোলের উপর মর্লিনের মুখ, শরীর। দেয়ালে পা ঠেকে আছে।  
জাহাজের শরীর কখনো আবৃত। রাত্রে ওর ওভারকোট। হাতের দস্তানা নীল  
রঙের। চোখ দুটো মর্লিনের ক্রমশ সাধা হয়ে আসছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে  
পড়ছে। ওরা তিনজনই এই মৃত্যুর দ্বারা আভূত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর পরবর্তী  
ঘটনা সম্পর্কে ভাবছিল। ওরা দেখল—চোখ দুটো সাধা হতে হতে একেবারে  
স্থির হয়ে গেল। একটা ঢেকুরের মত শব্দ, তারপর মৃত্যু।

ওরা মর্লিনের মৃত শরীর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বড় মিস্ত্রী পায়চারী করলেন  
কেবিনে। দেয়ালে শরীর রেখে মর্লিনের মুখ দেখছিল স্থানী। সে একটু হেঁটে  
গিয়ে কবল দিয়ে মর্লিনের মুখটা ঢেকে দিল। ইয়াত দেয়ালে টানানো ময় চিত্রের  
কোণের থেকে—আজ কত তারুণ্য, কি মাস, কি বছর এবং বন্দরের নামটা পর্যন্ত  
জেনে আঁকল। ইয়াত, বড় মিস্ত্রী এবং স্থানীর নির্বিকার ভঙ্গি দেখে দুঃখিত

হল। সে বলল, স্যার সারা রাত আমরা মড়া আগলে পড়ে থাকব।

বড় মিস্ত্রী কি ভেবে ঘেন দরজা খুললেন, এবং বাইরে যাবার উপক্রম করতেই স্থানী হাত চেপে ধরল, স্যার আপনি আমাদের কেলে চলে যাচ্ছেন ?

—তোমাদের কেলে যাচ্ছি না স্থানী। মলিনেব জন্য বাইরে একটু জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি।

স্থানী বলল, দরজা বন্ধ করে দেব স্যার ?

—নাও। বড় মিস্ত্রী অ্যালওয়ে ধরে হাঁটতে থাকলেন। গ্যাঙওয়েতে মনসুর বসে আছে। তিনি গ্যাঙওয়েতে নেমে যেতেই মনসুর উঠে দাঁড়াল এবং আদাব দিল। তিনি লক্ষ্য করলেন না ওসব। তিনি জাহাজময় ঘুরে জোটতে, জোটের জলে মলিনকে ফেলে রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে থাকলেন। তিনি কোথাও জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি দেখলেন সর্বত্র এক নিদারুণ নিরাপত্তার অভাব। তিনি দেখলেন, সর্বত্রই ঘেন কে জেগে আছে, ওঁদের এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এ সময় ওঁর কের মদ খেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু এ সময় মদ খাওয়া অস্বাভাবিক কারণ মলিনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তিনি তারপর দেখলেন ডেকের উপর থেকে একটা শুকনো পাতা উড়ে উড়ে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকল। তিনি ভাবলেন, মলিনের শরীরে কোন কোন আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান...মলিন একবার ব্যাথায় চিৎকার করে উঠেছিল অথবা পাশবিকতার চিহ্ন এখনও ওর শরীরে বিদ্যমান কিনা অথবা স্থানী এবং ইয়ার্ড ওর শরীরে মাংস ভক্ষণের মত কোন উদ্গার নিক্ষেপ করেছে কিনা, যা ওঁদের তিনজনকেই গ্রাস করবে...তিনি ছুটেতে থাকলেন, তিনি তাড়াতাড়ি কেবিনের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললেন, ইয়ার্ড দরজা খোল—ইয়ার্ড। ইয়ার্ড।

কেবিনের দরজা খুললে তিন বাঁকের মত ঢুকে মলিনের শরীর থেকে কবল তুলে নিলেন। ওর শরীরের শেষ আবরণটুকু খুলে ঝুঁকে পড়লেন উপরে। স্থানী এল, ইয়ার্ড এল। বড় সাব চবুকের নীচে হাত রেখে বললেন, এই দাঁতের চিহ্ন কার ?

স্থানী অত্যন্ত সঙ্কচিত চিন্তে বলল, স্যার আমার। মলিনের সামনে মিথ্যা বললে পাপ আর বাড়তে চাইনা।

বড় মিস্ত্রী ভীষণ চোখে মলিনকে দেখতে লাগলেন। স্থানীর কথার সঙ্গে বিজ্ঞেও বিড় বিড় করে বললেন, শরীরের এসব চিহ্ন দেখে পুলিশ ঘরে কেলেবে, ইয়ার্ড বলল, স্যার পুলিশ আমাদের ঘরে নিজে যাবে।

—আমাকেও নেবে। বড় মিস্ত্রী একবার সুখানীর দিকে তাকালেন।

সুখানী বলল, বড় আমাহুয়িক!

ইয়াদ'বলল, এই তুমার ঝড় এ-জন্য দায়ী।

বড় মিস্ত্রী বললেন, পুন্নিশের ধবে আমাদের বিচার হওয়াই উচিত। সুতরাং এস ওকে এখন আব কোথাও নিক্ষেপ না করে এখানেই ফেলে বাধি।

এইসব কথা বলাব পব সকলে দাঁড়িয়ে থাকল। সকলে পবম্পবকে চোখ তুলে দেখল।

ইয়াদ'বলল, স্যাব যা হয তাডাতাডি করুন।

—সুখানী'ব সঙ্গে তোমার এখানেই ফাবাক। এ সব কাজ তাডাতাডি হয়না।

—তাডাতাডি হয়না?

—না, হয় না।

—স্যাব আপনি ঠিক কথা বলেছেন।

—আমাদের এখন ভাবতে হবে কোন অপবাধই আমবা করিনি। এখন শুয়ে পড়লে ঘুমোতে পাবব এমন একটা মনেব অবস্থা সৃষ্টি কবতে পারলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেহাই পাওয়া যাবে। যদিও আমবা জানি মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং বোস।

বড় মিস্ত্রী ফেব বললেন, একটু কফি হলে ভাল হত। সুখানী কি বলছে।

—তা মন্দ নয় স্যাব।

ইয়াদ'ব কিছু বেব হতে চাইল না। কারণ ওর ভয় কফি আনতে গেলেই ওরা এই কেবিন ছেড়ে চলে যাবে এবং ভোব বেলায় যখন সব জাহাজীরা,—তখনও অন্ধকার থাকবে ডেকে, তখনও সূর্য ভাল করে আকাশের গারে ঝুলবেনা,—সকল জাহাজীরা ডেক ছাদ অথবা এনজিনে নেমে যেতে যেতে গুনবে ইয়াদ'বের ধরে একটি তরুণীর মৃতদেহ—কম্বলের নীচে ইয়াদ'ব মৃতদেহটিকে আগলে রেখেছিল।

ইয়াদ'বলল, স্যার আমার মাথার ভিতবটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। ওদের উত্তর করতে না দেখে বলল, স্যার আন্সন মলিন'কে পোর্টহোল দিয়ে আঁটির জলে কেলো দি।

—যখন লাস ফুলে ফেঁপে জলের উপর ভেসে উঠবে, যখন দাঁতের কামড় দেখে তোমার দাঁতের চিহ্ন নেবে তখন...?

—কোথাও কোন উপায় নেই।

—জাপাতড দেখতে পাচ্ছি না।



সুখানী বলল, বড় দুঃখজনক পরিস্থিতি।

বড় সাব অন্ত্রয়নকভাবে মলিনের দস্তানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

ইয়ার্ড'য়েন ক্ষেপে গেল।—স্যার আমার কেবিনে এ সব হচ্ছে। আপনারা আমাকে অপাতে চাইছেন। আপনারা যদি আমাকে এ কাজে সাহায্য না করেন আমি একাই ওকে বয়ে নিয়ে যাব। ইয়ার্ড' তাডাতাডি কথলেব ভিতর থেকে মলিনকে তুলে কাঁধে ফেলল তারপর দরজা দিয়ে বের হতেই বড মিস্ত্রী ওব হাত চেপে বলল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে!

ইয়ার্ড' এবাব কেঁদে ফেলল, স্যার আপনারা এ ঘটনাকে আমলই দিচ্ছেন না! আমাকে আপনারা ধরিয়ে দিতে চাইছেন। ঘরে আমার স্ত্রী আছে, সন্তান-সন্ততি আছে।

এইসব কথায় তিনি যথার্থই অভিভূত হলেন। তিনি ধীবে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে গেলেন। চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। এবং অবিবাহিত জীবনের কিছু সুখ দুঃখের কথা স্মরণ করতে পেরে যেন বলতে চাইলেন, ইয়ার্ড' তুমি, আমি সকলে এক সরল পাশবিকতার মোহে আচ্ছন্ন। কখনও ঘরে, কখনও উঠোনে এবং দূরের যব গম ক্ষেতের ভিতর নগ্ন শরীর আমাদের শুধু কামুক করে তোলে। অথবা এই জাহাজ আমাদের কত দীর্ঘ সময় সমুদ্র এবং আকাশের ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে—শুধু নোনা জল, কখনও প্রবাল দ্বীপ এবং নির্জনতা, জাহাজের অস্থির এনজিনের শব্দ, দেয়ালের উল্লঙ্গ সব ছবি আমাদের নিরন্তর নিষ্ঠুর করে রাখছে। সুতরাং দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার পর বন্দর এবং রমণীর দেহ স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। মলিন মরে গেছে। এস ওর শরীর আমরা সম্বন্ধে রক্ষা করি। বন্দরে বড়। এ অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত। দেশটাতে এখন শীতের শেষ-কুয়াশা লেগেই থাকবে। ডেসী এমন দিনে আসবে না।

এডক্ষণ সকলকে চুপচাপ থাকতে দেখে সুখানী মলিনের চুল মৃষ্ঠার ভিতর তুলে বলল, স্যার দেখুন, এই সোনালী চুল কী অপূর্ব! সুখানী ভাবল, কি ভাবে আর কথা আরম্ভ করা যায়। ইয়ার্ড' ভয়ে কঁচাচ কঁচাচ করে কাঁদছে। সুখানী দুঃখিতভাবে বলল, এই সোনালী চুলে মলিন স্যার সুগন্ধ তেল মাখত। গাছটা কিন্তু এখনও জীবিত মেয়েদের মত। তারপর সে একটা ঢোক গিলে বলল, স্যার আপনি পর্বস্ত ভয়ে টেসে গেলেন! কথা বলছেন না! চুপচাপ বসে মলিনের হাতের দস্তানা আপনার শক্ত হাতে গলাবার চেষ্টা করছেন।

ইয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, এস, তোমাকে লাসটা নামিয়ে রাখতে সাহায্য করছি।

বড় মিস্ত্রী বাংক থেকে নেমে পোর্টহোলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাঁচের ভিত্তি থেকে পাশের জাহাজ স্পষ্ট। কাঁচ খুলে দিলে জাহাজীদের শব্দ পেলেন। যাত্রীজাহাজ বলেই সেখানে মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ বেখে ভাবলেন, এই পোর্টহোল দিয়ে লাসটাকে হাডিয়া কবে দেওয়া যাক। ঝুয়াডেব ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না আঁব ভাল লাগছে না। বস্তুত বড় মিস্ত্রী নিজেকে এই মৃতদেহ নিয়ে কি ক'রা যাবে ভেবে উঠতে পারছেন না। তাঁর মাথার ভিত্তিও শূন্যতা এসে আশ্রয় কবেছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ বেখেই বললেন, ঝুয়ার্ড, সুখানী, মলিনকে কাঁধে নাও। তাড়াতাড়ি পোর্টহোল দিয়ে গলাবাব চেষ্টা ক'বলে, তিনি পাগলের মত পোর্টহোলটাকে টেনে টেনে ফাঁক ক'বাব চেষ্টা ক'বতে থাকলেন।

সুখানী বলল, স্যাব আপনাবও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল।

বড় মিস্ত্রী গোল গোল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তবে আমবা কি ক'বতে পারি সুখানী? সমস্ত জাহাজ ঘুরে দেখলাম মার্লনকে কোথাও বাঁধা যাচ্ছে না। যেখানেই বাঁধতে যাব—সেখানেই ধ'বা পড়ে যাচ্ছি। তাবপব তিনি থেমে থেমে বললেন, আহা ওকে যদি সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারতাম। সমুদ্রে ফেলে দিলে কোন চিহ্নই পাওয়া যেত না।

সুখানী বলল, স্যাব তবে আনুন ওকে ব'বফ ঘবে বেখে দি। ডেডা গ'রুব সঙ্গে পড়ে থাকবে। কেউ টেব ক'বতে পারবে না। জাহাজ সমুদ্রে গেলে ওকে ফেলে দেওয়া যাবে।

বড় মিস্ত্রীব ব'পাল কুঁচকে উঠল। তিনি আড়চোখে সুখানীব দিকে চাইলেন। যেন, সুখানী এখানে একমাত্র বুদ্ধিমান এবং স্থিরচিত্ত পুরুষ। সুতবাং তিনি ওব উপবই নির্ভর ক'বতে পাবেন এমত এক নিশ্চিত মত পোষণ ক'বছেন মনে মনে। তিনি বললেন, ঝুয়ার্ড কি বলে?

ঝুয়ার্ড কোন কথা বলছে না। সুখানী ওদেব দুজনকে অল্পশাসনের ভঙ্গীতে বলল, তবে আর দেবী ক'বে লাভ নেই। ওকে কাঁধে তুলে নেওয়া যাক।

মলিনের হাত পোর্টহোলে গলানো ছিল এবং মাথাটাও। পোর্টহোল থেকে ওর শরীর বুলে পড়ছিল। ঝুয়ার্ড ওর কোমব একটু উপরে তুলে রেখেছে। বড় মিস্ত্রী ডানদিকে দাঁড়িয়ে মলিনের ওলপেটের নীচে হাত রেখে ঝুয়ার্ডকে ধরে

রাখতে সাহায্য করছিলেন।

ওরা তিনজন মিলে মলিনকে বাঁকে শুইয়ে দিল। ওরা প্রথমেই দরজা খুলে দিল না। স্থানী এখন মাঠে দাঁড়িয়ে কোন সেনাবাহিনীকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে। সে বলল, স্যার দরজা খোলার আগে আমাদের কান পেতে শুনতে হবে, বাইরে কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। তারপর দরজা খুলে একজনকে ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি আসে তবে শিস অথবা হাতের ইসারা। ইতিমধ্যে মলিনকে রসদঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করে ছাদের ঢাকনা খুলে মলিনের লাস নীচে হাডিয়া করে দিলেই ভয় থেকে নিষ্কৃতি। সে রাজ্যটা চাঁক্ ষ্টুয়ার্ডের একান্ত নিজস্ব। এবং আশা করব জাহাজ যতদিন না বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে যায় ততদিন ষ্টুয়ার্ড মলিনকে আগলে রাখতে পাববে। তাই বলে স্থানী ষ্টুয়ার্ডের কাঁধে চাপ দিল।

এনজিন রুমে নেমে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। অ্যাকোমডেশান ল্যাডার ধরে ডেক-ছাদে উঠে যাওয়ার পথটাতে বড় মিস্ত্রী কড়া নজর রাখছেন। তাছাড়া ডাইনিং হলের পথটা স্পষ্ট দৃশ্যমান। বড় মিস্ত্রী অ্যালওয়ারের আলো নিভিয়ে পাহারাদারদের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখন বাইরে বাড় নেই বললেই হয়। এনজিন রুমে কোন ফায়ারম্যান হয়ত ওয়াচ দিতে নেমে যাচ্ছে, বুটের ঠক ঠক শব্দ সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নীচে নীচে—তিনি সন্তর্পণে অন্ধকার থেকেই বললেন, এবার তোমরা রসদঘরে ঢুকে যাও। কেউ নেই।

স্থানী মলিনের মাথার দিকটা ধরেছিল। ষ্টুয়ার্ড পায়ের দিকটা ধরে বাইরে নিয়ে এল। তারপর রসদঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার আগে ডাকল, স্যার তাড়াতাড়ি চলে আসুন। অ্যালওয়ারের আলো জ্বলে দিন।

ওরা ধীরে ধীরে মলিনকে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। টেবিল থেকে কাঁচের ডিস এবং অন্যান্য সব পানীয়ের পাত্র তুলে অন্যস্থানে রেখে দিল। এই ঘরে অন্যান্য দরজা খুললে জাহাজীদের রসদ, নীচে রসদ ঘর—ভিন্ন ভিন্ন রকমের সব সজ্জা এবং সজ্জির গন্ধ আসছে এই ঘরে। ওরা এ সময় মলিনের শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ল।

ষ্টুয়ার্ড বলল, কখন দিবে ঢেকে দি !

—বরং ওর গাউনটা নিয়ে এস।

মলিনের নগ্ন শরীর ভয়ানক কুৎসিত দেখাচ্ছে। বড় টেবিলের উপর ওর শরীর মৃত ব্যাঙের মত, হাত পা দুটো শীর্ণ এবং চুলের সেই গন্ধটা তেমনি ফুর ফুর করে

উড়ছে। চোখ দুটো এখনও শুধু স্থির। ওর বকের পাঁজর স্পষ্ট। স্তনের সর্বত্র মাতৃস্বের চিহ্ন ধরা পড়ছে। ঝুয়ার্ড এবার কেমন শিউরে উঠল। এই শুকনো স্তনের আশে পাশে সহসা সে দেখল অঠরে নিমগ্ন কোন যুবক বেন হাত বাড়ানো। সে তাড়াতাড়ি কবল এনে ওর শরীর ঢেকে দিল।

ওরা এখন সকলেই কথা কম বলছে। বড় মিস্ত্রী ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, নীচে হাড়িয়া করে দেওয়া যাক তবে।

--সাব! ঝুয়ার্ড ডাকল।

--বল।

—আপনি স্যার আমাদের ওপরওয়াল। আপনি আমাদের সাহস দিন।

যেন এই পশুবৎ আচরণ অথবা নিষ্ঠুর ইচ্ছার দ্বারা প্ররুষ্ট এই যুবতীর সকল অস্তিত্বের করুণা ক্রমশ জাহাজের ঘুলঘুলিতে মূখ রাখছে। দেয়ালে ওদের ছায়া পড়ছিল। সুখানী কেমন বিকৃতভাবে একটা ঢোক গিলে বলল, আমি নীচে নেমে যাচ্ছি। আপনারা উপর থেকে ওকে জলদি হাড়িয়া করুন। এই বিসদৃশ ঘটনা চোখে আর দেখা যাচ্ছে না।

বড় মিস্ত্রী নীচের ঢাকনা খুলে দিল। নীচের ঘরগুলো অন্ধকার। সুখানী সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার আগে নীচের আলো জ্বলে নিল। ঝুয়ার্ড হাঁটু গেড়ে বসল। নীচের ঘরগুলোতে ভয়ানক ঠাণ্ডা। আলু পেরোজ এবং শাক-সজ্জি এখান থেকে কিছু কিছু চোখে পড়ছে। বরকের ঠাণ্ডা স্রোত সুখানীকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছে। সব কিছু ক্লান্তিকর। সে এবার উপরের দিকে তাকাল। বড় মিস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে ডাকছেন।

ওরা তিনজন বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়ালো। ওরা তিনজন মাথার, কোমরে এবং পায়ে হাত রাখছে। বড় বড় চিনেমাটির বাসন টেবিলের নীচে, কাবার্ডে টি-সেট সাজানো। মাদক দ্রব্য পানের নিমিত্ত সব পাতলা কাঁচের পাত্র ইতস্তত সজ্জিত। বড় মিস্ত্রী অন্যমনস্ক ছিলেন। পা সরিয়ে আনার সময় কিছু কাঁচের পাত্র ভেঙ্গে নীচে গড়িয়ে পড়ল। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ টেবিলের উপর বড় দর্পণে তিনজনের প্রতিবিম্ব, মলিনের শক্ত শরীর সবই তীতিগ্রস্ত। মলিন ওদের দিকে বেন শক্ত চোখ নিয়ে চেয়ে আছে। সুতরাং নিরন্তর এক পাপবোধ ওদের তীব্র তীক্ষ্ণ করছিল।

ওরা এবার মলিনকে কোলের কাছে নিয়ে শব-বাহকের মত সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার সময় স্তম্ভশূন্য ছাদের ঢাকনা টেনে খুব ধীরে ধীরে—বেন এতটুকু আওয়াজ

না হয় অথবা যেন মলিনের গায়ে আঁচড় না লাগে—ওরা মলিনকে এ সময় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছিল। অথচ মলিনের শরীর মুরগীর মত ঠ্যাংএর মত কদম এবং কঠিন। এই আলিঙ্গনের উষ্ণতা ওদের তিনজনকেই ভাবপ্রবণ করে তুলছিল।

মলিনের মুখ থেকে সব রঙ মুছে গেছে। চোখে টানা কাজলের চিহ্ন তখন চোখের নীচে এবং ক্রুর আশেপাশে লেগে আছে। পুতুলনাচের নায়িকার মত চোখমুখ। ওরা মলিনকে দরজাব সামনে গুইয়ে দিল। বরফ ঘরের তালা খুলে দিল ষ্টুয়ার্ড—বড় বড় সব মাংস, গরু ভেড়া শূকর এবং গোটা গোটা খড় তাকেব মধ্যে ঝুলছে। অথবা বড় বড় সব টার্কির মাংস—সোদা গন্ধ সর্বত্র, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এই বরফ ঘরে। ওরা তিনজনই ভিতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি মলিনকে একপাশে রেখে একটা ত্রিপলে ঢেকে বের হয়ে পড়ল। দরজা টেনে সিঁড়িতে ওঠার মুখে প্রথম কথা বলল ষ্টুয়ার্ড—স্যার কাল ভোরে যখন চীক্-কুক রসদ নিতে আসবে, কি বলব?

—রসদ দেবে।

—ওরা ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই রসদের ওজন দেখে। দরজাটা খোলা থাকলে দেখার ভয় আছে।

—দরজা বন্ধ রাখবে।

—দরজা সব সময় বন্ধ রাখলে সন্দেহ করতে পারে। কারণ মেস-রুম যেট গোস্তু কেটে এনে ওজন করে দেয়।

—মেস-রুম যেটকে ভোর বেলায় অন্য কাজ দেব। রসদ ভাল দেবে, ওজন বেশী দেবে। সবাই খুশী থাকবে তবে। কেউ সন্দেহ করবে না।

ষ্টুয়ার্ড তবু সিঁড়ি ধরে উঠল না। সে বরফ ঘরের দিকে পিছন ফিরে তাকাল। সে নড়ছিল না। সে বিড় বিড় করে কি সব বকছিল। সে দরজাটার সামনে হেঁটে গেল। দরজা খুলতেই দেখল পাটা মলিনের খালি। সে ত্রিপল দিয়ে পাটা ঢেকে দরজা বন্ধ করে তালাটা লাগাল। তালাটা টেনে দেখল ক'বার। যখন দেখল তালাটা ঠিকমত লেগেছে—কোথাও কোন গোপন বিশ্বাসভঙ্গ উঁকি দিয়ে নেই অথবা যখন সবই অতি সন্তুর্ণণে সংরক্ষিত হল...আর কি হতে পারে, ষ্টুয়ার্ড এইসব ভেবে সন্দেহের ভঙ্গীতে বলল, স্যার এটা আমার ভাল লাগছে না। অর্থাৎ এমন মনে হচ্ছে যেন ষ্টুয়ার্ড নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে।

এতক্ষণ পর মনে হল, বড় মিস্ত্রীর গলাটা জিজ্ঞাসা হচ্ছে। এতক্ষণ পর একটা

চুরুটের কথা মনে হল। তিনি চুরুটে আশ্রয় দিয়ে বললেন, কেন কি হতে পারে ?

সুখানী মুখ বিকৃত করে বলল, ওর কথা বাদ দিন স্যার।

—সুখানী যা বোঝনা, তা নিয়ে কথা বলতে এস না।

—বেশ চুপ করে থাকলাম।

ষ্টুয়ার্ড বলল, আর একবার নামলে হয় স্যার।

—কেন ? আবার কেন !

—দেখতাম কোথাও কিছু পড়ে থাকল কিনা। ষ্টুয়ার্ডকে খুব বিষন্ন দেখাচ্ছে। যেন এই হত্যার জন্য ওকে সকলে দায়ী করে সরে পড়ছে। সে বলল, স্যার ধরা পড়লে আমি সকলের নাম বলে দেব। কাউকে ছাড়ব না। আপনারা সকলেই ওকে কামড়েছেন।

বড় মিস্ত্রী ধমক দিলেন, ষ্টুয়ার্ড তোমার মন অত্যন্ত ছোট।

—স্যার আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন না। আপনারা কাল থেকে যদি এমুখো না হন তবে কি করতে পারি ! ষ্টুয়ার্ডের গলায় কান্না ভেসে উঠল !

সুখানী পায়ের নখে ডেকেব কাঠে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করছিল। বড় মিস্ত্রী ষ্টুয়ার্ডের মুখ দেখছেন। সে মুখ বিবর্ণ। তিনি এবার ষ্টুয়ার্ডের হাত ধরে বললেন, রাতে আমবা কোথাও যাব না ষ্টুয়ার্ড। ছাদের নীচে বরফ ঘরে মলিনের পাশে বসে থাকব। কোন ভয় নেই তোমার।

ওরা তিনজনই এবার যার যার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। ষ্টুয়ার্ড নিজের কেবিনের দরজা খুলে দিল। দরজার পাল্লাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সে দরজা বন্ধ করতে যেন সাহস করছে না। ওর ভয় করছে। এতদিনের জাহাজী জীবন অথচ কখনও এমন নিষ্ঠুর ঘটনার দ্বারা সে আহত হয়নি।

বড় মিস্ত্রী কিছু বলতে পারছেন না। তিনি খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

সুখানী বলল, শুয়ে পড় ষ্টুয়ার্ড। রাত আর বেশী নেই।

সুখানীর ঘর ডেক পার হল। সে কোকসালে থাকে। জাহাজের শেষ দিকটাতে জাহাজীদের জন্য অনেকগুলো ঘর। সুখানী এবং ডেক-কসপ সেখানে থাকে—পাশাপাশি বাংকে।

সুতরাং সুখানী বাইরে এসে দেখল, রাত কমে যাচ্ছে। সুখানী হাতের দস্তানা খুলে কেলল। রাত শেষ হচ্ছে। বরফ পড়ছে না। ঝড় নেই। এক শান্ত

নীল রঙ জাহাজের শরীরে যেন লেপ্টে আছে। কুয়াশা নেই। সুতরাং শহরের আলো স্পষ্ট। আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। যে সব জাহাজ উষ্ণ শ্রোতে সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয়েছিল ওরা একে একে ফিরে আসছে। সে এই শীতের ভিতর রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। রাতের সব ঘটনা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। দেশ বাড়ির কথা মনে হল। জীবর কথা মনে হল—সন্তান সন্ততি অর্থাৎ এক স্ননিপুণ সাংসারিক জীবনের কথা ভেবে এই জাহাজী জীবনকে দিক্কার দিতে থাকল। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, হৃদয়ের ঘরে সব মরে গেছে, কারণ এই মৃত্যুজনিত বেদনা স্থানীকে আড়ষ্ট করছেনা, মর্লিন মরে গেছে—জাহাজের অন্যান্য জাহাজীরা যুমে ময়, শুধু ওয়াচের জাহাজীরা জেগে ওয়াচ দিচ্ছে। যদি পুলিশ খোঁজ করতে আসে, যদি এই হত্যাজনিত দায়ে একটা লম্বা দড়ি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে...স্থানী ভয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল এবার। তারপর আরও সব ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা ভেবে সে চুপি চুপি ঝুয়ার্ডের কেবিনে ফিরে যাবার জন্য পা চালাল। এক দুারোগ্য ভয় স্থানীকে নিঃসঙ্গ পেয়ে জড়িয়ে ধরছে।

সে ঝুয়ার্ডের কেবিনে এসে দেখল, দরজা খোলা। পাল্লা ধরে ঝুয়ার্ড আগের মত দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, এই! এই! হচ্ছে কি! এবং মনে হচ্ছে বহুজনিত মৃত্যু। স্থানী ওকে নাড়া দিল বার বার। এবং ঝুয়ার্ড কে টেনে নিল বাংকের কাছে; তারপর ধমক দিয়ে বলল, কি হচ্ছে এটা! এমন ভীতু লোকের জাহাজী হওয়া চলেনা। চুপচাপ শুয়ে থাক। এমন করবে ত খুন করব।

স্থানী যুরে গিয়ে বড় মিস্ত্রীর কেবিনের সামনে দাঁড়াল। কেবিনের দরজা খোলা। বড় মিস্ত্রী একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছেন। শরীরে কোন জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছেনা।

স্থানী ডাকল, স্যার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে নড়লেন না।—দরজাটা টেনে দাও স্থানী। বড় মিস্ত্রী টেবিল থেকে মাথা তুললেন না। মর্লিনের সাদা চোখ ওঁকে তখনও অম্লসরণ করছে যেন। তিনি কেবিনে পায়চারী করতে থাকলেন। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পায়চারী করার ইচ্ছা। ভোরের বাতাসে পাখীরা যখন উড়বে, যখন কোথাও কোন হত্যা অথবা রাতের দুর্ঘটনাজনিত দুঃখ মান্ডলের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন বড় মিস্ত্রী বাংকে শুয়ে ঘুম যাবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু অধিক সময় তিনি পায়চারী করতে পারলেননা। তিনি বাংকে শুয়ে পড়লেন।

সুখানী ডেক ধরে হেঁটে চলে গেল। সে নিজের কোকসালে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকল। আলো জ্বালল না। দরজা বন্ধ করে পোর্টহোল খুলে সামনে মুখ রেখে বসে থাকল। রাতের সব পাখীদের দেখে ইতস্তত ছড়ানো নাবিকদের সব ছবি দেখে এবং দূরের জেটিতে একটি শিশুর কারা জুনে ওরও মলিনের জন্ম কষ্ট হতে থাকল।

ওরা তিনজন জাহাজেব তিনটি ঘরে পোষা পাখীদের মত ঘুমোচ্ছিল। বরফ ঘরে মলিন। ত্রিপলে শরীর ঢাকা পড়ে আছে। অন্যান্য কেবিনে দীর্ঘদিন পব রাতের এই প্রহরটুকুকে জাহাজীরা আশ্বাদন কবছে। ঠাণ্ডার জন্য সকলেই কেমন কুঁকড়ে ছিল। কোয়ার্টার মাষ্টার গ্যাডওয়ার্ডের ওয়াচ শেষ করে কোকসালে কিরে আসছে। ভোরের আলো ফুটে উঠলে সকলে বেলিঙে ভর কবছে—জেটি অতিক্রম করে শহরের বাস ট্রাম এবং রমণীদের প্রিয়মুখ...তাবপর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্ভিন্ন এক জীবন ...আহা এই দেশ, মাটি, পাব, নাইট ক্লাব—সুখ শুধু সুখ, উলঙ্গ এক চিন্তা সব সময়ের জন্য—জাহাজীরা দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর সুখ নামক উলঙ্গ এক নগরে হাঁটছে যেন।

ওরা তিনজন পোষা পাখীর মত স্বপ্ন দেখল।

বড় মিস্ত্রী স্বপ্নের কোলাহলে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখে অনেকদূর চলে যেতে থাকলেন। তিনি দূরে সব চীনার গাছ দেখলেন, আকাশ দেখলেন অথবা দেখলেন পাইনআপেলের নীচে সুল্লরী রমনীগণ নগ্ন হয়ে বসে আছে। তিনি বড় বড় চীনার গাছ কাঁক করে চলে যাচ্ছেন। ডেইজী ফুলের গন্ধ কোথাও এবং সামনে সেই উলঙ্গ নগর। তিনি পোষাক পরিত্যাগ করে সেই নগরে প্রবেশ করে কেবল ইচ্ছা দিতে থাকলেন।

বড় মিস্ত্রী স্বপ্নের ভিতর বিগত জীবনের কিছু মহত্তম ঘটনা দেখতে পেলেন।

সুখানী স্বপ্ন দেখল—একটা উট মরুভূমি থেকে নেমে আসছে। ওর সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক উলঙ্গ নারীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বরফঘরে ছাল তুলে নেওয়া গন্ধ অথবা শূকরের মত দেখাচ্ছে রমণীকে। উট দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এক মরুস্থানে প্রবেশ করল। সামনে নীল হ্রদ। হ্রদের জলে উট নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ববতী প্রাণ পাচ্ছিল। যখন খেজুর গাছের পাতাগুলো সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছিল তখন সুখানী দেখল যুবতী সেই উটের পিঠে বসে এবং হাজার হাজার পুরুষ সেই



যুবতীর জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হচ্ছে। যুবতী বসে বসে প্রেমের আধার থেকে কণা মাত্র বিতরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখানী কের যখন উটটিকে দেখল তখন স্বপ্নের ভিতর উটটি চলাকেরা করছিল—উটের পায়ে দড়ি এবং দড়িতে রমণীর শরীর আবদ্ধ। সেই এক ঘটনা বার বার চোখের উপর পুনরাবৃত্তি হতে থাকল।

সুখানী স্বপ্নের ভিতর শেষ পর্যন্ত এলবিকে দেখল। এলবির সক্রিয় চোখ এবং কান্না স্বপ্নের অলি গলি থেকে বের হয়ে আসছে।

আর ষ্টুয়ার্ড একটা মৃত ক্রিমি হয়ে বাঁকে পড়েছিল। নড়ছিল না। সাদা ক্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। অবচ ওর স্বপ্নে একটা তাজ' গোলাপ ফুল ফুটে ছিল সব সময়। চেবী নামক এক যুবতীর মুখ সেই ফুলের ভিতর থেকে বাব বার উঁকি দিচ্ছে। সে শুয়ে শুয়ে শুধু ঢোক গিলল। ওর স্বপ্নের শেষটুকু ছিল একটি পুরুষ-অশ্বের নীচে শুয়ে একটি নগ্ন যুবতী বার বার সহবাসের চেষ্টা করছে।

তারপর জাহাজে ভোর হল। সকলেই উঠে পড়ল একে একে। এখনও জাহাজডেকে অন্ধকার আছে। সারেঙ সকলকে বলল, টাণ্টু। ওরা উপরে উঠে এল। ওরা জল মারতে আরম্ভ করল ডেকে। এনজিনের জাহাজীরা এনজিন সারোঙের সঙ্গে নীচে নেমে গেল। বয়লারের স্মোকবক্স পরিষ্কার করার জন্য কয়েকজন কোলবয় তরতর করে সিঁড়ি ধবে উপরে উঠে গেল। মেজ মিস্ত্রী একবার নীচে নেমে ব্যালেষ্ট পাম্পের আশে পাশে টর্চ মেরে কি যেন অনুসন্ধান করে গেছেন—উপরে এখন ডেক-জাহাজীরা ডেকে জল মারছে। রাতে যে তুষার ঝড় হয়েছিল জল মেরে তার শেষটুকু যেন পরিষ্কার করে দিচ্ছে। একটু বাদে আলো ফুটেবে। এবং রোদ উঠবে।

ডেক-জাহাজীরা গাম্-বুট পরে জল মারছিল। হিমেল হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। জেটি অতিক্রম করলে বালিয়াড়ী। এ দেশে এবার বসন্ত আসছে। বালির চরে নতুন ঘর উঠছে। কানিভেল বসবে। গাছের পাতাসকল ঝুঁড়ি মেলেছে। ডেক-জাহাজীরা এই শীতের ভিতর রোদের উষ্ণতার জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং তীরেব দৃশ্যসকল দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার মানি মুছে দিচ্ছিল।

ঠিক এ সময়েই ষ্টুয়ার্ড দরজা খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। ওর স্বপ্নের কথা মনে হল এবং মনে হল ভাণ্ডারী, চীফ কুক আসবে রসদ নিতে। তারপর গত রাতের মলিন, মৃত্যু এবং হত্যাজনিত দায়—সবকিছু ওকে কের গ্রাস করতে থাকল। সে রাধকমে গেল না, চোখ মুখ ধুল না—রসদ ঘরে ঢাকনা খুলে তরতর

করে নীচে নেমে গেল। বরফ ঘরের দরজা খোলার আগে ভাবল, বড় বড় ভাল গোস্ত বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেবে। সে মেহুর কথা ভাবল। কি মেহু হবে এমত একটা আন্দাজ করে দরজা খুলতেই সে ভয়ে এবং বিন্ময়ে হতবাক! দেখল, মর্লিনের মুখ খোলা। মর্লিনের মৃত সাদা চোখ ওকে দেখছে। সে সেই ছোট ত্রিপলে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখল পা বের হয়ে থাকছে। সে টানাটানি করল অনেকক্ষণ। কিন্তু পা মাথা একসঙ্গে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে পারল না।

ষ্টুয়ার্ড একা ব'ল হুক থেকে গোস্ত নামাতে দেরী হচ্ছিল। ওর কষ্ট হচ্ছিল খুব। কি করবে কি না করবে ভেবে উঠতে পারছে না। একটা অম্পষ্ট আশংকা ওকে সব সময় বিব্রত করছে। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। ছাদে পায়ের শব্দ। ভাগুরী চীক কুক নেমে আসছে। ওদের শব্দ পেয়ে সে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। মর্লিনকে টেনে টেনে বরফ ঘরের বালকেডের পাশে নিয়ে গেল। ষ্টুয়ার্ড দেখল, ওর অনাবৃত দেহেব রঙ এবং এই বাসি গোস্তের রঙ ছবছ এক। সে ঝুলানো ষাঁড় গরুর ভেতব থেকে দেখল ওরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সে কেমন মাথার ভিতব যন্ত্রণা বোধে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সে দুবাব খুঁটের নাম স্মরণ করে ভূতের মত নতুন এক বুদ্ধির আশ্রয়ে চলে গেল—কপিকলটাকে এগিয়ে এনে মর্লিনকে পায়ে গোঁথে হুকে ঝুলিয়ে দিল। সে নীচে বসে সব দেখতে দেখতে ভাবল—এই অনাবৃত শরীবের রঙ নিয়ে মর্লিন এখন গরু ঘোড়া হয়ে গেল। দরজা থেকে মর্লিনের অম্পষ্ট শরীবের বঙ এবং আকার আধপোড়া শূকরের মত দেখাচ্ছিল। ষ্টুয়ার্ড বুল, এই ঘরের দেয়াল, ছাদ এবং হকের সর্বত্র একই দুঃখময় নৈরাশ্রে নিমজ্জিত। সে দরজার ভিতর দিয়ে ঝোলানো গোস্তের সঙ্গে মর্লিনের এতটুকু প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছে না। সে এবার কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারল। রসদ বের করে অগ্রাঙ্ক দিনের মত কম বেশী করার স্পৃহাতে মেসকুম-মেটকে ডেকে আলুকপির ঘরে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে ঢুকে গেল।

অগ্রাঙ্ক দিনের মত চীক কুকের সঙ্গে ষ্টুয়ার্ডের বচসা হল না রসদ নিয়ে। চীক কুক উন্টেপাটে গোস্ত দেখল। ওরা রসদ নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ডেক-ভাগুরী এবং এনুজিন ভাগুরীও রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেল। ষ্টুয়ার্ড সকলকে ছুটো করে আলাদা ডিম দিয়েছে। চীক কুককে আলাদা অক্সটেল দিয়েছে। সকলেই মোটামুটি খুশী। ওরা সকলে রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেলে ষ্টুয়ার্ড কের বরফ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। অনেকগুলো ঝুলানো মাংসের লাস অতিক্রম করে মর্লিনের পিঠি এবং মাথার ডান দিকের অংশটা অম্পষ্ট এক শূকরের মাংসের

মত। টার্কিয়ার পোটের দিকটার মত নিভবের ভাঁজ। এই ঘরে মর্লিন শূকর ভেড়া অথবা গরুর মত শরীর নিয়ে এখন হুকে ঝুলছে। শুকনো স্তন এবং অল্প কিছু দেখার জন্তাই সে এবার ভিতরে ঢুকে মুখোমুখী দাঁড়াল। মর্লিনের তলপেট সংলগ্ন মুখ, সোনালী চুলে এখনও তাজা গন্ধ, অথচ মর্লিনকে মরা মাংস ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। সে পোটের নীচে হাত বুলাতে থাকল অশ্রুমনস্কভাবে।

যে ভয়টা নিরন্তর কাজ করছিল ষ্টুয়ার্ডের মনে এসময় সেই ভয়টা কেটে যাচ্ছে। সে বলল, মর্লিন আমরা তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব। সে প্রদক্ষিণ করার মত মর্লিনের শরীরটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখল। সে বলল, এই নিষ্ঠুরতার জন্ত গতকালের তুষার ঝড় দায়ী। অথচ মনে হল—নিরন্তর সে তার অপরাধবোধকে দূরে রাখার স্পৃহাতে এমন সব কথা বলছিল। সে নিজের মনেই হেসে বলল, শুধু মাংস ভক্ষণে তৃপ্তি থাকে না মর্লিন।

তারপর সে দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

জাহাজে দৈনিক কাজ জাহাজীরা করে নিচ্ছে। সারাদিন কাজ। দিন ছোট ব'লে রাতের কিছু অংশও ওদের কাজের ভিতর ঢুকে গেল। সারাদিন কাজের পর এক সময়ের জন্য বড় মিস্ত্রী, ষ্টুয়ার্ড এবং সুখানী একত্রে বসে ছিল। ওরা কোন কথা বলে নি। কারণ রাতে একই দুঃস্বপ্ন এসে এদের জড়িয়ে ধরবে ওরা জানত।

ওরা প্রতি রাতে জাহাজের কেবিনে দুঃখী জাহাজীর মত বসে থাকত।

একদিন ওদের পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায় সুখানী বলল, বড় সাব, বাইরে রোদ উঠেছে।

বড় মিস্ত্রী বললেন, সুখানী, চল মর্লিনকে দেখে আসি।

—স্যার ও-ভাবে মর্লিনকে আমি দেখতে পারব না। স্যার, বরং আমাদের পুলিশের কাছে ধরা দেওয়া ভাল। এ ভাবে একটা মৃতদেহের উপর কুৎসিত আচরণ করে জাহাজে আমি বাঁচতে পারব না। রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। যেখানে যখন থাকছি মর্লিন মৃত পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকছে।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যার আমার সামনে শুধু ঈশ্বরের থাবা। যেখানে থাকছি সেখানেই গলা টিপে ধরতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রী দেখছেন ধীরে ধীরে ওরা তিনজনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। বড় মিস্ত্রী বললেন, রাতে আজকাল একই স্বপ্ন দেখছি—আমার স্ত্রী সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন।

ব্রত । চোখ মুখ পচে গেছে ।

সুখানীর চোখ মুখ লাল । ওর শরীর বাংকের উপর হিংস্র থাথা নিয়ে বসে আছে ।

বড় মিস্ত্রী ষ্টুয়ার্ডকে বললেন, ষ্টুয়ার্ড, মর্লিনকে সন্ধ্যার পর শুইয়ে রাখবে । আমি আর সুখানী শহর থেকে ফুল নিয়ে আসব । ওর পোষাক যেন পরানো থাকে । আমরা মর্লিনকে ভালবাসাব চেষ্টা করব ।—সুখানী, তিনি সুখানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আমার মনে হয় যদি যথার্থই আমরা মর্লিনকে ভালবাসতে পারি, যদি মনে হয় মর্লিনের শরীর প্রীতিময়—তখন আমাদের পাপবোধ নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হবে । কারণ আমরা সকলেই একদিন এ রকম ছিলাম না । আমরা ঘুমোতে পারব । সারারাত কঠিন দুঃস্বপ্ন আমাদের আগলে থাকবে না ।

সুখানী বলল, বরং আমাদের জীবনেও কিছু কিছু মহত্তর ঘটনা আছে যা মর্লিনকে ফুল দেবার সময় বলতে পারি ।

পাঁচটা না বাজতেই জাহাজ ডেকে রাত নেমে এল । বাইরে ঠাণ্ডা । শীত যাবার আগে যেন বন্দরটাকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে । ভোরের রোদটুকু এবং আকাশের পরিচ্ছন্নতা এই শীতকে তীব্র তীক্ষ্ণ করেছে । ওরা তিনজন গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল । ওরা ওভারকোট পরেছিল, মাথায় ফেন্টক্যাপ ছিল ওদের : বড় মিস্ত্রী হাতে একটা ষ্টিক রেখেছেন ।

সুখানী সহসা বলল, স্যার ষ্টুয়ার্ডের ফিরে যাওয়া উচিত । মর্লিনকে জাহাজে এক। ফেলে রাখা উচিত হয়নি । অগ্নি কেউ যদি ওকে আবিষ্কার করে ফেলে ?

বড় মিস্ত্রী বললেন, আরে না ! তুমিও যেমন—ষ্টুয়ার্ড ফাঁক পেলেই ওখানে ঘুর ঘুর করবে এবং ধরা পড়ার সন্যোগ করে দেবে ।

এ সময় ওরা সমুদ্রের ধারে ধারে কিছু পুরুষ এবং রমণী দেখতে পেল । জেটির জাহাজগুলো অতিক্রম করে ছোট এক মাঠ, কিছু টিউলিপ ফুলের গাছ । বার্ট জাতীয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওরা হেঁটে যাচ্ছে । সমুদ্রের ধারে সব লাল নীল রঙের বাড়ি । এবং সাদা আলো । সমুদ্রের জল বাতাসের সঙ্গে উঠে আসছে । ইতঃস্তত ভিন্ন ভিন্ন পাব এবং নাইট ক্লাবের লাল বিজ্ঞাপন । অগ্নিদিন হলে ষ্টুয়ার্ড এইসব নাইট ক্লাবে ঢুকে যেত, ওদের উলঙ্গ নাচ দেখে সারারাত কান্নুক হাওয়ায় ভেসে বেড়াত । সুখানী, পাবের ধারে অথবা রাস্তার মোড়ে পালকের

টুপি পরে সং দেখানোর মত যারা দাঁড়িয়ে থাকত তাদের একজনকে বগলে চেপে বালিয়াড়িতে নেমে যেত—কিন্তু আজ ওরা তিনজনই শুধু দেখছে, ওরা ভাল ফুল কেনার জন্ত পথ ধরে হাঁটছে।

বড় মিস্ত্রী ষ্ট্রাড'কে উদ্দেশ্য করে বললেন, মলিন'কে জেটির কোন্ জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিলে ?

—জেটির তিন নম্বর ফ্রেনের নীচ থেকে।

সুখানী ষ্ট্রাড'কে পুলিশের মত জেবা করে বলল, সে তখন কি করছিল ?

—একজন জাহাজীকে স্মৃতি দিচ্ছিল।

—কতক্ষণ ধরে ?

—খুব শীত। সময় আমি হিসাব করিনি।

—তুমি ওকে কি বললে ?

—আমি একটু স্মৃতি চাইলাম।

—উত্তরে সে কি বলল ?

ওরা উঁচু নীচু পথ ধরে হাঁটছিল। ওরা শহরের বাজার দেখার জন্ত এবং ফুল কেনার জন্ত উঠে যাচ্ছে। বড় সাব চলতে চলতে লাঠি ঘুরাচ্ছিলেন, যেন তিনি কুকুরের দোঁড় দেখতে যাচ্ছেন। হত্যাজনিত কোন ভয়ই ওদের এখন নেই, এমত চোখমুগ ওদের সকলের।

—সে বলল, একটু গরম দাও আমাকে, নইলে শীতে মরে যাব।

বড়সাব ধমকের সুরে বললেন, সুখানী আমরা এই বন্দর-পথ ধরে কোথায় যাচ্ছি ?

—স্যার, ফুল কিনতে।

—কিন্তু গোটা পথটা ধরে তুমি একটা পেটি দারোগার মত কথা বলছ !

বড় মিস্ত্রীকে খুশী করার জন্ত সে বললে, আজ ভোরেও স্যার কাগজ দেখলাম। শহরের কতৃপক্ষ মলিন' সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। শহর থেকে একটি মেয়ে গায়েব হয়ে গেল অথচ...

ষ্ট্রাড' নাকের মধ্যে রুমাল ঢুকিয়ে ভিতরটা পরিষ্কার করল। এবং বলল, নিরুদ্দিষ্ট কলামটা দেখেছিলে ?

—হ্যাঁ দেখেছিলাম বৈকি। ওতে আছে, এক ভদ্রমহিলার একটি কুকুর নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। কুকুরের যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে দশহাজার পাউণ্ড পুরস্কৃত করা হবে। স্যার, চলুন একটা কুকুর ধরে নিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে যাই।

ওরা একটা পথের মোড় ঘুরল। এই পথটা একটু অন্ধকার। ওরা ক্রমশঃ সমুদ্র থেকে দূরে সরে আসছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে না আর। বাতাসের সঙ্গে তেমন জলীয় কণাও নেই। আগন্তুক তিনজনকে শহরের পুরুষ ও রমণীগণ দেখছিল। নীল আলো, হিমেল হাওয়া এবং পথের বাস, ড্রামের শব্দ, নাইট ক্লাবের সঙ্গীত, কাকের, বার মিলে একটা রহস্যের অন্ধকার যেন এই পথটার ভিতর ঢুকে শুক হয়ে আছে। ওরা এখানে থামল। একটা বাড়ির ভিতর থেকে কিছু কুকুরের চীংকার ভেসে আসছে। ওরা দেখল, উপরে লেখা আছে ‘কুকুর ভাড়া পাওয়া যায়।’

ওরা একসময় একটা সরু লেগুনের পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। উঁচু নীচু পথ। সমুদ্র বড় স্তম্ভপূর্ণ খুব সরু পথ করে শহরের ভিতর ঢুকে গেছে। গতবার ডেসী এবং বড় মিস্ত্রী এখানে নৌকা বাইচ দেখতে এসেছিলেন। ডেসীকে নিয়ে বড় মিস্ত্রী কোন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—নৌকা বাইচ দেখার পর লেগুন অতিক্রম করে এক নির্জন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় একটি বার্চগাছের নীচে অথবা দূরের সব পাহাড়শ্রেণী পার হলে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের গ্রাম্য এক পাবে সারাদিন মাতলামি এবং অন্তর অনেক সব ছোট ঘটনার স্মৃতি ভিতর থেকে বেয়ে বেয়ে উঠছিল।

বড় মিস্ত্রী, স্থানীয় এবং ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললেন কারণ যে-সেতুটা এই লেগুনকে সংযুক্ত করছে সেখানে হরেক রকম যুবক যুবতী লেগুনের জলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে এবং প্রেম নিবেদন করছে। দূরে পাহাড়শ্রেণী, মাথায় লাল নীল অজস্র আলো। লেগুনের নীল জলে সরু সরু স্বীপ বাঁধা। ছই আছে এবং অনেকটা ঘরের মত—যেখানে ইচ্ছা করলেই কোন বেশী রমণীকে নিয়ে রাত কাটানো যায়। ডেসী এবং বড় মিস্ত্রী অনেকবার এই সব স্বীপে রাত কাটিয়েছেন—ওদের দুজনকে আজ তিনি এ কথা জানালেন। জাহাজে রোজ রোজ ডেসী যাচ্ছে আর রোজ রোজ তিনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এ-কথাও জানালেন। নির্মল এই আকাশ, মাথার উপর পাহাড়-শ্রেণীর অজস্র আলো এবং দূরের কোন গ্রাম্য পাবের কিশোরী এক বালিকার মুখচ্ছবি—বড় মিস্ত্রীকে প্রাণ খুলে কথা বলবার

জন্ত উৎসাহ দিচ্ছিল।

বড় মিস্ত্রী বললেন, কি ফুল কিনবে?

ওরা তখন সেতু অতিক্রম করে নীচে বাজারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

সুখানী বলল, রজনীগন্ধা দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যাবে না।

সুখানী একটা ফুলের নাম মনে আনার চেষ্টা করছিল। অথচ কিছুতেই সে নামটা স্মরণ করতে পারছে না। ফুলগুলি এ অঞ্চলে পাওয়া যায়, ঠিক রজনীগন্ধারই মত। ফুলগুলির গায়ে মোমের রঙ অথবা যেন কচি আঙুরের স্তবক এবং সুগন্ধময়। সে ভাবল, সেই সব ফুলের ষ্টিক কিনে নেওয়া যাবে।

ওরা বাজারে ফুলের গলিতে ঢুকে গেল।

ইয়াদ'বলল, স্যার আমরা ব্যবহারে যথার্থই মাহুঘের মত হবার চেষ্টা করব। আমরা মদ খাবনা এই কদিন।

—এটা ভাল প্রস্তাব বটে। বড় মিস্ত্রী মাথা নাড়লেন।

ওরা ফুল নিয়ে জাহাজে উঠে গেল এক সময় এবং ভালবাসার অভিনয় করার জন্য নাটকের প্রথম অঙ্কের গর্তে ঢুকে গেল।

কেবিনে ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। দেয়ালের সাদা রঙ কেবল এই কেবিনে শূন্যতা সৃষ্টি করছে। ওরা পরস্পর কিছুক্ষণের জন্য অপরিচিতের মত মুখ করে বসে থাকল। ওয়াদের ঘণ্টা পড়ছে। সারাদিন জেটিতে যে চঞ্চলতা ছিল, রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে আসছে। দূরে সমুদ্র গর্জন করছে। আকাশ তেমনি পরিষ্কার। এই জাহাজের বুকে নক্ষত্রের আলো এসে নামছে। তিনজন নাবিক বসে থাকল। রাতের নিঃসঙ্গতার জন্য বসে থাকল। ওরা মলিনের জন্য মলিনের পাশে হুংথ লাঘবের জন্য বসে থাকল। ওরা আগের মতই চুপচাপ। দূর থেকে আগত সমুদ্র গর্জন শোনার জন্যই হোক অথবা এই জাহাজের কোন কক্ষে রমণীর মৃত শরীর হুকে ঝুলছে, রমণীর ঘর সংসার, ওদের হৃৎস্পন্দ সকল.....মাহুঘ এক নিলজ্জ ইচ্ছার তাড়নাতে ভুগছে এই সব চিন্তা, তারপর সমুদ্র অতিক্রম করে সেই প্রিয় সংসার এবং মাঝে মাঝে পুলিশ নামক এক জঙ্ঘর ডাক...ওরা ভয়ে পরস্পর এখন তাকাতে পারছে না।

ইয়াদ'বলল, আনুন স্যার একসঙ্গে নামি। একা একা নামতে ভয় করছে। ইয়াদ'হাতের দস্তানা বের করল বালিশের ভিতর থেকে। ওভারকোট নিল এবং জুতো জোড়া বের করবার সময় সুখানী চীংকার করে উঠল, ইয়াদ' একটা

রাঙ্কেল। স্যার, সে মলিনকে হুক থেকে নামায় নি। আমি যাব না স্যার।  
আমার বীভৎস দৃশ্য সহ্য হবে না।

বড় মিস্ত্রী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মত হাসলেন। বললেন, ওটা বীভৎস বললে চলবে  
কেন স্থানী ?

ষ্টুয়ার্ড বলল, আপনিই বলুন স্যার।

বড় মিস্ত্রী ফের বললেন, আমরা এই মাহুয়েরা বীভৎস স্থানটুকুর জন্যই লড়াই  
করছি। সংগ্রাম বলতে পার অথবা লোভ লালসা, চরম কুংসিত বস্ত্রটির জন্ত  
আমাদের কামুক করে রাখে। এবার বড় মিস্ত্রী স্থানীকে দু হাতে ঠেলে রসদ  
ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, তুমি যদি পা দুটো উপরের দিকে ঠেলে  
দিয়ে দেখ, কি দেখবে স্থানী ? একটা মুখের মত অবয়ব দেখবে, নাক দেখবে,  
গম্বর দেখবে। শুধু চোখ নেই। কবন্ধের মত অথবা অন্ধ বলতে পার। আর  
অন্ধ বলেই সকল অত্যাচার সহ্য করেছে। অন্ধ বলেই এত কুংসিত, এত ভয়ানক  
এবং আমাদের এত ভালবাসা।

রসদ ঘরে আলু পেঁয়াজের গন্ধ। ডিমের শুকনো গন্ধ। বাসি বাঁধাকপির  
গন্ধ মলমুত্রের মত। স্থানী ফুলগুলি এবার বুকে চেপে ধরল। ষ্টুয়ার্ড বরফ  
ঘরের দরজা খুলে বড় মিস্ত্রীকে দেখাল—কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার ?

বড় মিস্ত্রী যথার্থই কিছু দেখতে পেলেন না। সারি সারি হুকে বড় বড় বাঁড়ের  
শরীর ঝুলছে। ভেড়া এবং শূকর। টাকির শরীর পর্যন্ত। সব এক রঙ। এক  
মাংস এবং শুধু ভক্ষণের নিমিত্তই তৈরী। তিনি নিজেই এবার ভয়ে চীৎকার  
করে উঠলেন, মলিন, মলিন কোথায় ষ্টুয়ার্ড !

ওরা একটি টেবিল সংগ্রহ করে মলিনকে সমস্ত তার উপর রেখে দিল। পোষাক  
পরানো হল। পায়ে জুতা এবং ফুলগুলি ওর মাথার কাছে রেখে ওরা বসে  
থাকল নির্বোধের মত। বড় মিস্ত্রী পায়ের দিকটায় বসে আছেন। দু পাশে  
স্থানী এবং ষ্টুয়ার্ড। ওরা মলিনের মুখ দেখছিল। যত ওরা মৃত মুখ দেখছিল  
তত ওদের এক ধরনের আবেগ গলা বেয়ে উঠে আসছে। ওর প্রতি আচরণে  
এতটা নির্বোধ না হলেও চলত এমত এক চিন্তার দ্বারা ওরা প্রভত হচ্ছে। বড়  
মিস্ত্রীই বললেন, এই মৃত রমণীর কাছে আমাদের জীবনের ঐশ্বর্য কি মহত্তর ঘটনা  
আছে যা বলতে পারি—তিনি এইটুকু বলে উঠে দাঁড়ালেন—এমন কি ঘটনা  
আছে জাহাজী জীবনে যা বলে এই ভীষণ বিষমতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি ?



সুখানী বলল, ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে। এইটুকু বলে চিবুকে হাত রাখল সুখানী। কিছুক্ষণ কি যেন দেখল সমস্ত ঘরটার ভিতর। পাশে একটা হাঁড়ের শরীর খুলছে। এবং মাঝে মাঝে ওর শরীরে এসে ধাক্কা দিচ্ছে যেন। সে বলল, আমরা সকলেই জীবনের কোন না কোন মহন্তর ঘটনা বলব। চিরদিন আমরা এমন ছিলাম না।

ষ্টুয়ার্ড বলল, মহন্তর ঘটনা বলতে পারলে ফের আমরা ঘুমোতে পারব।

বড় মিস্ত্রী পায়ের কাছটায় বসলেন আবার।

ষ্টুয়ার্ড দেখল ওদের সকলের চোখ ধীরে ধীরে কোটবাগত হচ্ছে। চোখের নীচে এক ধরনের অপরাধবোধের চিহ্ন ধরা পড়েছে, সে সুখানীকে বলল, আচ্ছা সুখানী, আমার চোখের নীচে কালি পড়েছে?

—আমনায় দেখো। আমার ত মনে হয় তোমারই সব চেয়ে বেশী!

সুমিত্র, বড় মিস্ত্রী অবনীভূষণকে উদ্দেশ্য করে বলল, স্যার কাপ্তান আমাকে বলেছেন, তোমার কি কোন অনুশ করছে ষ্টুয়ার্ড? তোমাকে খুব পীড়িত দেখাচ্ছে!

অবনীভূষণ বললেন, তুমি আবার বলনি তো, রাতে স্মার ঘুম হচ্ছে না। কেমন এক অশরীরী পাপবোধ চারধারে ঘোরাফেরা করছে! বলনি তো!

—আমি পাগল নাকি স্যার! আমি এমন কথা বলতে পারি!

সুখানী এবার কঠিন গলায় বলল, তুমি পাগল। আলবত পাগল। পাগল না হলে একটা রুগ্ন বেগ্না মেয়েকে কেবিনে কেউ তুলে আনতে পারে?

—স্যার আপনি শুনুন। নালিশের ভঙ্গীতে বলল সুমিত্র।

—সুখানী, তুমি বেগ্না বলবে না। মর্লিন বেগ্না হলে তোমার মা-ও একটা বেগ্না।

বড় মিস্ত্রী তার মাকে বেশ্যা বলেছে—বিজ্ঞ ভাবল। সে সুখানী জাহাজের আর অবনীভূষণ বড় মিস্ত্রী জাহাজের। সুতরাং বড় মিস্ত্রীর বিজ্ঞের মাকে বেশ্যা বলার এক্তিয়ার আছে। সুতরাং বিজ্ঞ চুপচাপ বসে থাকল। কোন জবাব দিল না। নির্বোধের মত তাকাতে থাকল ফের ঘরের চারিদিকে।

সুমিত্র আর দেরী করতে চাইল না। সে বলল, স্যার আমার জীবনে একটা মধুর ঘটনা আছে। অনুমতি দিলে বলতে পারি।

—বলবে? অবনীভূষণ অদ্ভুতভাবে ঠোঁট চেপে কথাটা বললেন।

—স্যার বলে ফেলি। আগেই বলে ফেলি। আগে আগে যদি একটু

সুমোতে পারি।

—বল।

সুমিত্র গল্প আরম্ভ করার আগে মলিনের মুখের কাছে খুব ঝুঁকে পড়ল। বলল, এই মুখ দেখলে, স্যার আমার শুধু চেরীর কথা মনে হয়। তখন জাহাজে স্যার তেলয়ালার কাজ করতাম।

বিজন এবার উঠে দাঁড়াল। আমি স্থানীয় জাহাজের, তাছাড়া আমি স্যার এই তিনজনের ভিতর সকলের ছোট। আমাকে সকলের আগে বলতে দেওয়া হোক। বলে সেও মলিনের মুখের কাছে ঠিক ঝুঁকানোর মত ঝুঁকে পড়ল। সে বলল, এই মুখ দেখলে শুধু এলবির কথা মনে হয়। তখন স্যার আমাদের জাহাজ অষ্ট্রেলীয়াতে।

সুমিত্র চীৎকার করে উঠল, বেয়াদপ!

বড় মিস্ত্রী দেখলেন ওবা ঝগড়া আরম্ভ করছে—তিনি বললেন, বরং গল্পটা আমিই বলি। বলে তিনি আরম্ভ কবলেন—শেষ রাতের দিকে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরেছে। আমি তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব। আমাদের জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। আমরা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখছি। স্মৃতরাং দীর্ঘদিন পর বন্দর পেয়ে তুমার রাতেও আমাদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। আমাদের মেজ মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইছিলেন……।

অবনীভূষণ কিছুক্ষণ থেমে সহসা বলে ফেললেন, একি ঝুঁকানো তুমি বাসি বাঁধা কক্ষির মত মুখ করে বসে আছ কেন? শুনছ তো গল্পটা।

—কি যে বলেন স্যার।

—বুঝলে তোমাদের অবনীভূষণও বিকেলের দিকে সাজগোজ করে তুমার ঝড়ের ভিতরই বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ঙ্কর বড় বেটপ জুতো পরে অবনীভূষণ গ্যাঙায়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজো মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ মালোম বেশ সুন্দর। এক যুবতীকে নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালী ব্লাউজের উপর কারের মত লম্বা কোট গায়ে।

—তুমার ঝড়, স্মৃতরাং গাছের পাতা সব ঝরে গেছে। আর পাতা ঝরে

গেছে বলে কোন গাছই চেনা যাচ্ছে না। ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে,, পাইন হতে পারে এমন কি বাচ' গাছও হতে পারে। আমার সঙ্গে আমার প্রিয় বন্ধু ডেক এপ্রেক্সিস উড ছিল। গীতে পথের দু পাশে কাঠের বাড়ী এবং লাল নীল রঙের শাসির জানলা এবং বড় বড় জানালার ভিতর পরিবারের যুবক যুবতীদের মুখ, একভিগ্যানের সুর, গ্রাম্য কোন লোক সঙ্গীত তোমাদের অবনীভূষণকে ক্রমশঃ উত্তেজিত করছে।

বড় মিস্ত্রী এবার স্থানানিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার সব হবছ মনে পড়ছে। নাচঘরে অবনীভূষণ দুজন যুবতীকে একলা দেখতে পেল।

—তখন ব্যাণ্ড বাজছে, হরদম বাজছে। মদের কাউটারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছিল। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গভি'গী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে এমন গল্পও করল। ভিড় সেই কাঁচঘরে ক্রমশঃ বাড়ছিল। মিশনের ডানদিকে মন্সন ঘাসের চত্বর আর মৃত বৃক্ষের মত কিছু পাইন গাছ— তার নীচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেঁই উঁচু এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাঁচঘর অতিক্রম করে কাউটারের সামনে লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। হারপুনার সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে হাঁটছে। অথবা তোমাদের অবনী-ভূষণের মনে হচ্ছিল যেন কে বা কাবা সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে... ট্যানি টরেণ্টো... ট্যানি টরেণ্টো.....

রাত ক্রমশঃ বাড়ছিল। গল্প ক্রমশঃ জমে উঠছে। মলিনের সাদা মুখ এবং পায়ের নীচে বসে বড় মিস্ত্রী সব দেখতে পাচ্ছিল। এখন যেন আর এই মুখ দেখে অবনীভূষণের এতটুকু ভয় করছে না। তিনি এবার প্রিয় মলিনকে উদ্দেশ্য করেই যেন গল্পটা শেষ করলেন—অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘদিন পর তিনি এক অসামান্য কাজ করে স্কেলেছেন। বুঝলে মলিন, তোমার এই বড় মিস্ত্রী সেই জাহাজে আবদ্ধ যুবতীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন আমি বাইরে তুবার ঝড়ের ভিতর বসে আপনার পাহারায় থাকছি। বলে তোমার বড় মিস্ত্রী দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার ভিতর পা মুড়ে বসেছিল এবং জেগে জেগে এক বিষময়কর স্বপ্ন.....বীপের স্বপ্ন— বড় এক বাতিঘর বীপ, সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী—জাহাজের মাঝালে তোমাদের অবনীভূষণ 'মাছুবের ধর্ম' বড় বড় হরকে এই শব্দ বুলতে দেখল

অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মার্গিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই।

বড় মিস্ত্রী জীবনের সেই মহৎ গল্পটুকু বলে সকলকে দুঃখিত করে রাখলেন। মর্লিনের মৃত শরীরে এবার ওরা ফুল রাখল। এবং ওরা যথার্থই এখন এই মাংসের ঘরে সেই যুবতীকে প্রত্যক্ষ করল।

সুখানী, বড় মিস্ত্রী ফুল রেখে উপরে উঠে যাচ্ছে। পিছনে ষ্টুয়ার্ড দরজা বন্ধ করে ফিরছে। ওরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। খোলা ডেকে দাঁড়াল। এই উদার আকাশ এবং শহরের নীল লাল আলো এবং সাগর দ্বীপের পাখীরা কেবল ডাকছে। ওরা এখন সমুদ্রের সিঁড়ি ভেঙে আকাশের তারা গুণতে থাকল যেন এবং এ-সময়েই ওরা ঘবে ফেরার জন্তু সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওরা নিজের ডেক ধরে যে বার আশ্রয়ে চলে গেল। পরস্পর কোন কথা বলল না। বলতে পারল না।

এরা বন্দরে নেমে সোজা মার্কেটে চলে গেল। পথেব কোন দৃশ্যই ওদের আজ চোখে পড়ছে না। ভাল ফ্রুনের জন্তু ওবা সন্ধ্যা না হতেই দোকানে ভীড় করল। ওরা আজও তিনগুচ্ছ ফুল নিয়ে জাহাজে ফেরাব সময় কোন পাব্-এ ঢুকে একটু মদ খাবার জন্তু আকুল হল না। মর্লিন এক তীব্র পাপবোধের দ্বারা ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ষ্টুয়ার্ড নিজের কেবিনে চোখ টেনে আশির্িতে দেখল। চোখের নীচটা টেনে টেনে দেখল। রুগ্ন পীড়িত ভাবটা কমেছে কি না দেখল। বড় মিস্ত্রীর চোখ দেখল। বড় মিস্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সতেজ মনে হচ্ছে।

সে বড় মিস্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, স্যার আমাকে আগের চাইতে সুস্থ মনে হচ্ছে না ?

সুখানী বলল, মোটেই না।

বড় মিস্ত্রী বললেন, আমাদের তিনজনকেই গত রাতের চেয়ে বেশী সুস্থ মনে হচ্ছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে নীচে নামবার সময় শুনল, দূরে কোথাও একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। ওদের মুখে খড়কুটো। ওরা আসন্ন বড়ের আগে ডিম পাড়ার জন্তু পাহাড়ের খাঁজ অবেবধে রত। সুখানী সিঁড়ি ধরে নামবার সময় পাখিদের মুখে

খড়কুটো দেখল। ষ্ট্রাডের চোখে, সেই পাখিদের ডিম পাড়ার জন্তু পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণ। কেবল বড় মিস্ত্রী গুনলেন পাখিরা পাখায় রাজ্যের ক্রান্তি নিয়ে বিবল হয়ে কান্দছে।

ষ্ট্রাড একধারে কুলগুলি রেখে মলিনের মুখটা ঠিক করে দিল। তারপর গাউনটা টেনে পায়ের নীচটা পর্যন্ত ঢেকে দিল। তারপর বাসি কুলগুলি যত্ন করে সরিয়ে দেবার সময় বলল, মনে হয় আমরা আমাদের প্রিয়জনের পরিচর্চা করছি। আমাদের এত যত্ন যদি মলিন বেঁচে থাকলে পেত !

সুখানী বলল, আচ্ছা স্যার এসব করার হেতু কি ? কি দরকার এই কুল সংগ্রহের। কি দরকার প্রতি রাতে এ-ভাবে... আমাদের বৈজ্ঞানিক মন ?

বড় মিস্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, মৃতের প্রতি সম্মান দিতে হয় সুখানী। মলিনকে এখন যত সুন্দর মনে হচ্ছে, যত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, ওকে আমরা এখন যত ভাল ভাবে দেখতে পাবছি.....

ষ্ট্রাড মাঝ পথেই বলে ফেলল, মলিন যে সত্যের জোরে বেঁচে ছিল এতদিন মরে গিয়ে সেই সত্যকে সে আবিষ্কার করল, কি বলেন স্যাব ? আর সেজন্যই বোধ হয় ওকে আমরা এত ভালবেসে ফেলেছি।

সুখানী বলল, কি সব বলছ পাগলের মত। ব'লে, সে মলিনের শক্ত হাত পা-গুলিকে ঠিক করে দিল। চুলগুলি যত্ন করে গুছিয়ে দিল। তারপর টেবিলটাকে প্রদক্ষিণ করার সময় ষাঁড় গরু অথবা শূকরের মাংস বুলতে দেখে জীবন সম্পর্কে কেমন উদাসীন হয়ে পড়ল। সে চেয়ারে বসে মলিনের পায়ের কাছে মাথা রেখে ঘুম যাবাব ভঙ্গীতে হাত পা টানা দিতে গিয়ে বুঝল এই শরীর এক মল-মুক্তের আধার। অথচ মলিনের চোখ পাথরের মত। বড় মিস্ত্রী মলিনকে নিবিষ্ট মনে দেখছেন, ষ্ট্রাড গল্প আরম্ভ করেছে।

সে বলল, তখন আমি জাহাজের তেলঘালা স্মিত্র। সে বক্তৃতার কায়দায় বলল, স্যার আপনি আছেন, নচ্ছার সুখানী আছে আর এই সম্মানীয়া অতিথি—আমাদের এই মহন্তর ঘটনার স্মৃতিমন্ডনই আশা করি আমাদের স্মৃতি করে তুলবে।

সুখানী বলল, তা হলে বুঝতে পারছ মাথাটা আর ঠিক নেই।

—চূপ রও বেয়াদপ। তুমিই সব নষ্টের গোড়া। বলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। সে কিছু বলতে পারছিল না ; ওর কষ্ট হচ্ছে বলতে। সে আবেগে কাঁপছিল। সে ধীরে ধীরে বিগত জীবনে ঢেরী নামক এক রাজকন্যার গল্প শোনাল।

ভার আর চেঁরীর গল্প। জাহাজী জীবনের অপূৰ্ব এক প্রেম ভালবাসার গল্প।

টুয়াড'গল্প শেষ করে মলিনের মাথার কাছে দাঁড়াল এবং ওর চোখ দুটোতে চুমু খেল। বলল, আমাদের ছোট এবং স্বার্থপর ভেব না, মলিন।

সারা ঘরময় স্মৃথানী এখন কোন মাংসের শরীর দেখতে পাচ্ছে না। দূর থেকে আগত কোন সন্ধীতের ধ্বনি যেন এই ঘরে বিলম্বিত লয়ে বেজে চলছে। সে থেকে থেকে কবিতার লাইন দুটো বার বার আবৃত্তি করল। এবং এই আবৃত্তির ভিতরেই সে এলবিকে স্মরণ করতে পারছে।

ওরা তিনজন আজও ফুল রাখল মলিনের শরীরে। ওরা উঠে যাবার সময় কোন বচসা করল না। ওরা কোন সমাধি ক্ষেত্র থেকে কিরে আসছে যেন এমনও এক চোখ মুখ সকলের।

বন্দরে এটাই ওদের শেষ রাত ছিল। ভোরের দিকে জাহাজ নোঙর তুলবে। ওরা তিনজন প্রতিদিনের মত বসল। প্রতিদিনের মত বাসি ফুলগুলি মলিনের শরীর থেকে তুলে ভিন্ন জায়গায় রাখল।

সকলেই আজ কেমন শান্ত এবং নীরব। ওদের গায়ে ওভারকোট এবং হাতে দস্তানা।

বড় মিস্ত্রী দু হাত প্রসারিত করে দিলেন টেবিলে। স্মৃথানী দীর্ঘ সময় ধরে উপাসনার ভঙ্গীতে বসে থাকল। সে তখন চোখ বুজে একটি বিশেষ দৃষ্টের কথা স্মরণ করে গল্পটা আরম্ভ করতে চাইছে।

স্মৃথানী বড় মিস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, তখন স্যার আমার নাম ছিল বিজ্ঞান। তখন আমি স্মৃথানী হই নি। ব'লে, গল্পটার ভূমিকা করল।

ভারপর আস্তে আস্তে বিজ্ঞান এক অব্যক্ত বেদনার গল্প শোনাল। জাহাজের বাতাস পর্যন্ত শুক্ন হয়ে শুনল বিজ্ঞানের গল্প। এক সময় বিজ্ঞান গল্প শেষ করে অবসর ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। সে এখন মলিনের কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে। সে যেন এই কপালের কোথাও কিছু অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

বড় মিস্ত্রী এত অভিভূত যে গল্প শেষ হবার পরও তিনি কিছু সময় ধরে বিজ্ঞানের মুখ দেখলেন। তিনি বিজ্ঞানকে মলিনের কপালে ছুরে পড়তে দেখে বললেন, কি দেখছ স্মৃথানী।

স্মৃথানী বড় মিস্ত্রীর কাছে এল এবং বলল, *Peace is on her forehead*। *Peace*কে অন্বেষণ করছি স্যার। মাল'ন সারাজীবন ঝড়ের নৌকা বেয়ে এখন

গভীর সমুদ্রে বৈতরণী পার হচ্ছে। এইটুকু বলে বিজন পুনরায় এলবির সেই কবিতাটি একটু অন্যভাবে আবৃত্তি করল—

She had dropped the sword and  
dropped the bow and the arrow ; peace  
was on her forehead, and she had  
left the fruits of her life behind herself  
on the day she marched back again to  
her master's hall.

জাহাজ ছাড়বার সময় ওরা তিনজন নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল। শীতের প্রকোপ কমে গেছে। সুখানী ষ্টুয়ার্ড এবং অন্যান্য সকল জাহাজীরাই বন্দর থেকে চোখ তুলে নিল। বন্দর ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। বন্দরের আলো ঘর বাতি সবই একে একে সমুদ্রেব ও-পাশে হারিয়ে গেল। আবার ওরা, সকল জাহাজীরা দীর্ঘদিন এই সমুদ্রে বাত যাপন করবে। ওরা বন্দরের জন্য আকুল হবে ফের। এবং মাটির স্পর্শের জন্য হবে ভয়ঙ্কর উদ্ভিগ্ন।

বড় মিস্ত্রী ডেক ধরে হেঁটে ডেক-কশপের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমাকে কিছু তক্তা দাও কশপ। করাত, হাতুড়ী বাটালী দাও। কিছু পেরেক লাগবে। সব আমার ঘরে রেখে এস।

বড় মিস্ত্রী এবং ষ্টুয়ার্ডের কোন ওয়াচ ভাগ নেই বলে ওরা ওদের খুশী মত নীচে নেমে যেত। ওরা সন্তর্পণে সকলের আডালে সেই কাঠ, পেরেক নীচে নিয়ে গেল। বড় মিস্ত্রী কানে পেন্সিল গুঁজে সেই প্রায়-অন্ধকার রসদঘরে কাজ করতেন। তক্তাগুলোকে পালিশ করে উজ্জ্বল করে তুলতেন মাঝে মাঝে, ওরা গান করত নীচে। দুঃখ এবং বেদনায় সেই গান সমুজ্জ্বল। মাঝে মাঝে ওরা নিজেদের ঘর অথবা স্ত্রী পুত্রদের কথা বলত। ওরা বলত, আমরা যথার্থ ই মালুম, ঈশ্বর !

বড় মিস্ত্রী বলতেন, আমার বড় ছেলেটা জলে ডুবে মারা গেল ! দুঃখ আমার অনেক ষ্টুয়ার্ড'।

ষ্টুয়ার্ড বলত, কি আশ্চর্য স্যার, আমরা মলিনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি দেখুন।

সুখানী এ সব কথায় থাকত না ; সে চুপচাপ একটু কাঁক পেলেই রসদঘর অতিক্রম করে বরফ ঘরে ঢুকে যেত। মাঝে মাঝে বলত, দেখছেন স্যার, মলিন অবিকৃতই আছে। মনে হয় মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে।

বড় মিস্ত্রী বললেন, কক্ষিনে কিছু কারুকাঁচ করলে ভাল হত।

ষ্টুয়ার্ড বলল, স্যার ধর্মযাজকের কাজটুকু কে করবে ?

সুখান বলিল, কেন আমরাই করব। পৃথিবীতে আমরা তিনজন বাধে মলিনকে আর কে এত ভালবেসেছে! এই জাহাজে কাজের কঁাকে একটু অবসর পেলেই আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। মলিনকে জীবনের সুখ দুঃখের ভাগ দিয়েছি। ধর্মযাজকের কাজ আমরাই করব। আমরা তিনজন ওর শববাহী হব। আমরা তিনজন ওর পরম আত্মীয় এবং আমরা তিনজনই ওর ধর্মযাজক। সুখানী কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাগুলি উচ্চারণ করল। তারপর গজকাঠি দিয়ে কফিনের মাপ দেখে বলল, ইচ্ছে হচ্ছে এই কফিনের পাশে একটু জায়গা নিয়ে শুয়ে থাকি। আর উঠব না। সব সুখ দুঃখ প্রিয় মলিনের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাক।

রাতে বড় মিস্ত্রী বললেন, আমার কাজ শেষ। এস এগুন আমরা ওকে কফিনের ভিতর পুরে দি।

সুখানী অল্পরোধের ভঙ্গীতে বলল, স্যার আজ থাক। আসুন আজও আমরা গোল হয়ে বসি। মলিনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গ জাহাজটা বড় নিঃসঙ্গ মনে হবে। জাহাজটা বড় অসহায় লাগবে। এই সব কথার সঙ্গে এক দ্রুত কান্নার আবেগ উথলে উঠল সুখানীর গলাতে। ঘরে আমার স্যার কেউ নেই। এলবিকে পরিত্যাগ করে আর কোথাও নোঙর ফেলতে পারি নি। প্রিয় মলিন আমাকে একটু আশ্রয় দিয়েছিল যেন। স্যার ওকে এত তাড়াতাড়ি ফেলে দেবেন।

বড় মিস্ত্রী বললেন, আমারও ভাল লাগছে না হে।

লুয়ার্ড বলল, আজকে থাক। আমরা কালই ওকে গভীর রাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।

পরদিন ওরা তিনজন যখন রাত গভীর, জাহাজীরা কোথাও কেউ জেগে নেই, শুধু ওয়াচের জাহাজীরা এনজিন রুমে এবং ব্রীজে পাহারা দিচ্ছে, যখন সমুদ্র শান্ত, যখন আকাশে অজস্র তারা জ্বলছিল এবং দূরে কোথাও কোন তিমি মাছের দল ভেসে যাচ্ছে অথবা ডলফিনের বাঁক, এবং এক কাকজ্যোৎস্না নীল জলের উপর—জাহাজটা রাজ হাঁসের মত সাঁতার কাটছে তখন শববাহী দলটি গ্যাঙয়েতে কফিন রেখে সব বাসি ফুলগুলি প্রথম সমুদ্রে ফেলে দিল। ফুলগুলি দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছে, ওরা ফুলগুলি দেখতে পাচ্ছে না। ওরা মলিনের জুতো এবং গাউন নিক্ষেপ করল, তারপর হাতের দস্তানা। ওরা এ-সব ফেলে দেবার সময়ই কাঁদছিল। ওরা কাঁদছিল। তিনজন নাবিকের চোখ থেকে জল কফিনের উপর পড়ছিল। সমুদ্র এবং বন্দর যাদের ঘর এবং এইসব বেশ্যাময়েরা যাদের ঘরগী সেই সব



রমণীধের উদ্দেশ্যে তিনজন নাবিক যেন চোখের জল কেলছিল। ওরা পরস্পর  
 হৃৎখে এতই কাতর, ওরা এত ব্যথিত... ওরা কারার আবেগ সামলানোর অন্য  
 রমাল ঠেসে দিচ্ছিল মুখে। ওরা প্রিয় মলিনের ককিন কাঁধে তুলে ধীরে ধীরে  
 সমুদ্রের জলে কেল, দেখল, আন্তে আন্তে প্রিয় মলিন জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে।  
 ওরা তখন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধবে কারাব আবেগে এলবির উচ্চারিত  
 সেই কবিতাটাই আবৃত্তি করল—

“When the warriors came out first from  
 their master’s hall, where had they hid  
 their power ? Where were their armour  
 and their arms ?

They looked poor and helpless, and  
 the arrows were showered upon them  
 on the day they came out from their  
 master’s hall.

When the warriors marched back  
 again to their master’s hall where did  
 they hide their power ?

They had dropped the sword and  
 dropped the bow and the arrow ; peace  
 was on their foreheads, and they had  
 left the fruits of their life behind them  
 on the day they marched back again  
 to their master’s hall.”